182. Oc. 477. 11.

লীলা।

(উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা—৩নং শঙ্কর ঘোষের লেন, "প্রদীপ" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

২৬ নং স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত।
১৩০৬ সন।

বিজ্ঞাপন।

১২৯০। ৯১ সালের "ভারতী" পত্রিকায় লীলার কয়েক পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। "ভারতী"তে যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিত্যক্ত, কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

লাহোর
ভাদ্র, ১২৯৯।

গ্রন্থকার।

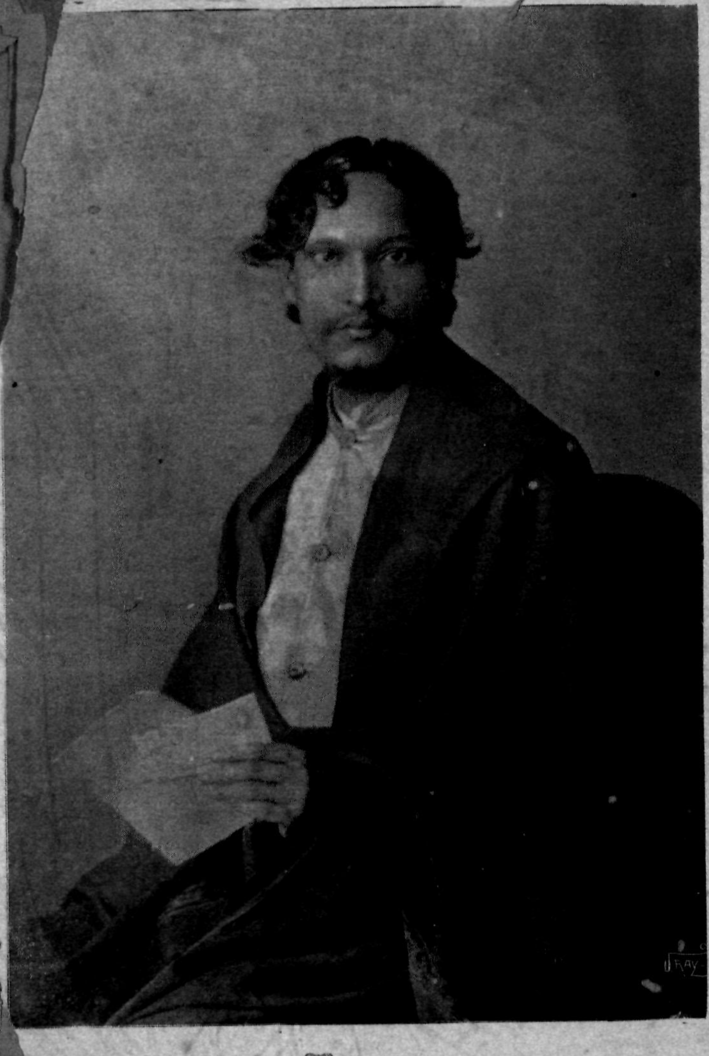

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লীলা।

BENGAL LIBRARY 30. AUG. 99

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাসর ঘর।

আমি এ বাসর ঘরের বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সেকালের বাসর ঘর হইত, তাহা হইলে কোন গোল থাকিত না। সেকালে সব সোজাসুজি মোটামুটি ছিল। সেকালে বুদ্ধি স্থূল, ঠাট্টাবিদ্রূপ স্থূল, সুতরাং সে সব কথা বলা কিছু শক্ত নয়। এখন সে দিন গিয়াছে। বরের দাঁতের সঙ্গে খোন্তার সাদৃশ্য, আর চুলের সঙ্গে সজারুর কাঁটার সাদৃশ্য দেখাইলে বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। সেকালে ঠাট্টা তামাসা এই পর্য্যন্ত। আগে যা স্থূল ছিল, এখন তা সূক্ষ্ম হইয়াছে।

এখনও বাসর ঘরে তেমনি ঘরজোড়া ধপ্‌ধপে বিছানা পাতা থাকে, তেমনি তাকিয়া থাকে, দেয়ালগিরিতে তেমনি ষোলপুনি মোমবাতি জলে! এখনও দরজার পাশে বাড়ীর দু' একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া উঁকি ঝুঁকি মারে, আবার কাল

লোকের তীব্র কটাক্ষে ও রমণীরসনার তীব্র ব্যঙ্গে লজ্জা পাইয়া তেমনি পলায়ন করে। কিন্তু আর কিছুই তেমন নাই। যাহারা বাসর জাগে, তাহারা আর তেমন নাই। বাসর ঘরে বর আর তেমন চোরের মতন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। বুঝি বাসরের কনেটিও এখন আর তেমন নাই।

আর কিছু পারি আর না পারি, ববকনে কেমন দেখিতে, কত বয়স, সেটি ত বলিতে হইবে। বরের বয়স বছর কুড়ি বাইশ হইবে। বেশ সুন্দর বর, দেখিতে রাজপুত্রের মত। গোঁপ দাড়ী এখনও তেমন উঠে নাই। কনেটি গোরা কি কালো তা আমি এখন কিছুই বলিতে পারিলাম না। মেয়েটি দেখিতে ছোট, বছর দশেক বয়স হইবে, কিন্তু এখন একখানি বারাণসী সাড়ী দিয়ে আপাদমস্তক মোড়া। মাথার একগাছি চুল কি পায়ের একটি নখ দেখিতে পাইবার যো নাই। বিবাহকালে মাথায় সিঁদুর দিবার সময় যাঁহারা কনের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, হাঁ, মেয়ে সুন্দরী বটে। তবে নিখুঁত সুন্দরী কেহই বলে নাই।

বাসর ঘর কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ডায়মন্ কাটা চিকের উপর বাতির আলো, আর সেই কাল কাল চোকের বিদ্যুতে তেমন ভাল ঠাহর হয় না। চারিদিকে কিন্খাব, সাটিন, মখমলের নানাবর্ণ ফুলকাটা, কুঞ্চিত করা জামা, রকম রকম কাপড়, কাহারও মাথায় একটুখানি কাপড়, অনেকেরই মাথায়

কাপড় নাই, নানাবিধ কবরী, এলোফিরিঙ্গী খোঁপা, বেনে খোঁপা, ফুল খোঁপা স্কন্ধে ঝুলিতেছে। আর সেই স্নিগ্ধ আলোকের সহিত, উজ্জ্বল কটাক্ষের সহিত, হাসি টিটকারীর তরঙ্গ মিশিয়া ঘরের মধ্যে উথলিতেছে। গা টেপাটিপি, গায় গায় ঢলাঢলি, কখন মর্ম্মান্তিক অন্তরটিপ্‌নী, কখন কাণে কাণে দু' একটি চুপি চুপি কথা, আর সেই সাবানমার্জ্জিত হস্তমুখের গৌরকান্তি, এই সব দেখিয়া, আর সেই আতর, ল্যাবেণ্ডার, ওডিকলম, বোকে, যুঁইফুল, বেলফুল সুবাসিত নিশ্বাসোক্ত বায়ুর আঘ্রাণ লইয়া কাঁহার মাথা ঠিক থাকিতে পারে ?

কন্যার বয়স দশ বছর শুনিয়া অনেকে রাগ করিতে পারেন। অনেকে বলিবেন, বাল্যবিবাহে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, আবার সেই বাল্যবিবাহের কথা ? সে অপরাধ ত আমার নয়। বাল্যবিবাহ যে ভাল, সে কথা আমি ত বলি নাই। যত দোষ কন্যাকর্ত্তার আর তাঁর গৃহিণীর। আমি যা দেখিয়াছি, তাই বলিলাম। বিবাহের দিন দুপুর বেলা কন্যার মা হলধর বাবুর স্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথাটা আমার মনে পড়িতেছে।

হলধর বাবুর স্ত্রী খুব সভ্য ভব্য। তাঁর স্বামী এম্. এ পাস করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে তিনিও অনেকটা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। হলধর বাবুর স্ত্রী তাঁহার বাল্যসখীর কন্যার বিবাহ হইবে শুনিয়া ও বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহের দিন দুপুর বেলা আসিয়া হাজির। আসিয়া দেখিলেন, কন্যাকর্ত্রী যজ্ঞকার্য্যে

ব্যস্ত রহিয়াছেন। হলধর বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া কন্যার মা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। হলধর বাবুর স্ত্রী অন্য কথা না বলিয়াই একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই তোমার মেয়েটির এত শীঘ্র বিয়ে দিচ্চো কেন? মেয়েছেলের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েই ত আমাদের এত কষ্ট।"

কন্যাকর্ত্রী। "তা ভাই কি কর্‌ব বল। আমারও ত এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত আর নিজের হাত নয়। জানই ত 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এ তিন বিধাতারে নিয়ে।' ছেলেটিও দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, দুটো পাস কোরেচে, এখন তিন্‌টে পাসের পড়া পড়্‌চে। এমন পাত্র কি হাতছাড়া কর্‌তে আছে? আর, ভাই, কিরণের এমন অল্প বয়সই বা কি? দু তিন বছরে সেয়ানা হবে এখন। আমাদের কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল, মনে আছে ত?"

এখন, হলধর বাবু তর্ক করিতে খুব পটু। তিনি মিল্‌, বেন্থাম, স্পেন্সরের মত খণ্ডন করেন, সাংখ্যদর্শন তাঁহার রসনাগ্রে। সুতরাং তাঁহার গৃহিণীও কিছু তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমাদের ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েচে বলে কি আমাদের ছেলেপুলেরও তাই হওয়া উচিত? দেখ, অল্প বয়সে বিয়ে হলে কত কষ্ট। অল্প বয়সে ছেলে হয়, ভাবনা চিন্তা উপস্থিত হয়, আরও কত বিপদ হয়। আমি ওঁর মুখে শুনেছি—"

কিরণের মা একটু হাসিয়া বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "ছি, বোন, এখন কি আর ওসব কথা বল্‌তে আছে! ফুল ফুট্‌লে ত আর ধরে রাখা যায় না। কিরণের ফুল ফুটেছে বলেই আজ তার বিয়ে। এখন তোমরা দশজনে আশীর্ব্বাদ কর, যেন বাছা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সুখে থাকে। ভালয় ভালয় যেন আজ সব সারা হয়। বাছা আমার কিছু জানে না, যেন তার কখন কোন দুঃখ কষ্ট না হয়।"

বলিতে বলিতে তাঁহার হাসি-হাসি অমায়িক মুখখানিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আহ্লাদে, হয় ত একটু দুঃখে, চোকের পাতা একটু ভিজে-ভিজে হইয়া উঠিল।

হলধর বাবুর স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। শুনিয়াছি না কি, তিনি বাসর ঘরে বামণ দিদি-সাজিয়া খুব রঙ্গ করিয়াছিলেন। বর বাবাজী বড় বিপদেই পড়িয়াছিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাহিরে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, আর সব নিস্থতি দেখিয়া এক সুন্দরী কহিলেন, "রশনচৌকী যে একেবারে থামিয়া গেল। বল, তাহারা এই সময় একবার বাজাক্।"

তাঁহারা দিব্য লুচি সন্দেশ আহার করিয়া, নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে যে, তাহাদের আর এক জায়গা হইতে বায়না আসিয়াছে। বাজনা শুনিয়া বাবুরা খুসী হইয়া তাহাদের এক জোড়া শাল পুরস্কার দিয়াছে। এমন সময় দাসী আসিয়া তাঁহাদের ডাকিল।

অন্দর মহলের হুকুম, না শুনিলেই নয়। একজন সানাইয়ের ফুঁপী হাঁতড়াইয়া সানাইয়ের মুখে বসাইল, আর একজন অভ্যাসবশতঃ তবলায় চাঁটি দিল। তবলা কিছু নরম বলিল। সকলে উত্তমরূপে জাগরিত হইলে, অস্ফুটস্বরে অন্তঃপুরবাসিনীদিগের উদ্দেশে অনেক অন্যায় কথা বলিতে বলিতে, দু এক ছিলিম তামাক খাইয়া যন্ত্র তন্ত্র ঠিক করিতে লাগিল। কতক্ষণ তবলা ঠিক বলে না, সানাইয়ে ঠিক সুর বাহির হয় না, অবশেষে অনেক রকম বিশ্রী সুর তালের পর দুই জনে পোঁ ধরিল, তবলায় মৃদু মৃদু ঘা পড়িতে লাগিল। শেষে অর্দ্ধেক কাঁদিয়া, অর্দ্ধেক বিরক্ত হইয়া সানাইয়ে বেহাগ আলাপ আরম্ভ করিল। তবলায় অমনি একতালা বাজিতে লাগিল। সানাইয়ে ধরিল, "নিশি নিশি জাগিনু সে জন না এল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বর কন্যার পরিচয়।

বিবাহের পর দিবস বাসি বিবাহ হইলে বর বধূ বাটী আসিল। সেখানে দশ পনর জন এয়ো মিলিয়া বরকনেকে বরণ করিয়া শাঁক বাজাইয়া হুলু দিয়া তাহাদের ঘরে বসাইল। সেই সময়

যে যেখানে ছিল, কনের ঘোমটা খুলিয়া, থুঁতি ধরিয়া মুখ দেখিয়া লইল। এইবার কনের রূপের পরিচয় দিই।

আমি যদি কন্যাকে অলোকসামান্যা রূপবতী বলিয়া পরিচয় দিই, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়। যদি বলি যে বর্ণ তপ্তকাঞ্চন, প্রস্ফুটিত চম্পকের তুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত, ঘনকুঞ্চিত, ঘোরকৃষ্ণ কেশভার, সুঠাম, সুললিত কুসুমকান্তি, বিশাল বিকশিত লোচনযুগল, কটাক্ষে বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে, ভ্রূযুগ সাক্ষাৎ কামদেবের শরাসন, ফুল্ল বিম্বাধর, এইরূপ আরও সব বলিয়া যাই, তাহা হইলে আমারও রূপ বর্ণনা হইল, তুমিও মনে করিলে যে, হাঁ, উপন্যাসের নায়িকার উপযুক্তই বর্ণনা হইল। কিন্তু, আমি, সত্যের কঠোর শৃঙ্খলে বদ্ধ, তা পারিলাম না। কন্যার বর্ণ বেশ গৌরবর্ণ বটে, কিন্তু সে বর্ণ দেখিয়া চক্ষু ঝলসিত হয় না। ঘরে বসাইয়া সকলে টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পর একজন কন্যার খোঁপা খুলিয়া দেখিলেন যে, চুল বেশ কাল, আর কোঁকড়ানও বটে, কিন্তু গতে যেমন লম্বে তেমন নয়, কটিদেশের একটুখানি নীচে পড়ে মাত্র। চোক বেশ পটলচেরা, আনত চক্ষু বলিয়া তারার রংটা ভাল বলিতে পারিলাম না। বোধ হয়, চোক একটু কটা হইবে, তা নহিলে হরির মা এত করিয়া চোক তুলিয়া চাহিতে বলিলেন, তবু নববধূ একবার চোক তুলিল না, ঘাড়টি হেঁট করিয়া একদৃষ্টে মাটীর দিকেই চাহিয়া রহিল কেন? আর বোসেদের মেয়ে ঘরের

বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিল, "হাজার সুন্দরী হোক্ না কেন ভাই, নাকটি একটু মোটা আর পায়ের চেটো খড়মের মত।" এই বলিয়া তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইবারে সব কথা খুলিয়া বলি। পাত্রের নাম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; সুরেশচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন, খুল্লতাতের আশ্রয়ে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করেন। খুল্লতাত হরগৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ শত টাকা বেতনের কর্ম্ম করেন। তাঁহাকে বহু পরিবার পালন করিতে হয়। নিজের সন্তান সন্ততি, একটি বিধবা ভগিনী ও তাঁহার দুই চারিটি শিশু সন্তান, এবং অগ্রজের একমাত্র সন্তান সুরেশচন্দ্র। হরগৌরী বাবুর গুণ অনেক। তিনি যেমন আপনার সন্তানের যত্ন করেন, ভ্রাতা ভগিনীর সন্তানগুলিকেও ঠিক তেমনি করেন। সুরেশচন্দ্রকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিস্তর ব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। হরগৌরী বাবু পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

পাত্রীর নাম কিরণময়ী। পিতা গোবিন্দপ্রসাদ চৌধুরী একটা হৌসে মুৎসুদ্দীর কর্ম্ম করেন, পূর্ব্বে বিলক্ষণ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, আবার তেমনি অসদ্ব্যয়ও ছিল। এখন আর তেমন রোজগার নাই, ভার্য্যা বড় গুণবতী, এতদিনে তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর পুত্র কন্যায় গুটি তিন চার। কিরণময়ী সকলের

বড়। গোবিন্দ বাবুর বয়ঃক্রম বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে। সুরেশচন্দ্র ছেলেটি ভাল, সচ্চরিত্র ও বেশ পড়াশুনা করিতেছে জানিয়া, গোবিন্দ বাবু তাহাকে কন্যাটি সমর্পণ করিয়াছিলেন। ছেলেটির বাপ মা নাই, সেই এক দুঃখ, তবে ছেলেটি ভাল বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। হরগৌরী বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের এমন প্রার্থনীয় সম্বন্ধ হইতেছে দেখিয়া, নিজে উদ্যোগী হইয়া সুরেশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখে, আঁব লিচুর সময়ে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিয়ের কনে।

বিয়ের কনের বিয়ের পর আট দিন শ্বশুরবাড়ী থাকা ভারি জ্বালা। একে ত ছোট মেয়ে মার কাছছাড়া কখন থাকিতে পারে না, ধূলাকাদা মেখে বাপের বাড়ী খেলা করিয়া বেড়ায়, পুতুল খেলা করে, পুতুলের বিয়ে দেয়, আবার তাতে ছোট মেয়ে ছেলে একটু চঞ্চল, একটু দুরন্ত হয়। সেই টুকু মেয়ে হাতে লোহা সাঁকা প'রে, মাথায় সিন্দূর প'রে, ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে চুপচাপ কোরে থাকিতে হবে। "মনে কর, একটা অচেনা জায়গায়

গেলে আমাদেরই মন কেমন একটু খুঁৎ খুঁৎ করে। হয় ত শ্বশুরবাড়ী তেমন সমবয়সী মেলে না, সমবয়সী জুটিলে তবু অনেক কম কষ্ট হয়। তাতে আবার পদে পদে নিন্দার ভয়। সেই এক রত্তি মেয়ে, ভাল মন্দ কিছু জানে না, তাকে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হয়। শ্বাশুড়ী আছেন, ননদ আছেন, সেকেলে দিদিশ্বাশুড়ী আছেন, আত্মীয় কুটুম্ব আছে, পাড়াপড়সী আছে, তার মধ্যে কেহ কোন ত্রুটী দেখিতে পারে না। দোষ দেখিলেই ধরিবে, না দেখিলেও ধরিবে। চলিতে দেখিলে বলে চলন বাঁকা, খেলা করিতে দেখিলে বলে বড় চঞ্চল, কথা কহিলে বলে বাচাল, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বলে কুড়ে, ঘোমটা একহাতের একটু কম হইলে বলে বেহায়া, এইরূপে উঠিতে বসিতে খুঁত ধরে। কথায় কথায় বাপের নিন্দা, মার নিন্দা। অমুক গহনাটি তেমন ভারি হয় নাই, কনের বাপ মা ভারি মন্দ লোক, ফাঁকি দিয়াছে।

আমাদের কিরণ এখন সেই অবস্থায় পড়িয়াছে। শ্বশুরবাড়ী যে আদর করিবার লোক নাই, সমবয়সী মেয়ে ছেলে নাই, তা নয়। খুড়শ্বাশুড়ী খুব যত্ন, খুব আদর-অপেক্ষা করেন। বিধবা পিসশ্বাশুড়ী; দুই একটি বড় বড় খুড়তাত ননদ কিরণকে যেন হাতের তেলোয় করে বেড়ায়। বাড়ীর ছেলেপুলে তাহাকে লইয়া খেলা করে। তবু সে বাপের বাড়ীর মত কিছুই দেখিতে পায় না। বাপের বাড়ী কেহ তাহার খোঁজ নেয় না, সে

আপনার মনে খেলাধূলা করে। এখানে এত লোকের মাঝখানে সেই যেন প্রধান লোক। "কনেবউর খাওয়া হল কি না," "নাওয়া হল কি না," "কনেবউর ভাল করে চুল বেঁধে দাও," "আহা বউমা এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন? এস মা আমার সঙ্গে এস," "ওরে বউমাকে নিয়ে ভরসন্ধ্যার সময় ছাতে উঠেছিস্ কেন? নেমে আয় নেমে আয়," চারিদিকে এই রকম একটা হইচই পড়িয়া গিয়াছে। যে আসে সেই বলে, "দেখি গা, তোমাদের কেমন বউ হল দেখি। ওমা, এই যে দিব্য বউ হয়েছে! ঠিক যেন দুর্গা ঠাকরুণ! আহা, এমন বউ সুরেশের মা দেখতে পেলে না গা! বেঁচে থাক বেঁচে থাক, স্বামী নিয়ে জন্ম জন্ম সুখে ঘর কর! ছেলে হোক্ মেয়ে হোক্, আহা সোণার সংসার হোক। সুরেশের একটি ভাল চাকরী হোক্!" কিরণ ভাবে, আমাকে নিয়ে এত গোল কেন? বিয়ে ত সকলের হয়, তা আমায় নিয়ে সকলে এমন করে কেন? আমার বড় লজ্জা করে। আচ্ছা, শ্বশুরবাড়ী কি বৌকে এমনি করে? দূর, তা কেন? নতুন বেলায় বুঝি এমনি করে।

কিরণ তাই ভাবে। তাহাকে লইয়া ত কেহ কখন এত গোল করে না, এখনই বা করে কেন? আর এত আদরেও কিরণের তেমন মন উঠে না। বাপের বাড়ী মার আদর বাপের আদর সে আর এক রকম। কিরণের তাই ভাল লাগে। এখানে ভাত খাইবার সময় দশ জনে ঘিরিয়া বসে। চারিদিক

হইতে তাহাকে খাইতে অনুরোধ করে। "খাও না, ভাই, এখানে কি তোমার লজ্জা করতে আছে? এই তোমার বাড়ী এই তোমার ঘর, আমাদের সাক্ষাতে লজ্জা করে ক'দিন চল্‌বে বল? ছি, মা, আর চারটি ভাত মাখ, লজ্জা করো না। বামন ঠাকুরুণ! বউমাকে একখানা মাছ দিয়ে যাও ত!" চারিদিকে শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতি এইরূপ বলেন। লজ্জায়, ভয়ে, কিরণের আর খাওয়া হয় না। মুখের ভাত মুখে চাল হইয়া যায়। চারিদিকে যদি সকলে এমন হাউকাউ না করে ত সে বেশ কুড়িয়ে বাড়িয়ে খাইতে পারে। সে ভাবে, "এখানে সকলে খাবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করে কেন? মা ত আমায় কখন এত জোরে বল্‌তেন না।" তাই সে নিতান্ত জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া সমবয়সী ছটি ননদের সঙ্গে থাকে। তাহারা পান সাজিতে গেলে, তাহাদের নিকটে বসিয়া থাকে। আর কেহ না দেখিতে পাইলে, তাহাদের সঙ্গে পান সাজে। তাহাদের সঙ্গে গা ধুইয়া আসে, তাহাদের কাছে বাপের বাড়ীর গল্প করে। সন্ধ্যা হইলে দিদিশ্বাশুড়ী ভূতের, ডাকাতের, বর্গীর, দুয়া সুয়া রাণীর গল্প করেন, কিরণ তাহাই শোনে। শুনিতে শুনিতে, ছেলেমানুষ, কোন কোন দিন ঘুমাইয়া পড়ে।

কিরণ ধীরে ধীরে হাঁটে, কিন্তু পায়ে চারিগাছা মল, সর্ব্বদাই ঝম্ ঝম্ করে। সুতরাং সে যেখানে যায়, সেখানে সকলেই আগে টের পায় যে, কনেবউ আসিতেছে। একদিন তাহার

পায়ে দৈবাৎ হোঁচোট লাগিয়া বড় ব্যথা হওয়াতে মল চারি গাছি খুলিয়া খুড়শ্বাশুড়ীর কাছে রাখিয়া দিয়াছিল। দুপুর বেলা সকলে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কোন ঘরে তাস খেলার ধূম, নক্স খেলা হইতেছে, একজন সকলের কোল কুড়াইয়াছেন, তাঁহার আর মুখে হাসি ধরে না। কেহ একেলা ঘরে চুপি চুপি আরসীতে মুখ দেখিতেছেন। কার স্বামী কত মাহিয়ানা পান, কার সাহেব কাকে বেশি ভাল বাসে, কোন ঘরে সেই কথা হইতেছে। কিরণের যে দুইটি সঙ্গিনী তাহার নিকটে থাকে, তাহারা তাহাকে ফেলিয়া আজ কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। সে দোতালার বারান্দায় একেলা বসিয়া আছে। অনেক ক্ষণ একেলা থাকিয়া তাহার মন একটু চঞ্চল হওয়াতে সে চারুবালা আর সুকুমারীকে খুঁজিতে উঠিল। আস্তে আস্তে গিয়া শুনিল, এক ঘরে মৃদুস্বরে কথোপকথন হইতেছে, কিন্তু সে কথা দশ পনর হাত দূর হইতে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। এক জন বলিতেছেন, "অমন নেকা নেকা হাবা গোবা নেহাত ভালমানুষটি আমি ভাল বাসিনে।" আর একজন বলিতেছেন, "দেখেছিস্ ভাই, ভাঁজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানেন না। মিট্‌মিটে ডাইন ছেলে খাবার রাক্ষস।"

প্রথম সুন্দরী কহিলেন, "দেখিস্, ও এর পরে দাদাকে ভেড়া বানাবে এখন। ঐ টুকু মেয়ে ঠ্যাকারে যেন মাটীতে পা পড়ে না, কেমন পা টিপে টিপে পা গুণে গুণে হাঁটে দেখেছিস্।"

কিরণ বুঝিল, তাহারই কথা হইতেছে। সে আর না শুনিয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ঘরের মধ্যে দুই ননদিনী, একজন পঞ্চদশ, আর একজন সপ্তদশবর্ষীয়া, বসিয়া রহিয়াছেন। এই দুই জন কিরণকে এমনি যত্ন করেন, যেন তাহাকে একবার মাটীতে নামাইতে চান না। তাঁহারা কিরণকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি বউ, মল খুলেছ কেন?"

কিরণ কহিল, "আমার পায়ে বড ব্যথা হয়েচে, তাই খুলে রেখেছি।"

তাহারা দুই জনে কিরণকে ডাকিয়া ঘরে বসিতে বলিল।

কিরণ এ পর্য্যন্ত তাহাদের সকল কথা তৎক্ষণাৎ শুনিত, কখন উচ্চবাচ্য করিত না। এবার সে কহিল, "না, আমি সেজ ঠাকুরঝির কাছে যাই।"

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন দুই ভগিনীতে চোকঠারাঠারি হইল।

সেদিন বৈকালে কিরণ, বাপের বাড়ীর ঝির কাছে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য ভারি কান্না জুড়িয়া দিল। এ পর্য্যন্ত সে কাঁদে নাই, কিন্তু আজ তাহার কোমল কচি বুকে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। সে ভাবিল, "কেনই বা ইহারা আমাকে এমন যত্ন করে, আবার কেনই বা পিছনে এমন নিন্দা করে? আমি ইহাদের কি দোষ করিয়াছি? আমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌ব

না।” এই ভাবিয়া সে বড় কাঁদিল, ঝিকে বলিল, “মাকে গিয়া বল্ যেন আজই আমাকে নিয়ে যান। আমি এখানে আর থাক্‌তে পার্‌ব না।” কত লোক তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতে বুঝিল না। ঝাড়া দু’ঘণ্টা চক্ষের জলে আঁচল ভাসাইল। শেষে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া চুপ করিল। তখন আবার সে চারু আব সুকুর সহিত খেলা কবিতে লাগিল।

সুধু এই জালা নয়। ফুলশয্যার রাত্রে যখন তাহাকে সকলে মিলিয়া ঘরে রাখিয়া আসিল, তখন কিরণ মহা বিপদে পড়িল। যাহাকে শুভদৃষ্টির সময় ছাড়া পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, তাহার পাশে শুইতে হইবে। হয় ত স্বামী তাহার সহিত কথা কহিবে, তখন সে কি উত্তর দিবে? ঘরের বাহিরে মেয়েরা আড়ি পাতিবে, দোর জানালায় ফাটাফুটো থাকিলে সেইখান দিয়া দেখিবে। সে বিছানায় উঠিয়া বিছানার একপাশে মড়ার মত চুপ করিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। সুরেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। দেখিলেন, কিরণ মাথায় কাপড় জড়াইয়া পা গুটাইয়া আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছে। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন, “এখন অমন করিয়া রহিলে কেন? ঘরে আর ত কেহ নাই, এখন ঘোমটা খুলে ভাল করে শোও না।”

এই শুনিয়া কিরণ মাথার কাপড় আর খানিকটা টানিয়া দিল। কাপড় টানিতে হাতের চুড়ি, বালার শব্দ হইল। সেই

সঙ্গে ঘরের বাহিরে ঠন্ করিয়া মোটা মলের শব্দ আর ফিস্ ফিস্ করিয়া চুপি চুপি কথা শোনা গেল। সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা আড়ি পাতিয়াছে। তিনি লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন। দুই জনে বিছানার দুই ধারে শয়ন করিয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি এক পাশে শয়ন করিয়া কিরণের পাঁজরায় ব্যথা ধরিল।

ফুলশয্যার রাত্রি এইরূপে কাটিয়া গেল।

পরদিবস কাক না ডাকিতে কিরণ আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। প্রভাত হইলে যুবতীরা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, কাল রাত্রে কি কথা হইয়াছিল, বলিতে হইবে। "তুই ভাই বড় সেয়ানা। যতক্ষণ আমরা আড়ি পাতিয়াছিলাম, ততক্ষণ একটা কথাও কহিস্ নি। তোমার বর তোমায় কি বল্লে, বল না ভাই।" এক জন ছোট ননদ কহিলেন, "কাল রাত্রে দাদা তোমায় কি বলেছিল, আমায় বল্বে না ভাই? এই বুঝি তোমায় আমায় ভাব। আচ্ছা ভাই।"

কিরণ আগে চুপ করিয়া রহিল, শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিল, "না, কোন কথা হয় নি।"

তবু নিবৃত্তি হইল না। ছোট ছোট দুষ্ট ননদেরা কিরণকে একটা ঘরের ভিতর পুরিয়া সুরেশকে ডাকিয়া বলিল, "দাদা! একবার এই দিকে শুনিয়া যাও ত।" সুরেশচন্দ্র আসিলে তাহারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিরণ লজ্জায়

লুকাইবার ঠাঁই পায় না। সুরেশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হয় ত মেয়েরা পান সাজিতেছে, কিরণ সেইখানে বসিয়া আছে, এমন সময় সুরেশ বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, "চারু আমায় একটা পান দিয়ে যা ত." চারুবালা কহিল, "আমরা এই পান সাজ্‌চি, এই খান থেকে নিয়ে যাও না।" এই কথা শুনিয়া কিরণ উঠিয়া পলাইতে যায়, সুকুমারী অমনি তাহার কাপড় চাপিয়া ধরিল। সুরেশ আসিলে কহিল, "দেখ, এ কে।" সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে এক ধমক দিয়া পান লইয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি আসিলেই কিরণ ভাবে, কখন রাত পোহাইবে। সুরেশ সেই একদিন একটা কথা কহিয়া লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিতেন না। ফুলশয্যার রাত্রি দুই জনেরই পক্ষে প্রায় কণ্টকশয্যা হইয়াছিল। কিরণ রোজ রোজ দিন গণে। ভাবে, আট দিন কোন রকমে কাটিলে বাঁচি, তা'হলে আবার মার কাছে যাই। বিবাহের পর আট দিন শ্বশুরবাড়ী থাকা পদ্ধতিটা তাহার বড় মন্দ বোধ হইত। এক এক বার ভাবিত, আমাদের বুঝি চিরদিনই এমনি যাইবে। চিরদিনই বুঝি দুই জনে পাশাপাশি শুইয়া থাকিব, কেহ কখন কথা কহিবে না। কিরণ ত কখন কথা কহিতে পারিবে না। এ লজ্জা কেমন করিয়া ভাঙ্গিবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রথের সময়।

আষাঢ় মাসে রথের মহা ধূম। ধূমধামই বা কি, তেমন বড় বড় রথও আর দেখা যায় না, তেমন দলে দলে জগন্নাথযাত্রীও আর চলে না। সে স্রোতে ধীরে ধীরে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। স্নানযাত্রার উপলক্ষে বুড়া বুড়ী. যুবা যুবতী এখন আর তেমন দলে দলে জগন্নেথে প্রসাদের আশায়, আর সমুদ্রে ডুব দিবার আশায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যায় না। সেথোদের আর তেমন হাঁকডাক নাই। এখন কাছি ছিঁড়িয়া রথের চাকায় পড়িয়া তেমন গড়া গড়া লোক মারা পড়ে না। ইংরাজের রাজ্যে সে সব উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মরিতে চাহে না, মরিতে জানে না, মরণের নাম শুনিলে কাঁদিয়া ফেলে। তবু রথের চাকার তলায় পড়িয়া অনায়াসে মরিত। বাঙ্গালীর সে সাহসটুকু বরাবর আছে। ধূলায় পড়িয়া থাকিতে, চক্রতলে দলিত হইতে বাঙ্গালী ভয় করে না। সে চক্র বিশ্বম্ভরের রথেরই হউক, আর মুসলমানেরই হউক, অথবা সাগরপারপ্রবাসী ইংরাজেরই হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে সব সমান।

এখন সে সব কিছু নাই, কিন্তু অন্যরকম উৎসবাদি আছে। মাহেশে আজও বিস্তর যাত্রী সমবেত হয়। ভাগীরথীর পবিত্র

বক্ষে নানা বর্ণের নিশান উড়াইয়া অগণিত বজরা, বোট, ক্ষুদ্র ষ্টিমার প্রভৃতি ভাসিয়া বেড়ায়। অধিকাংশ বোটের ভিতরে বাহিরে, ছাদে, বারাঙ্গনা, ব্রাণ্ডি, আর বাবুর দল। রথের দিনে, এত বড় ধর্ম্মোৎসবের দিনে, সহস্র লোকের সমক্ষে গঙ্গাজল প্রতিবৎসর এইরূপে কলুষিত হয়। হায়, এমন করিয়া আর কত দিন যাইবে?

ধান ভানিতে শিবের গীত গাইতেছি বলিয়া তুমি রাগ করিবে। তা থাক্, আমাদের শিবের গীতে কাজ নাই। কলিকাতা সহরে রথের তেমন কিছুই ঘটা হয় না, কেবল রাস্তায় রাস্তায়, চৌমাথায়, তেমাথায়, কচি কচি তালপাতার ভেঁপুর বাজার বসে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেই ভেঁপু কিনিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া সহর গুলজার করিয়া তোলে। তাহার পর পনর দিন পর্য্যন্ত কাণে তালা ধরিয়া থাকে।

আমাদের কিরণের বয়স দশ বছর। দশ বছরে আজ কাল মেয়েরা বেশ গিন্নীবান্নী হয়, এমন আমি অনেক দেখিয়াছি। আমি জানি, সে দিন দশ বছরের একটি মেয়ে, বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে শুনিয়া, আপনার পুঁতুলের বাক্স হইতে সব পুঁতুল বাহির করিয়া বিলাইয়া দিল, ছুটাছুটি, খেলাধূলা সব ছাড়িয়া দিয়া, ছুটি তিনটি চাবি একটি রিংয়ে পরাইয়া, আঁচলে বাঁধিয়া বেশ শান্তশিষ্টের মত ঘর বাহির করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আঁচলের মুড়ো কাঁধের উপর ফেলিয়া

মাটীর দিকে চোক নীচু করিয়া বলে, "আমার যে বিয়ে হবে।" কেবল ঘোমটাটি বাকী রহিল। সেটি ত বিবাহ না হইলে দেওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের কিরণ তেমন নয়। সে শ্বশুরবাড়ী আট দিন চুপ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু সে একটু ছট্‌ফটে। খেলাধূলা করিতে কিছু ভালবাসে। ছুটাছুটি করিলে কিছু ভাল থাকে। বিয়ের আগে সে বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। সম্বন্ধ ঠিক হইলে সেখানে যাওয়া বন্ধ হইল। কিরণের মা বেশ লেখাপড়া জানিতেন। কিরণ তাঁহার কাছে পড়িত, অবশিষ্ট সময় খেলা করিয়া বেড়াইত। ঝগড়া ঝাঁটি দেখিলে সে দিকে যাইত না। কিরণ একটু চঞ্চল বলিয়া কিছু অপরিষ্কার। মা চুল বাঁধিয়া দিলে আবার উস্কোখুস্কো হইয়া চুল বাতাসে উড়িত। মা কিছু বলিতেন না, কেবল হাসিতেন। কিরণের ঠাকুরমা বড় বিরক্ত হইয়া সর্ব্বদাই খিট্‌খিট্‌ করিতেন। কিরণের চুল দেখিলেই তিনি বলিতেন, "মাথায় যেন কাকের বাসা হয়ে রয়েচে। তোর বিয়ে থাওয়া হল, এখনও তুই অমন নোংরা কেন লা? এমন ধারা দেখ্‌লে তোর বর তোকে কখন ভাল বাস্‌বে না।" কিরণ হাসিয়া পলাইত। কিরণের ঠাকুরমার ঐ একটা কেমন রোগ ছিল। সুন্দরীরা আজকাল খোঁপা বাঁধিয়া সম্মুখের চুল আলবার্ট ফ্যাশনে ফুলাইয়া রাখেন। কিরণের পিতামহী সে চুল দেখিয়াও 'কাকের বাসা' বলিতেন। কাজেই

ধুংক্ত্রীরা মনে মনে রাগ করিতেন, বলিতেন, বুড়ীকে বাহাত্তুরে ধরেচে।

কিরণের কথা হইতেছিল। সোজা রথের দিন বিকাল বেলা কিরণ ভেঁপু হাতে করিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া বাজাইতেছে। কাপড়খানা ময়লা, গায়ে ময়লা, পায়ে চারগাছা মল। বাড়ীর সম্মুখেই ফুটপাথের উপর বারান্দা বাহির করা। সেই বারান্দায় কিরণের একটি পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতা ভেঁপুহস্তে দণ্ডায়মান। কিরণ নীচে হইতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা বিনুণী কাঁধে ঝুলিতেছে, সুমুখের চুলগুলা 'কাকের বাসার' মত। বারান্দা হইতে গোপালচন্দ্র বলিতেছেন,—

“বল দিদি, তোল ভেঁপুটা কেমন বাজে, একবার বাজা ত।”

কিরণের পর আর একটি ভগিনী, এজন্য কিরণ বড় দিদি। গোপালচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ আর বড় আদুরে, এজন্য তিনি 'ড়' উচ্চারণে সমর্থ হইয়াও 'ল' বলিতেন।

কিরণ উত্তর করিতেছে, 'আমার ভেঁপু কেমন বাজে দেখ্‌বি ?—ভোঁ-ও-ও-ও-ও ও। এইবার তুই বাজা দেখি।”

গোপালচন্দ্র খুব গাল ফুলাইয়া ধরিলেন, কিন্তু ভেঁপু ভাল বাজিল না, একবার পোঁ করিয়াই থামিয়া গেল। গোপালচন্দ্র কিছু বিষণ্ণ হইলেন! কহিলেন,—

“তোল ভেপু আমাকে দিবি ভাই ?”

এমন সময় মস্ মস্ করিয়া রাস্তায় জুতার শব্দ হইল। কিরণ ফিরিয়া দেখিল,—ওমা কি হবে! অমনি মাটীতে ভেঁপু ফেলিয়া দিয়া কিরণ ছুটিল। ছুট্, ছুট্, ঝম্‌ঝম্ করিয়া একেবারে বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত। ঠাকুরমা হরিনামের মালা হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণকে দেখিয়া কহিলেন, "ঘোড়'র মত ছুট্‌চিস্ কেন লা? মেয়ের দিন দিন আরও ধিঙ্গীপদ হচ্চে!"

কিরণের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ, কি হয়েচে?"

কিরণ বলিল, "না মা কিছু হয় নি!"

দেখিতে দেখিতে শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র গজেন্দ্রগমনে সেই দিকে আগমন করিলেন। তিনি কিরণকে দেখিয়া এক চোট খুব হাসিলেন। তাহার পর ডান হাতের ভেঁপু বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে মাতার অঞ্চল ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মা, আজ বল্‌দিদির বল, বল্‌দিদিকে দেখে ফেলেচে!"

পিতামহী কহিলেন, "সেই জন্যই বুঝি ছুটে এসেছে! হ্যাঁলা তোর কি এতটুকু আক্কেল নেই? এখন আবার বাহিরে গিয়েছিলি কেন?"

কিরণ আবার ছুটিয়া পলায়ন করিল।

রথের তত্ত্ব করা যেমন নিয়ম আছে, সুরেশচন্দ্রকে সেইরূপ তত্ত্ব করা হইয়াছিল। জামাইকে সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। জামাইবাবু দোতালার বৈঠকখানায় বসিলে পর অন্তঃ

পুরে সংবাদ গেল, জামাইবাবু আসিয়াছেন। নবমবর্ষীয় এক শ্যালক আসিয়া জামাইবাবুকে বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। ঠাট্টা তামাসায় সুরেশচন্দ্র খুব মজবুত, অতএব শ্যালক পরাজয় মানিয়া, তামাসা ছাড়িয়া দিয়া স্কুলের ছাত্রদিগের, মাষ্টারের, মিত্রদের বাগানের বড় বড় নিচুফলের গল্প করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর ভিতরে কিরণকে লইয়া মহা গোল আরম্ভ হইল। খুড়ী, পিসী, পাড়ার দু একজন যুবতী, তাহাকে সাবান মাখাইয়া সাজাইতে গুজাইতে আরম্ভ করিলেন। কিরণের মার মুখখানি হাসিতে ভরা, হাজার গোলযোগে সে হাসি এক মুহূর্ত্তের জন্য মিলাইত না, একবার সে নির্ম্মল ললাট কুঞ্চিত হইত না। কখন কেহ তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। তাঁহাকে শান্তির জীবন্ত প্রতিমা বলিয়া বোধ হইত। তিনি যেখানে থাকেন, তাঁহার চারিদিকে যেন সব শান্ত ভাব ধারণ করে। গোলমাল দেখিয়া কিরণের মা সেইখানে আসিয়া কিরণের চুল বাঁধিয়া দিলেন। গোল থামিয়া গেল। তাহার পর কিরণের মা কিরণকে একখানি ভাল কাপড় পরাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "আজ আর হুড়াহুড়ি করো না, লক্ষ্মী মা আমার।"

কিরণ এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইলে পাঁচ জন যুবতী মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, জামাইকে ঠকাইতে হইবে। কেহ বলিলেন, "লুচির মধ্যে ন্যাকড়া দাও।" আর একজন বলিলেন, "কাঁইবিচির সাঁসের

সন্দেশ কর।” কোন সুন্দরী বলিলেন, “পানবাটায় আরস্থলা পুরে দাও।” “জলে নূন গুলে দাও,” এই রকম অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কিরণের মা তাহা শুনিয়া বলিলেন, “না, তা হবে না। ও সব ছাই ঠাট্টা এখন উঠে গিয়েচে। আমার জামাই যেমন, ছেলেও তেমন। খাবার সামগ্রী নিয়ে আবার ঠাট্টা কি? ছি ”

রাত্রিকালে বিচিত্র পালঙ্ক শয্যায় জামাইবাবু শয়ন করিলেন। কিরণ আগেই শয্যার এক ধারে শয়ন করিয়াছিল।

নবীন দম্পতীতে কিরূপ আলাপ, কেমন কথাবার্ত্তা হয়, তাহা সকলেরই জানিতে ইচ্ছা করে। সেই জন্যই স্ত্রীলোকেরা আড়ি পাতে। ছোট বর আর ছোট কনে কেমন করিয়া খেলাঘরের ছেলে মেয়ের মত খর্ খর্ করিয়া বেড়ায়, আর ছেলেমানুষের মত কথা কয়, পুতুলের মত শুইয়া থাকে, সেইটে দেখিতে যুবতীদের বড় সাধ। সুরেশচন্দ্র তেমন ছেলেমানুষ, না হউন, নূতন বর ত বটে। এ দম্পতীর কেমন কথাবার্ত্তা হইল, তাহা শুনিতে হইবে।

সত্য কথা বলিতে কি, বিবাহের পর এ দুই জনের একটাও কথা হয় নাই। সুরেশচন্দ্রের দুই চারি বার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, জামাইষষ্ঠীর সময় পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে দুই দিন ধরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কিরণের এ পর্য্যন্ত স্বামীর সাক্ষাতে মুখ ফোটে নাই। একদিন কিরণ মনে করিয়াছিল,

আজ কথা কহিব, কিন্তু সে দিন কোন মতে মুখ ফুটিতে পারিল না। যতবার মনে করে কথা কহিব, ততবার ঠোঁট জিব কে যেন চাপিয়া ধরে। হতাশ হইয়া কিরণ কথা কহিবার আশা ছাড়িয়া দিল। ভাবিল, আমি কোন কালে কথা কহিতে পারিব না। আমার দিন দিন আরও লজ্জা করে। সুরেশচন্দ্রও কিছু লাজুক, দুই একবার চেষ্টা করিয়া যখন দেখিলেন, কিরণ কথা কয় না, তখন তিনিও সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। লজ্জার বাঁধ দিন দিন শক্ত হইয়া উঠিল।

এ রাত্রে সুরেশচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পালঙ্কে উঠিয়া কিরণের মস্তকের নিকট বসিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি এটা কি?"

কিরণ মাথার উপর বিছানার চাদর টানিয়া দিল।

সুরেশচন্দ্র বস্ত্র মধ্য হইতে একটা কি বাহির করিয়া কহিলেন, "তুমি দেখ্‌বে না, আচ্ছা তবে আমি বাজাই। কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, তুমি বাজাইয়াছ।'

কিরণ মহা ভয় পাইয়া একবার চাদরখানা একটুখানি সরাইয়া দেখিল,—সর্ব্বনাশ! সুরেশচন্দ্রের হাতে সেই ভেঁপুটা রহিয়াছে! অমনি পলকের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের হাত হইতে সেটা ছিনিয়া লইয়া, মোচড়াইয়া, ছিঁড়িয়া, পালঙ্কতলে নিক্ষেপ করিল। তাহাতেও মন উঠিল না! তখন শয্যা হইতে উঠিয়া, দলিত তালপত্র তুলিয়া লইয়া, জানালা গলাইয়া নীচে ফেলিয়া

দিল। রাগে, লজ্জায় অধীর হইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া, সুরেশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া কহিল,

"যাও তুমি। তুমি ভারি দুষ্ট।"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

সুরেশচন্দ্রও তাহাই চান। এতদিনে লজ্জার কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিল।

তার পব কত কথা হইল, তা আমি বলিব না। তোমারও ভাল লাগিবে না। কিরণ ছেলেমানুষ, সেই একরাত্রেই স্বামীর সাক্ষাতে সব কথা বলিয়া ফেলিল। এক এক বার কেমন বাধ-বাধ বোধ হইতে লাগিল, আবার কথায় কথায় তাহা ভুলিয়া গেল। সে সব কথা কেবল সেই দুই জনের ভাল লাগে। তোমার আমার ভাল লাগিবে কেন? সে ঠাকুরমার কথা, মার কথা, খুকীর কথা, স্কুলের মেয়ের কথা, ঠাকুরমা বলেন,—বাড়ীর কানাচে রাত্রের বেলা কে সাদা কাপড় পরিয়া বেড়ায়,—তাহার কথা, দত্তদের বাড়ী কেমন একটি ময়না আছে, সেটি যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে তুই কে?—তাহার কথা, জুঁই ফুলের বরের কথা, মুখুয্যেদের কনের কথা, এইরূপ আরও কত শত কথা হইল, সে সব আর কাহারও তেমন ভাল লাগিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক রকম।

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরে যেমন, এমন আর কোথাও হয় কি? বালক আর বালিকা, দুই জনের হৃদয় কেমন একটু একটু করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়! হঠাৎ চক্ষু মিলন হইলেই দু'জনেই মহালজ্জায় পড়ে। দুয়ারের আড়ালে, থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া বালিকা স্ত্রী, বালক স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকে। জানালার একটি পাখি তুলিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। আবার পশ্চাতে স্বামীর পদশব্দ শুনিলে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়। সেইটুকু মেয়ের কোথা হইতে এত লজ্জা আসে, কেন যে এত লজ্জা, তা জানি না। মনে মনে দু'জনে কত কি ভাবে, তাহারাই জানে। এক বার কবে নিদ্রিতাবস্থায় করে করস্পর্শ হইয়াছিল, দু'জনে তাহাই মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর এক দিন কেশে কেশে মিশিয়াছিল, কপোলে উষ্ণ নিশ্বাস লাগিয়াছিল, কেবল তাহাই মনে পড়ে। আর একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর চারি চক্ষে মিলন হইয়াছিল। সে লজ্জার কথা মনে করিলেই কপোল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। সখীদিগের সঙ্গে খেলার মধ্যে সেই অনিন্দিত মুখখানি মনে পড়ে। কানের কাছে রাজ্যের লোকে দিবানিশি

বলিতেছে, তোর বরের মুখ তেমন ধারাল নয়। চোক দুটি ছোট ছোট, নাক একটু চাপা, ঠোঁট পুরু। বালিকা ভাবিয়া দেখে, কোথাও দোষ দেখিতে পায় না। সব সুন্দর; যতই সে মুখ আর সে মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখে, ততই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর যত রূপ, সব যেন স্বামীর শরীরে। আর সে স্বামী বই পড়িতে গিয়া কেবল সেই মুখখানি দেখিতে পায়। পাতায় পাতায় যেন সেই মুখের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়। শয়ন করিয়া ভাবে, সে তাহার পাশে শুইয়া আছে। ভাবে, তেমন রূপ ত্রিজগতে আর নাই। সেই রূপের ছবি ভাবিতে সে আর কোথাও রূপ দেখিতে পায় না।

কিরণের দিন দিন কত নূতন নূতন সুখ দুঃখ হইতে আরম্ভ হইল, তাহা গণিয়া উঠিতে পারা যায় না। সমবয়সী মেয়েরা কেবল শ্বশুরবাড়ীর, নিজের নিজের বরের, আর কিরণের বরের গল্প করে। যে দিন সুরেশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যান, সে দিন কিরণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। সমবয়সীরা মিলিয়া তাহাকে ঝালাপালা করিয়া তোলে সুরেশচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিলেই তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া ওঠে। ঠাকুর দেবতাদের মানায়, না এলেই ভাল। তাহা হইলে কেহ তাহাকে এমন করিয়া বিরক্ত করে না। আবার ভাবে, আজ রাত্রে কি বলিব, কি বলিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিব? এই ভাবিতে সেই মুখখানি, সে মুখের কথাগুলি মনে পড়ে, আর—আর কি

মনে পড়ে? আর ত কেহ নাই, তবু কিরণের এত লজ্জা কেন? কিরণ মনে করিতেছে,—মনে করিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল—মনে করিতেছে, তিনি আগে কথা কহিবেন না আমার মুখ-চুম্বন করিবেন? আগে কথা না আগে চুম্বন? যদি আগে কথা না কন, তাহা হইলে কিরণ যাহা মনে করিয়াছে, তাহা আর কিছুই বলিতে পারিবে না। শেষ কিরণ রাগ করিয়া ভাবিত, 'মানুষের বিয়ে হয় তাই জানি, আবার এ আসাযাওয়া কেন? তিনি কেন সেখানে থাকুন না, আমি যাঁর কাছে থাকি।" অমনি সেই মুখ, আর সেই মুখের কথা, আর সেই মধুর দৃষ্টি, এক একটি করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত।

এখন কিরণ দিন দিন ডাগর হইয়া উঠিতেছে। বিয়ের জল পড়িলে মেয়েরা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে। যাহাকে এক বৎসর পূর্ব্বে কোলে করিয়াছ, এখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে লজ্জা করে। কিরণের কাজে কাজেই বাহির-বাড়ীতে যাওয়া হয় না। কালে ভদ্রে কখন পূজার দালানে বাহির হইয়া এক বার উঁকি মারিয়াই আবার বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া পালায়। কখন কখন ঝিকে সঙ্গে করিয়া দালানের থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফেরিওয়ালার জিনিসপত্র দেখিয়া পসন্দ করে। সাবানটা, চিরুণীটা, হ'ল একটা খোঁপার জাল, এক গজ মাথার ফিতা, কাঁটা, হয় ত দুট কাঁচের পুতুল কিনিল।

একদিন ধরিল, বড় বড় বিলাতী মুক্তার একছড়া মালা কিনিবে। ফেরিওয়ালা চাচা দেখিলেন, সুবিধা মন্দ নয়। এমন দাঁও কদাচ মেলে। তিনি হাঁকিলেন, এক টাকার এক পয়সাও কম হইবে না।

ঝি বলিল, "মর্ মিন্সে। বাঙ্গাল পেলি না কি? অমন এক ছড়া মালা ছ'গণ্ডা পয়সা ফেল্লে যেখানে সেখানে মেলে।"

চাচা রাগিয়া বলিল, "দর জান না, দর কর কেন? ছ' গণ্ডায় এমন মালা পাওয়া যায় ত আমি দুশো ছড়া এখনি কিনি।"

ঝি বলিল, "ও কথা সবাই বলে। যা, তোর মালা চাইনে। একছড়া বিলিতি মুক্তার মালা বই ত নয়, দিদিমণি, আমায় তুমি পয়সা দিও, আমি আজই তোমায় কিনে এনে দেব এখন।"

এবার চাচা কিরণকে ধরিল। কহিল, "দেখ দিদিমণি, এমন মালা যদি তোমার ঝি আন্‌তে পারে ত আমি যত বলি সব মিথ্যা। এমন জিনিসের এখন আর আমদানী নেই। আমার কাছে বিশ ছড়া ছিল, তার উনিশ ছড়া বেচেছি, আর এই এক ছড়া আছে। তা না নেও, ত আমি যাই। এখনি আর এক বাড়ীতে নেবে এখন।"

কিরণ কহিল, "না তুমি যেও না। আমি ঐ মালা ছড়াটা নেব। তুমি ঠিক দাম বল।"

ঝি রাগিয়া বলিল, "দরওয়ানকে বলি, মিন্সেরে তাড়াইয়া দিতে! ছেলে মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্ছে। আ গেল যা দেড়ে মিন্সে!"

চাচা দাসীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "তা দিদিমণি, তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন আমি কেনা দামেই তোমাকে মালা ছড়া ছাড়িয়া দিব। দেখ, দশ আনা দিও। আমার এক পয়সাও লাভ হবে না। তা হোক, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি নাও। কোন্ পাজি তোমায় ঠকাচ্ছে। যে মিথ্যা বলে সে হারাম খায়।"

কিরণ 'পাজি' কথাটা বুঝিল, 'হারাম' বুঝিতে পারিল না। ভাবিল, একটা ভারি দিব্য হবে।

চাচা হারছড়া কিরণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কিরণ হাত বাড়াইয়া মালা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। দাসী বকিতে বকিতে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

কিরণ মাকে মালাছড়া দেখাইয়া কহিল, "মা আমি এইটে নেব।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম বলে?"

কিরণ। "দশ আনা। তার কম সে দেবে না। সে কত দিব্য কর্‌লে।"

মা। "দশ আনায় যে ভারি ঠকা হবে, মা।"

কিরণ। "তা হোক্। আমি ওটা নেব। তুমি মা তাকে ফিরে দিও না।"

মা ভাবিলেন, আর কদিনই বা বাছা আমার কাছে আছে। আহা ওর যদি নিতে এত ইচ্ছে গিয়েচে, ত কিনিয়া দিই। মুখে বলিলেন,—

"এস মা, আমি দাম দিইগে। কিন্তু এমন করে দাম না জেনে আর কিছু সামগ্রী কিনো না। এখন তুমি বড় হচ্চ, এখন থেকে পয়সা কড়িতে মায়া না হলে কি আর এর পর হবে?"

এই বলিয়া দশ আনা পয়সা ঝির হাতে গণিয়া দিলেন।

কিরণ এখন আর বাহিরবাড়ীতে যাইতে পায় না, সেই কথা বলিতেছিলাম। সুতরাং কিরণ সন্ধ্যার সময় অপর মেয়েছেলের সঙ্গে ছাদে বেড়ায়। সেই সময় পাড়ার দু চারিটি সমবয়সী আসিয়া জোটে। হয় ত এক দিন কিরণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, কিরণের বর এয়েচে। অমনি এক জন কিরণের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, "কিরণ, আয় তোর বরকে দেখ্‌বি আয়।"

কিরণ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "পোড়া দশা আর কি! আমি কেন দেখ্‌তে গেলাম? তোর এত সাধ হয়ে থাকে তুই দেখ্‌গে যা।"

আর একজন ধরিল, "কিরণ তোর বর তোকে ডাকৃচে ভাই।"

কিরণ। "দুর, তোকে ডাকৃচে। ওই শুনেচিস্, তোর নাম ধরে ডাকৃচে। যা, যা, ছুটে যা!"

যে কিরণের হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল, "ওলো, তোর বর যে তোকে উঁকি মেরে দেখ্‌চে।"

কিরণ। "আমায় বৈ কি! আমি ত আর তোর মত সুন্দরী নই যে আমাকে দেখ্‌বে। যা, তুই একবার তোর রূপ দেখিয়ে আয়।"

"অত ঠাট্টা কেন? তুই না হয় সুন্দরী আছিস্। তা, বিধাতা ত সবাইকে সমান গড়ে না। তা বলে অমন করে বল্‌তে নেই।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "রাগিস্ কেন ভাই। আপনার বেলা বুঝি আঁটিসুঁটি। আমায় সকলে মিলে পাগল করে তুল্লেন, আর যাই আমি একটি কথা বলেচি, অমনি মেয়ের রাগ হল। তা এমনি কলি বটে।"

তখন আর একজন আসিয়া কিরণের কাণে কাণে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই কিরণ, তুই না কি সে দিন তোর বরের গলা জড়িয়ে ধরেছিলি?"

কিরণ ঘোর রোষে তাহাকে এক মর্ম্মান্তিক চিম্‌টি কাটিল। কহিল, "মর্ তুই। যত সব বিট্‌কেল কথা। মরণ তোমার।"

কিরণকে ছাড়িয়া তাহারা জামাইবাবুকে ধরিল। বৈঠকখানায় থাকিলে তেমন সুবিধা হয় না, এজন্য জামাইবাবু আর এক ঘরে নীত হইলেন। সেখানে চারি পাঁচ জন সুন্দরী মিলিয়া তাঁহার উপর বচনবাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশ-

চন্দ্র সেই খরতর শরজালে আচ্ছন্ন হইলেন। অভিমন্যু সপ্তরথী মধ্যে পড়িলেন।

প্রথম সুন্দরী কহিলেন, "কি গো সুরেশবাবু ভাল আছ্ত ?"

দ্বিতীয় কহিলেন, "এখন যে আর বড় একটা এদিকে দেখ্‌তে পাইনে। ডুমুর ফুলটি হয়েচ না কি ?"

তৃতীয়। "তুমি না কি বড় সুন্দর ছড়া বাঁধ্‌তে পার ? একটি ছড়া বল না, শুনি।"

চতুর্থ। "বলি, কিরণকে তোমার প'চন্দ হয় ত ?"

সুরেশচন্দ্র নির্ভীক-চিত্ত। এইরূপ বিবিধ প্রহরণেও কাতর হইলেন না, স্থির রহিলেন। কহিলেন, "কার কথায় উত্তর দিই?"

প্রথম সুন্দরী। "সকলের কথার উত্তর দাও।"

সুরেশচন্দ্র। "আমার একটি বই দুটি মুখ নয়। তা, সে মুখটিও তোমাদের রূপে আর তোমাদের কথায় বোবা হয়ে যাবার মত হয়েচে। আমি চার কথার উত্তর একবারে কেমন করিয়া দিব ?"

প্রথম সুন্দরী। "তা না পার্‌লে ত এত ইংরেজি পড়ে, পাস করে কি হল ? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের কথার আর উত্তর দিতে পার্‌বে না ?

দ্বিতীয়। "বাঃ তবে নাকি জামাই তামাসা জানে না ?"

তৃতীয়। "কিরণের যে বেশ বর হয়েচে। আচ্ছা বল দেখি কিরণ কেমন মেয়ে ?"

চতুর্থ। "হ্যাগা সুরেশবাবু, তুমি না কি বড় কুঁদুলে ?"

সুরেশচন্দ্র এতক্ষণ অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিতেছিলেন। এইবার তিনি প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,

"তোমরা অনেক কথা বল্লে। এইবার আমার গোটাকতক কথা শোন। আমি জ্যোতিষ শিখিয়াছি। বল ত তোমাদের মনের কথা বলি।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বল দেখি।"

সুরেশচন্দ্র প্রথম সুন্দরীকে কহিলেন, "তুমি কাল রাত্রে তোমার বরের সঙ্গে কোঁদল করিয়াছ। সত্য বল।"

সুন্দরী অমনি বলিলেন, "ও কি কথা! অমন করলে আমি এখানে থাক্‌ব না, আমি তবে উঠে যাই।"

সুরেশচন্দ্র আর একজনকে বলিলেন, "তোমার বর তোমায় বলেচে, এক সিসি অটো-ডি-রোজ কিনে দেবে।"

তিনি বড় ফাঁপরে পড়িয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা। আমায় যে দিব্য করতে বল, আমি কর্‌চি। সব মিথ্যা।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তাও কি কখন হয়? আমার গণনায় ভুল হইবার যো নাই। তুমি ঠিক বল।"

বেগতিক দেখিয়া সুন্দরীরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমরা যাই। অমনতর কথা বল্লে আমরা এখনি চলে যাব।"

সুরেশচন্দ্রেরই জিত। তিনি সহাস্যে কহিলেন, ; 'না কাহা-

রও যাইবার আবশ্যক নাই। এস, আমরা এখন তামাসা ছেড়ে অন্য কথা কই।”

তখন শান্তি হইল।

আহারাদির পর সুরেশচন্দ্র শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মেঘ।

সহরের ভিতর থাকিলে স্বভাবের শোভা তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী, বড় রাস্তা, এ সব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠ, দীঘি, গাছপালা, বন জঙ্গল দেখা যায় না। সহরের সম্মুখে হরিপাদপদ্মবাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবীর বিচিত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। যে স্রোতের মুখে বলদর্পিত ঐরাবত তৃণ তুল্য ভাসিয়া গিয়াছিল, সে স্রোত আজ বাঁধা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকের উপর সেতু ভাসিতেছে, কূল ইঁটের গাঁথনিতে বাঁধা রহিয়াছে। বর্ষার সময় দুই কূল উদ্বেলিত করিয়া, পাড় ভাঙ্গিয়া, গ্রাম ডুবাইয়া, ঘোর জল-ভঙ্গ রবে, রাজধানীর সম্মুখে ছুটিবার সাধ্য নাই। ইংরাজের দ্বারে অগ্নি বরুণ বাঁধা, কোন দিন চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু লৌহশৃঙ্খলে রাজদ্বারে বদ্ধ হইবেন।

কলিকাতার বড় মানুষ মাত্রেই সহরের বাহিরে একটি করিয়া বাগানবাড়ী রাখেন। বাগানের শোভা দেখাই যে উদ্দেশ্য, তা নয়। বাগানবাড়ী কেন করে, তাহা সকলেই জানে।

সুরেশচন্দ্রের একটু একটু লেখা অভ্যাস ছিল। একদিন এই রকম একটা মেঘের বর্ণনা লিখিয়াছিলেন ঃ—

“প্রভাতসূর্য্যের কিরণে সুবর্ণময় মেঘের ছটা, কোথাও মেঘমালা ভেদ করিয়া কিরণ কিরীটী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একে একে মেঘখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছে। সে স্বর্ণজ্যোতি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন হইলে আবার কত রকম চিত্র অঙ্কিত হয়। কৃষ্ণ মেঘখণ্ড, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অতি শুভ্র রজত রেখা। কখনও আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই, কেবল অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শুভ্র মেঘখণ্ড দিশাহারা তরণীর মত ঘুরিতেছে। আবাব প্রকাণ্ড তুষারশুভ্র পর্ব্বতচূড়া, হিমালয়ের নীহাবমণ্ডিত শৃঙ্গনিচয়কে ব্যঙ্গ করিতেছে। পাংশুমুক্ত খনিজ রজতরাশির তুল্য স্থানে স্থানে রজতেব স্তূপ। স্তূপের উপর স্তূপ। কখনও মেঘমধ্যে অতি ভয়ানক অরুণ-সঙ্কাশ যোগীমূর্ত্তি। মস্তকে ভীষণ জটাজূট, ললাটে ত্রিবলী অঙ্কিত, রক্তবস্ত্র পরিহিত, হস্তে কমণ্ডলু শোভিতেছে। কোথাও তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, কল্লোলিত সমুদ্রতুল্য তরঙ্গায়িত, তরঙ্গ-মুখে শুভ্র ফেণকুসুম ফুটিতেছে। পশ্চিমে অতি মনোহর সৌধশ্রেণী, দ্বিতল, ত্রিতল, ষষ্ঠতল প্রাসাদবাজি। নানাবর্ণে রঞ্জিত, পদ-

মালায় পরিশোভিত। পূর্ব্বদিকে বিশাল বনস্পতি-ভূষিত নিবিড় অরণ্য। শাখা হইতে শাখান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভয়ঙ্কর অজগর সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া ফিরিতেছে। উত্তরে রজত প্রাচীর পরিবৃত অন্ধকার কূপ। কোথাও মেঘনির্মুক্ত শত শত সূর্য্য ঝলসিতেছে। সধূম সপ্তশিখ-বহ্নি জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার দেখ, অতি বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। তাহাতে বালুকার তরঙ্গ উঠিয়াছে। ঝটিকাবসানে নদীর বালুকাসৈকতে যেরূপ সোপান চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, কোথাও বা সেইরূপ রহিয়াছে। তরঙ্গ সোপানের পর সোপান, এইরূপ দীর্ঘ সোপানাবলি বিস্তৃত রহিয়াছে। এদিকে শুভ্র কুজ্ঝটিকা, অপর দিকে জলপূর্ণ, ধূমময় ধীরগতি জলদরাশি। গোধূলীকালে পশ্চিমাকাশে স্বর্ণস্রোত ছুটিতেছে। আর তাহার নীচে হইতে অন্ধকার বদন ব্যাদান করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে সেই রূপরাশি গ্রাস করিবার জন্য ধীরে অগ্রসর হইতেছে। চকিতের মধ্যে সব ফুরাইল। কালমেঘে সব ঢাকিল। স্বর্ণরজতবর্ণ, ইন্দ্রচাপধারী মেঘের হাস্যময় মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সেই মনোহর, নয়নরঞ্জনকারী ইন্দ্রধনু হইতে শর ছুটিল—বিদ্যুৎ! সে ধনুকের টঙ্কার বজ্রনির্ঘোষে হৃদয় কম্পিত করিয়া শব্দিত, প্রতিশব্দিত, পুনঃশব্দিত হইতে লাগিল।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আড়িপাতা—প্রাচীনা ও নবীনা।

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে, নবীনা ও প্রাচীনা। এ দুইজনকে লইয়া সর্ব্বদা তুলনায় সমালোচন চলিয়া থাকে। নবীনাদের অখ্যাতি এবং প্রাচীনাদের সুখ্যাতি করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার বিস্তর আপত্তি আছে। পুরুষে স্ত্রীচরিত্র মীনাংসা করিবার কে? পুরুষ রমণীর কবে কি বুঝিয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে? আর প্রাচীনার সুখ্যাতি করিলে কি লাভ? ঠাকুরুণদিদির ডান্‌লার, অম্বলের সুখ্যাতি কর, তাঁহার তৈয়ারি করা আমের আচারের সুখ্যাতি কর, তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন। অন্য রকম সুখ্যাতি করিয়া দুই দিস্তা কাগজ পুরাইলে তিনি কি বুঝিবেন? তুমি সাদা কাগজের উপর কালো কালো মাথামুণ্ড কি আঁচড় কাট, তাহা কি তিনি কখন পড়িবেন, না বুঝিবেন, আর এখনকার শিক্ষিতা, নভেলপড়া, নবীনার কোন্ সাহসে নিন্দা কর? সে দিন কোন কাগজে নবীনার নিন্দা করিয়াছিল, অমনি একজন নবীনা এমনি এক উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নবীন মহাশয়েরা পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। বাহিরের গালি খাইয়া কি পেট পুরে না যে, আবার

ঘরের লোককে ঘাঁটাইয়া গালি খাও; আমি প্রাণান্তেও কখন নবীনাদের নিন্দা করি না! হয় ত এইমাত্র বলি যে, ঠাকুরুণদিদি মরিলে, সরিষা ফোড়ন দিয়া এমন সুন্দর অম্বল, আর এই উপাদেয় মোচার ঘণ্ট কে রাঁধিবে? কোন কোন নবীনা মাছ মাংস খুব ভাল রাঁধিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু, হায়, এমন সুক্ত প্রাচীনা ছাড়া আর কে রাঁধিতে জানে?

অন্য দিকে যতই অসাদৃশ্য হউক, আড়ি পাতিতে দুইজনেই সমান। সুরেশচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী গেলে, বুড়ী যুবতী সকলেই আড়ি পাতিতেন। নবীনা ও প্রাচীনা উভয়েই আড়ি পাতিতে ভাল বাসেন; সত্য বলিলে ধর্ম্ম তুষ্ট হন,—বোধ করি, যুবতীরা আড়ি পাতিতে আরও অধিক ভাল বাসেন। আড়িপাতাকে কেহই ভাল বলে না, কিন্তু আড়ি পাতিতে কেহ ছাড়েও না। আড়িপাতা পদ্ধতি কেমন করিয়া আরম্ভ হইল?

আড়িপাতা বাল্যবিবাহের একটি ফল। আমার বোধ হয়, আড়িপাতা প্রথমে তেমন দোষের ছিল না। প্রেম যেমন স্বার্থপর, এমন আর কেহ নয়। স্বামীতে স্ত্রীতে প্রেম,—আর কেহ তাহার কিছুই জানিতে পারে না। দুজনে যা কথাবার্ত্তা কয়, অপর লোকে তার একটা কথাও শুনিতে পায় না। ভালবাসার একটা গুণ আছে, যে দেখে, তারও মনে একটু আহ্লাদ হয়, কিন্তু যুবক যুবতীর ভালবাসা আর কাহারও চোক সহিতে পারে না। দুজনে আপনাকে লইয়া এমনি মজিয়া থাকে যে, তাহারা

আর কাহারও দিকে ফিরিয়া চায় না, আর কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। কিন্তু বালক বালিকার তা হয় না। তাহারা প্রণয়ের স্বার্থপরতা জানে না, কোমলতা মাত্র জানে। তাহাদের ভালবাসায় অন্য লোকে ভাগ বসাইলে কিছু ক্ষতি হয় না। যাহারা আড়ি পাতে, তাহারা মনে করে, আমরাও এককালে এমনি সরল ছিলাম। বুড়ীরা কত পুরাতন কথা মনে করে, যুবতীরাও নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করে যে, আমাদের আর সে দিন নাই। কিন্তু এখন আর তেমন বাল্যবিবাহ হয় না। আড়িপাতাও যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই ভাল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ছল ধরে।

কিরণ বাড়িতে লাগিল। বার বছর উতরাইয়া তেরোয় পড়িল। সুরেশচন্দ্র খুব ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী আসেন না বটে, কিন্তু প্রেমের আঁটাআঁটি হইতে কতক্ষণ? প্রেমের কল্পতরু পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের মূল দুই জনের হৃদয় মধ্যে।

এ দম্পতীর প্রণয় যে খুব নূতন রকম হইল, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সে সব অর্থহীন আদরের কোটী কোটী কথা,

সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া চোখোচোখি, সে হাতধরাধরি করিয়া মুখ চাওয়াচায়ি, সে অভিমান, সে মধুর লাঞ্ছনা, সে সব ঠিক সেই রকম আর কখন হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিরণ প্রথম প্রথম ভারি গোলে পড়িয়াছিল। পাড়ার সব যুবতীরা মিলিয়া তাহাকে প্রণয়ের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। "তোর বরের সঙ্গে এমনি করিয়া কথা কহিবি, এমনি করিয়া বরের মন রাখিবি, এমনি করিয়া মান করিবি, আবার একটু, একটু, একটু করিয়া, এমনি করিয়া, এমনি করিয়া সে মান ভাঙ্গিবে।" যদি কিরণ এই শিক্ষামত কাজ করিত, তাহা হইলে আমি বিনা ওজরে স্বীকার করিতাম যে, সে নূতনতর কিছুই করে নাই। কিন্তু গোড়াগুড়িই বড় বিভ্রাট হইয়াছিল। কিরণ যাহা শিখিয়াছিল, সব উলট পালট গোলমাল হইয়া গেল। শিক্ষার সঙ্গে কিছুই মেলে না। না তেমন কথা কহা হয়, না তেমন মন রাখা হয়, না তেমন অভিমান করা হয়। সব নূতন। কিরণ পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া আপনি যেমন পারিল, তেমনি ভাল বাসিতে শিখিল। কাজেই তাহাদের ভালবাসা বড় নূতন রকম হইল।

কিরণ আর তত চঞ্চল নাই। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায় কোন কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না, না পারিলে হাসিয়া ফেলে। ঠাকুরমা রাগ করিতেন, কখন কিরণকে, কখন কিরণের মাকে বকিতেন। কিরণের মা

কিরণের কোন অকর্ম্ম দেখিয়া হাসিলে, ঠাকুরমা বলিতেন, “ও কি বউ মা, ছেলে পুলেকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। অকর্ম্ম কোর্‌লে কোথায় তুমি শাসাবে, না তুমি আরও হাস্‌চ? কিরণ যদি ছেলে হ্‌ত, তা হলে অমন আদর সাজ্‌ত। মেয়ের কি অমন আদর কোর্‌তে আছে? আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যখন গৃহস্থের কাজ কোর্‌তে পারবে না, তখন নিন্দা হবে কার, তোমার না আমার?” কিন্তু ঠাকুরমা যাই বলুন, কিরণের উপর আমার কিছুতে রাগ হয় না। এমন হাসি হাসি সোণার মুখখানি দেখিয়া কি তার উপর রাগ করা যায় গা? না, যে মেয়ে দুদিন পরে পরের ঘরে যাবে, তাকে মন্দ কথা বলা যায়?

তোমরা কিরণকে সুন্দরী বল আর নাই বল, আমি তাহাকে সুন্দর দেখি। আর সুরেশচন্দ্র যে তাহাকে কত সুন্দর দেখিতেন, তা বলা যায় না। কিরণ আগের চেয়ে শান্ত হইয়াছে। রূপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ থক্ থকে গড়ন, রং আগের চেয়েও সুন্দর। চোখের চাহনি স্থির, শান্ত, একটুখানি আলস্যমাখা। সুরেশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, চক্ষের তারা কটা নয়।

আমার মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে, কিরণের বিদ্যাশিক্ষার ও সূচী-শিল্পের প্রশংসা করিব। কিন্তু কিরণ, অসেয়ানা মেয়ে, আমার সে সাধে বাধ সাধিয়াছে। কিরণ যে বই পড়িতে একেবারে নারাজ, তা নয়। গল্পের বই পাইলে পড়িতে ভাল বাসে,

কিন্তু আর কোন কেতাব হাতে করিলেই তাহার হাই ওঠে, চোক যেন বুজিয়া আসে। সূচের কাজ চলনসই এক রকম শিখিয়াছিল, কার্পেট, জুতা, গলাবন্দ বুনিতে পারিত বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজে তেমন পাকা হইয়া উঠিতে পারে নাই। এক বার একখানা ছাঁটা ফুলের আসন বুনিতে গিয়া, কাঁচি দিয়া পশম কাটিবার সময় বড় হাসাইয়াছিল। দুটা ফুল সমান কাটিতে পারে নাই। একটা উঁচু, একটা নীচু করিয়া ফেলিল,—দেখিলে বোধ হয়, যেন কাকে ঠোকরাইয়া রাখিয়াছে। সে আসনখানা সেই অবধি কিরণ যে কোথায় একটা কাপড়ের সিন্দুকের কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

এক দিন রাত্রে সুরেশচন্দ্র দুই হাতে কিরণের মুখ ধরিয়া, অনেকক্ষণ তাহার মুখ দেখিয়া কহিলেন, “কিরণ, তুমি যে আরও সুন্দর হচ্চ।”

কিরণ কহিল, “যাও, তামাসা কোর্‌তে হবে না,” এই বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

একটু পরে সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন, “কিরণ, আমি কি ভাবি জান?”

কিরণ মুখ তুলিয়া, স্বামীর মুখে চোক রাখিয়া কহিল “কি?”

সুরেশচন্দ্র। “আমি ভাবি যে আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে, তুমি সুখে থাক্‌তে পার্‌তে। আমি কি কখনো তোমায় তেমন আদর যত্ন কোর্‌তে পার্‌বো?”

কিরণ রাগ করিয়া সরিয়া বসিল। বলিল, "কি কথাই শিখেছেন! রাগ ধরে। আমি তোমার ছাই ছাই কথা শুন্‌তে চাইনে।"

সুরেশচন্দ্র একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি যদি রাগ কর, তা হলে না হয় আর বল্‌ব না, আর আমার কাছে আস্‌বে না?"

নিশ্বাসটি পড়িল, কিরণ শুনিতে পাইল। দেখিল, স্বামীর মুখে বিষাদের চিন্তা। আর কি রাগ থাকে? কিরণ আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া, স্বামীর একটি হাত তুলিয়া লইয়া আপনার গালের উপর রাখিল। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বড় কোমল স্বরে কহিল, "তুমি কি ভাব্‌চ, আমায় বল না।"

কিরণ ত এই টুকু মেয়ে, কিন্তু সে ইহারই মধ্যে স্বামীর দুঃখের ভাগ চায়। যে দুঃখের ভাগী নয়, সে কেন সুখের ভাগী হইতে চায়?

সুরেশচন্দ্র কিরণকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। কহিলেন, "আমি কোন দুঃখের কথা মনে করি নি। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার এখানে ভাল লাগে, না পাড়া গাঁয়ে ভাল লাগে?"

কিরণ স্বামীর মুখে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া কহিল, "রক্ষা কর! পাড়াগাঁয়ের আর নাম কোরো না। এইখানে বেশ। পাড়া-

গাঁয়ে না কি আবার মানুষ থাকে! মাঠের মাঝখানে একলাটি,—মাগো!"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "মাঠের মাঝখানে ভয় কিসের? এখানে কেবল গলি ঘুঁজি, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌বার যো নেই। পাড়াগাঁয়ে বেশ ফাঁকা, কোন বালাই নেই। পাড়াগাঁ মন্দ হল কিসে?"

কিরণ। "না, বড় ভাল। কেবল চারিদিকে গাছ, আর অন্ধকার, আর শেয়াল। সন্ধের সময় পুকুরে কাপড় কাচ্‌তে যাও, পথে কেবল বাঁশ ঝাড়। ঘোরঘোরের সময় বাড়ী ফিবে আস্‌তে হয় ত একটা বাঁশ নুয়ে ঘাড়ে পড়ল,—সে কথায় কাজ নেইক—মনে কর্‌লে কেমন গা শিউরে উঠে!"

সুরেশচন্দ্র। "আমি যদি তোমায় পাড়াগাঁয়ে নিয়ে যাই।"

কিরণ। "তা হলে যাব। আর কোন দিন ভূতে ঘাড় মুচ্‌ড়ে খোবে। তোমার ত তা হলে বেশ হয়, আর একটি সুন্দর দেখে বিয়ে কর্‌বে।"

সুরেশচন্দ্র। "আমি বুঝি রাগ কর্‌তে জানিনে? এখন থেকেই বুঝি মন্দ কথা বল্‌তে শিখ্‌চ?"

কিরণ হাসিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ তুমি কি ভূত আছে বিশ্বাস কর?"

কিরণ বলিল, "তা করি আর না করি, লোকে ত বলে।"

তার পর খানিকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। কিছু পরে সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "বড় গরম বোধ হচ্চে, জানালার একটা পাকি খুলে দাও ত।"

কিরণ ছল ধরিয়া ভারি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "জানালা আবার কোন্ দেশী কথা? আমাদের কেউ জানালা বলেনা।"

সুরেশচন্দ্র। "তবে কি বলে?"

কিরণ। "জান্‌লা বলে।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাদের দেশী সব কথা জানে, এমন একটি বর তোমার জুটিলে বেশ হইত। আমি একটি খুঁজব না কি?"

কিরণ কোন কথা না কহিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, সুরেশচন্দ্র তাহার হাত ধরিলেন। কহিলেন, "আগে ঠাট্টা কর কেন?"

এ রকম যে কতবার হইত, তা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও গণিয়া উঠিতে পারি নাই। কিরণ কথায় কথায় ছল ধরিত। ছল ধরাধরি, রাগারাগির পালা পড়িয়াছিল। খুব ভালবাসা না হইলে ধাঁ করিয়া ছল ধরা যায় না। ছোট ছোট মেয়েগুলি কিছু বেশি ছল ধরে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভালবাসার কিছু বেশি ছড়াছড়ি। একটু বড় হইলে, আর তত সহজে ছল ধরে না। যে তোমার কথায় ছল ধরে, সে তোমায় ভাল বাসে।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন মানুষ।

এই সময় কিরণের একটি নূতন সঙ্গিনী জুটিল। মেয়েটির নাম লীলাবতী। কিরণের বয়স তের বছর, লীলাবতীর সতের। কিন্তু এমন দু চার বছরের ছোট বড় হইলে কিছু আসে যায় না। এই দুই জনে খুব ভাব হইল।

অলৌকিক রূপের বর্ণনা অনেক পড়িতে পাওয়া যায়। সুন্দরী রমণীর এমন ছবি দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয়, এমন রূপ পৃথিবীতে নাই। কিন্তু কোন সময় জীবন্ত এমন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রূপের কল্পিত আদর্শ অপেক্ষা অধিক সুন্দর বোধ হয়। সে রূপ একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না। যখন তখন, চলিতে ফিরিতে, সুখের সময়, দুঃখের সময় কেবল সেই রূপের ছবি মনে পড়ে।

বোধ করি, লীলাবতীর রূপ সেই রকম।

এমন রূপ ত আমি কোথাও দেখি নাই; কিন্তু এ রূপ না দেখিলে আমি ভাল থাকিতাম. রূপ ত আনন্দের জন্য হইয়াছিল, তবে এ রূপ দেখিয়া চক্ষে জল আসে কেন? এমন চন্দন কাঠের পুত্তলিতে কোথায় ঘুণ ধরিয়াছে? এত রূপে এত

বড় খুঁত কোথায়? এ রূপ ত পূর্ণ নয়, একটা কিছু গুরুতর অভাব আছে। এমন রূপ পূর্ণ নয় কেন?

লীলাবতী বিধবা।

লীলাবতীর বয়স যখন চৌদ্দ বছর,তখন সে বিধবা হয়। এখন তাহার বয়স সতের বছর। সে এই তিন বছর বিধবা হইয়াছে।

দেখ, তোমরা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ! সে দিন সে রূপে আলো করিয়া, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া কত আহ্লাদে বেড়াইত। যখন এক ঘর বড়মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, তখন তাহার রূপের প্রশংসা কাহারও মুখে ধরে না। যাহারা কোথাও নির্দ্দোষ সুন্দরী দেখিতে পায় না, তাহারা সে রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "ঢের ঢের সুন্দরী দেখেছি বাপু, এমন রূপ কখনও দেখিনি।" কেহ বলিয়াছিল, "ইটি কাদের বউ গা? এত রূপ ত কোথাও দেখিনি! ঠিক যেন ছবিখানি! যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ!" সে কথা এখনও লীলার কাণে লাগিয়া আছে। এ সব যেন কালিকার কথা। আহা দেখ, দু হাতে দু গাছি বালা পরিত, আজও যেন হাতে তাহার দাগ রহিয়াছে! মাথায় যেখানে চিরুণী দিয়া সিঁতে কাটিয়া সিঁদুর পরিত, সেখানে দু চার গাছি চুল এখনও উঠে নাই। ছোট পা দুখানিতে এখনও মলের কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। তিন বছর আগে সে সুন্দরী ছিল, এখন কি আর তেমন সুন্দরী নাই? হাত দুখানি শুধু, তবু যেন কত

গহনা পরাইয়া রাখিয়াছে। এমন হাতে যদি সোনা দানা না উঠিল, এমন অঙ্গে যদি মণি মুক্তা না উঠিল ত গহনা কেন হইয়াছিল? আহা, লীলা এমন শান্ত মেয়ে সে কখন কাহাকে ভুলিয়াও মন্দ বলে নাই, ঝি চাকরদের কখন তুমি বই তুই বলে নাই। কি অপরাধে, কোন পাপে, এই বয়সে তাহার কপাল পুড়িল? তাহার কোন সাধ মেটে নাই, কোন আশা পূরে নাই, কোন দুঃখ ঘুচে নাই, তবে সে কেন এই বয়সে চিরবিধবা হইল? বিধাতা কেন তাহাকে এত রূপ দিয়া গড়িল, কেনই বা তাহার ললাটে অনন্ত যন্ত্রণাময় চিরবৈধব্য লিখিল? লীলা অশান্ত নয়, দেখিয়া শুনিয়া, সব মাটি মাড়াইয়া হাঁটে, সে কেন এমন অন্ধকূপে পতিত হইল? সেদিন হাঁটিবার সময় পায়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজিত, আজও সে এক এক সময় চমকিয়া উঠিয়া ভাবে, আমার পায় মল নাই কেন? অমনি সব মনে পড়ে। আগে সে যেখানে যাইত, পাড়াশুদ্ধ স্ত্রীলোকে তাহাকে দেখিতে আসিত, এখন তাহাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া যায়। কেহ একবার আহা বলে, কেহ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার পর অন্যদিকে চলিয়া যায়। দু দিন আগে সে যেন চন্দন মাখিয়া বসিয়াছিল, সেই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া লোক জড় হইত। এখন যেন সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছে, এজন্য কেহ তাহার নিকটে আসে না। আগে পাড়ায় কোথাও বিবাহ হইলে, তাহাকে এয়ো বলিয়া সকলের আগে ডাকিতে

আসিত। এখন সধবাদের সঙ্গে থাকিলে লোকে ভাবে, তাহাদের অমঙ্গল হইবে। যে শাশুড়ী বউমা বলিতে অজ্ঞান, তিনি এখন ডাইনি, পোড়াকপালী, সর্ব্বনাশী, আরও কত কথা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন। বল দেখি, লীলার কি অপরাধ? কপালে যাহা ছিল, তাহা ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার এ গঞ্জনা কেন? নূতন নূতন একাদশী করিতে যে কি কষ্ট, তাহা বলিবার নয়। সকাল বেলা লীলা মুখ না ধুইতে, শাশুড়ী খাবার হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন,—"বউ মা, জল খাবে এস।" আর যখন বৈশাখ মাসের রৌদ্রের সময় অনাহারে, পিপাসায় পাগল হইয়া সেই সোণার পুত্তলি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন কেহ তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিল না, কেহ একবার সেই ধূলিধূসরিত অশ্রুবিগলিত করুণ মুখখানি আপনার আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল না। লীলা যখন মাটি হইতে মুখ তুলিয়া, ভাঙ্গা-গলায় বলিল, 'আমার প্রাণ যায়। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেল। এক ঘোঁটা জল খেতে না দাও, আমার হাতে মুখে একটু জল দাও। ওগো, তোমাদের সকলের পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও," সে সময় কেহ একবার তাহার ঘরে উঁকি মারিল না। কেবল একটা দাসী তাহার দুঃখে কাতর হইয়া কাছে বসিয়া দুটা সান্ত্বনাবাক্য বলিয়াছিল। তাহার পর নির্জলা একাদশীর কষ্টও ক্রমে সহিয়া গেল। প্রথম প্রথম লীলা লুকাইয়া লুকাইয়া কত কাঁদিত।

রাত্রি হইলে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না, চক্ষের জলে কাপড়, বালিশ সব ভাসিয়া যাইত। যুবতীরা যেখানে জড় হইয়া চুপি চুপি গান করিত, লীলা সেখানে যাইত না। সে কখনও কাহারও কাছে দুঃখ করিত না, কাহারও কাছে "আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিত না। সে যে বড় বুদ্ধিমতী, সে একেবারেই বুঝিল যে, তাহার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না, আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। পরের কাছে কাঁদিলে কি হইবে? তাহার দুঃখ ত এ জন্মে আর ঘুচিবে না। সংসারে যত সুখ আছে, সব সুখের দুয়ারে কাঁটা পড়িয়াছে।

বিধবা হইয়া লীলা শ্বশুরবাড়ীই রহিল। সে আগে ঘরের লক্ষ্মী ছিল, এখন যেন ঘরের অলক্ষ্মী হইয়া উঠিল। সকলে হতশ্রদ্ধা করে, খোঁটা দেয়, প্রায় দুর ছাই করে। লীলা কখন একদিনের তরেও মুখ তুলিয়া একটি কথা বলে নাই। যার সব ফুরাইয়াছে, তার এটুকু অধিক দুঃখে কি হইবে?

লীলার পিতা নাই। মাতা দুঃখী। তিনি লোকের মুখে লীলার যন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন; লীলা তাঁহাকে নিজে কখন কিছু লিখিত না, চিঠি লিখিলেই লিখিত, ভাল আছি। কন্যার কষ্ট শুনিয়া মার প্রাণ স্থির রহিবে কেন? তিনি লীলাকে একবার দেখিবেন বলিয়া আনাইলেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না। লীলা মার কাছে রহিল।

এইরূপে দুই আড়াই বছর গেল। তাহার পর লীলার মাতার মৃত্যু হইল। লীলার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। একবার ভাবিল, শ্বশুরবাড়ী সংবাদ পাঠাই। আবার ভাবিল, আমি সেখানে গেলে তাঁহারা ত সন্তুষ্ট হবেন না। লীলা চক্ষের জল মুছিল। মাতার মৃত্যু হইলে সে বড় কাঁদে নাই। দুঃখে দুঃখে তাহার হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল, আমিও কেন মরি না? আবার ভাবিল, আর কি বাকি আছে? খেতে না পাই, ভিক্ষা কর্ব। তা না পাই, উপোস কর্ব।

শ্বশুরবাড়ী হইতে লীলাকে লইতে আসিল না। কিরণের মা গ্রাম সম্পর্কে লীলার মাসী। তিনি সব শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ পাল্কী, বেহারা, ঝি, দরওয়ান পাঠাইয়া দিলেন। লীলার বাপের বাড়ী কলিকাতা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ। লীলা কলিকাতায় আসিল। কিরণের মা তাহাকে কন্যার অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। মাতার মৃত্যুর পর লীলা আর কাঁদিত না, পিতৃগৃহ শুষ্ক চক্ষে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কিরণের মার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বিধবাকে যে কেউ এমন যত্ন করে, তা আমি আগে জান্‌তাম না।"

লীলাকে দেখিয়া কিরণও একবার কাঁদিয়াছিল। তার পর লীলাকে দিদি বলিয়া ডাকিল, তাহাকে ভাল বাসিল।

লীলাকে সকলে এত যত্ন করে দেখিয়া, কিরণও তাহাকে সাধ্যমত যত্ন করিত। লীলার কিসে মন ভাল থাকে কিরণের সেইটা মস্ত ভাবনা। লীলার মন ভাল থাকিবে বিবেচনা করিয়া, সে তাহার কাছে আপনার সুখের কথা বলিত। স্বামীর ভালবাসা, দুই জনের অনুরাগ, স্বামীর সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইত, সব লীলাকে বলিত। যে সব বড় লুকান কথা, বড় ভালবাসার কথা, তাহাও বলিতে আরম্ভ করিল। কিরণের এত বুদ্ধি ছিল না যে, সে সব তলাইয়া ভাবিবে। তাহার কথায় যে লীলার দুঃখ হইতে পারে, কিরণ তাহা কখন মনে করিত না। যে সব কথায় তাহার এত আহ্লাদ হয়, যে সব কথা সে দিন রাত মনে করে, তাহাতে যে আর কাহারও কিছু দুঃখ হইতে পারে, কিরণ স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে পারিত না। বাস্তবিক কিরণের সুখের কথা শুনিয়া লীলার মন অনেক ভাল থাকিত। কেবল একটা দোষ ঘটিত। কিরণের স্বামীর কথা শুনিয়া লীলার নিজের স্বামীকে মনে পড়িত। যদি সে স্বামী ভাল হইত, তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কি পোড়া কপাল দেখ। তেমন দেববাঞ্ছিত স্ত্রীরত্ন পরিত্যাগ করিয়া লীলার স্বামী বারবিলাসিনীতে আসক্ত হইয়াছিল। লীলা স্বামীকে মনে পড়িলেই, ঘূর্ণিত রক্তচক্ষু, মুখে দুর্গন্ধ আর অশ্রাব্য কটু গালি, স্খলিতবসন, অস্থিরগতি যুবককে চক্ষের সম্মুখে দেখিত। অত্যাচারে, অনিয়মে, অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার মৃত্যু হয়।

কেবল মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার চৈতন্য হইয়াছিল। তখন লীলার সাক্ষাতে কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত স্ত্রীকে আমি এত দিন ফিরিয়া দেখি নাই। এখন এই বয়সে তোমায় পাথারে ভাসাইয়া চলিলাম। আমার নরকেও স্থান হইবে না।" লীলা সব ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বামীর পা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত কাঁদিয়াছিল, কত ঠাকুর দেবতাদের মানাইয়াছিল। স্বামী যাই হউক, গেলে ত আর আসিবে না। কিন্তু যম লীলার মুখ চাহিল না, যাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে লইয়া গেল। লীলা আর সব ভুলিয়া স্বামীর সেই শেষ কয়টি কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মনে পড়িলে সুখের কথা যেমন মনে পড়ে, দুঃখের কথা তার চেয়েও বেশী মনে পড়ে।

কিরণ অবুঝ মেয়ে। এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমার স্বামী কি তোমায় ভাল বাস্‌তেন?"

লীলা অনেকক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আগে বাস্‌তেন না।"

কিরণ কহিল, "সে কি। তোমার মত সুন্দরী, শান্ত স্ত্রীকে ভাল বাস্‌তেন না?"

লীলার চক্ষে জল পূরিয়া আসিতেছিল। বলিল, "তিনি শেষাশেষি আমায় ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু সে ভালবাসা আমার অদৃষ্টে বেশি দিন ছিল না।"

কিরণ লীলার মুখ দেখিতেছিল। সে লীলার গলা জড়াইয়া

ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি চক্ষের জল ফেল না, দিদি। আমি আর কখন তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব না।"

লীলা চোক মুছিয়া একটু হাসিল। কহিল, "আমি ত কিছু মনে করি নি। তোমার যখন যা ইচ্ছা হবে, তাই জিজ্ঞাসা কোরো।"

কিরণ সেই অবধি আর কখন লীলার স্বামীর কথা পাড়িত না।

দশম পরিচ্ছেদ।

লীলা।

লীলার বয়স সবে সতের বছর। জীবনের নিগ্রহ আরও কত দিন আছে, কে জানে? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেমন করিয়া কাটিবে? কেমন করিয়া জীবনের দীর্ঘ রাত্রি পোহাইবে, এ অন্ধকারে কত কাল মরণের পথ চাহিয়া থাকিবে? কাহার মুখ চাহিয়া সে জীবনের ভার বহন করিবে? সবাই মরে, কেবল পোড়া বিধবার মরণ নাই। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, মরণের কোলে শয়ন করিতে পারিলে তাহার প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু যম তাহাকে ছোঁয় না, তাহার ছায়া মাড়ায় না। যে দিবানিশি মরণের পথ চাহিয়া থাকে, তাহার দ্বারে

একবার ঘা যাবে না। বাড়ীতে কঠিন পীড়া হইয়াছে, বাপ গেল, কার্ত্তিকের মত ভাই, স্বামীসোহাগিনী ভগিনী, কচি কাচা সব গেল, শূন্য ঘরে হাহাকার উঠিল, কেবল সেই হতভাগিনী বিধবা মরিল না। বিধবা হইলেই যেন অমর হয়। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, জীবনের সব বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যায় না। যাহারা চিরবৈধব্য বিধি করিয়াছিল, তাহারা কি মরণের সঙ্গেও কিছু পরামর্শ করিয়াছিল? যাহাকে মানুষে ঠেলিয়া রাখে, তাহাকে কি যমও ডাকিয়া লয় না? যাহাকে মানুষে পরিত্যাগ করে, তাহাকে কি যমও পরিত্যাগ করে? আমোদে আহ্লাদে, কাজে কর্ম্মে বিধবার কোন অধিকার নাই, তবু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অন্য মানুষে অন্য স্ত্রীলোকে যেমন বাঁচিয়া থাকে, তেমনি থাকিতে হইবে, কিন্তু আর সব পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যের শরীরে যেমন সুখ দুঃখ আছে, তাহারও তেমনি আছে। কিন্তু মনুষ্যজন্মের কোন সুখ তাহার কপালে ঘটে না। দেখ, সে ধর্ম্ম কর্ম্ম জানে না, মনের দৃঢ়তা জানে না, তপস্যা সাধনা জানে না, ইন্দ্রিয় দমন করিতে তাহাকে কেহ কখন শিখায় নাই, সংসারের ভোগাভিলাষেই তাহার মন নিরত, এমন সময় তাহার মাথায় বাজ পড়িল। সংসারে থাকিয়া, সংসারের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের মধ্যে থাকিয়া, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, তাহাকে সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। সুশীতল জলে কণ্ঠ

পর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখিয়া, মাথায় আগুন জ্বালিয়া পুড়িতে হইবে, জ্বালানিবৃত্তির জন্য এক ফোঁটা জলের তরে হাত বাড়াইতে পারিবে না। কাল সে যে পানটি খাইত, আজ সেটি খাইতে নাই, কাল সে কালাপেড়ে বুলুদেওয়া যে কাপড়খানি পরিত, আজ সেটি পরিতে নাই, কাল সে যেমন হাসিত, আজ তেমন হাসিতে নাই, কাল যে গানটি গাহিত, আজ সেটি গাহিতে নাই, কাল যাহার সঙ্গে কথা কহিলে কেহ মন্দ মনে করিত না, আজ তাহার সহিত কথা কহিলে লোকে কাণাকাণি করে! কাল সারাদিন ছাদে বেড়াইয়াছিল, কেহ একবার তাহা লক্ষ্য করিয়াও দেখে নাই, আজ তাহার ছাদে উঠিয়া চুল শুকাইতে নাই। কাল সে যেখানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, আজ সেখানে যাইতে নাই। কাল যা ছিল, আজ তা কিছু নাই, কিন্তু মানুষ ত সেই। তার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তার উপর আবার এত দুঃখ কেন?

লীলা বড় দুঃখী, তোমরা একবার তার মুখের দিকে তাকাও। দেখ, সে একলাটি জগৎসংসারের একটি কোণে দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া ফেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গণেশচন্দ্র দত্ত।

কালেজে গণেশচন্দ্র দত্ত নামে সুরেশচন্দ্রের এক বন্ধু ছিলেন। দুই জনে এক সঙ্গে পড়িতেন। গণেশচন্দ্র দেখিতে বড় সুপুরুষ নন, কিন্তু পড়াশুনায় বেশ মন ছিল। বিষয়-বুদ্ধিতেও পাকা। দুই জনে বড় ভাব। দুই জনের বাড়ীতে আসা যাওয়া প্রায়ই ছিল।

এবারে পরীক্ষায় সুরেশচন্দ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। গণেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গাউনে ঢাকিয়া, শামলা পরিয়া, ডিগ্রী আনিতে গিয়াছিলেন, তখন না কি তাঁহাকে খুব মানাইয়াছিল। ডিগ্রী লইয়া, ধড়া চূড়া ছাড়িয়া, বাঁকা সিঁতে কাটিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, তিনি সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন।

গণেশচন্দ্রের মনে কি ছিল, জানি না। প্রকাশ্যে সুরেশচন্দ্রের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "দেখ, সকলেই সকল বারে পাস করিতে পারে না।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তা ত দেখিতেই পাইতেছি।"

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু সে জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "সে কথাটাও ঠিক!"

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "আবার চেষ্টা কর্‌বে না কি?"

সুরেশচন্দ্র। "কাজেই।"

"আচ্ছা, তবে আমি এখন যাই। আবার দেখা হবে এখন।"

গণেশচন্দ্রের সঙ্গে আমাদেরও আবার দেখা হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরমা।

কিরণের পিতামহী সেকেলে মানুষ, ষাট সত্তর বছর বয়স হবে। সেকেলে লোক হইলেই, এ কালের লোকের চক্ষে তেমন ভাল দেখায় না। সেকেলে চকমিলান বাড়ী, এখনকার নব্য লোকের ভাল লাগে না। এখন সব নূতন হইতেছে, পুরাতন কিছুই ভাল নয়, কিছুই থাকিবে না। যত কিছু সেকেলে আছে, তাহার মধ্যে সেকেলে বিধবা, সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন। সেকেলে বৃদ্ধ, আর এখনকার শিক্ষিত যুবায় যত না প্রভেদ সেকেলে বুড়ী, আর এখনকার সভ্য যুবতীতে তত প্রভেদ। কোন যুবতী, আর এক জন যুবতীর সঙ্গে দেখা হইলে আপনি

বলিয়া সম্বোধন কবেন, বেশ দস্তুরমত নমস্কার করেন, লেখা পড়া পুস্তকাদির কথাবার্ত্তা হয়, আবও সব সভ্যতানুমোদিত, সুরুচিসম্পন্ন কথাবার্ত্তা হয়। আব এক জন সেকেলে বুড়ী, চেনা নাই, শুনা নাই, একেবারে 'তুমি' বলিয়া, হাত ধরিয়া হড়্ হড্ করিযা টানিয়া ঘরে বসাইবে। তাহার পর গায়ের গহনা দেখিবে, স্বামীর কত মাহিযানা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, শাশুড়ী কি করিতেছেন, বাড়ীতে কে রাঁধে, আজ সকালবেলা কি রান্না হইল্, এক নিশ্বাসে সব জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে নবীনারা রাগ না কবিবেন কেন?

কিরণের পিতামহীব এ সব দোষগুলি ছিল। নহিলে লোক নেহাত মন্দ নয়। তিনি ছেলেদেব জ্বালায এক এক বার ভারি ত্যক্ত হন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু দলাদলি করিতে এক জন অগ্রগণ্য দলপতি। তাই বলিয়া অখাদ্য বাদ যায় না। রাত্রিকালে জনৈক সদাড়িক সূপকাব, বস্ত্রমধ্যে রোষ্ট, কট্‌লেট্, চপ্, করি প্রভৃতি দেবদুর্লভ উপাদেয় সামগ্রী আনযন করিত, চৌধুরী মহাশয় কাঁটা চাম্‌চে ধরিযা, সেই মহাপ্রসাদ উপযোগ করিতেন। ছুরী কাঁটা ধরা তেমন ভাল অভ্যস্ত ছিল না, কাঁটাটা প্রায় উল্টাইয়া ধরিতেন, এক এক বার কাঁটা চাম্‌চে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পরিচালনা করিতেন। শুনা যায, এক বার উইল্‌সনের হোটেলে গোমাংস পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে সেই ইংরাজ জগন্নাথ প্রসাদ আসিলে, ছোট ছোট ছেলেরা

একটু আধটু প্রসাদ পাইত। কিরণের পিতামহী সেই সময় মহা বিপদে পড়িতেন। বলিলে কেহ কথা শোনে না, সকলেই সেই ছাই ভস্ম গুলা খাইবে। ঠাকুরমা, এক মুখ থুথু লইয়া, অন্দরের দরজাগোড়ায়, দুই হাতে কাপড় গুটাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিছুক্ষণ পরেই নবীন, শ্যাম, গোপাল, অক্ষয় সকলে ছুটাছুটি করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিত। হয় ত, গোপাল ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিল। ঠাকুরমা চেঁচাইতেন, "ওরে দাঁড়া, দাড়া, ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে, সরে যা! ওরে, ওদিকে যাস্‌নে। আগে ভাল জল দিয়ে মুখহাত ধো, কাপড় ছাড়্, গঙ্গাজল স্পর্শ কর, তার পর ঘরে দোরে যাস্।" এই বলিয়া তিনি গঙ্গাজল আনিতে গেলেন। কে বা তাঁর কথা শোনে? যে যে দিকে পাইল, ছুট মারিয়া বিছানায় শয়ন করিল। ঠাকুরমা পঞ্চপাত্র, কি একটি চুমকি ঘটী করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া, পৌত্র, দৌহিত্রদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কেবল বকিতেন, "রাম বল, রাম বল। পৃথিবীতে এত খাবার সামগ্রী রয়েচে, তা খেয়ে কি তোদের মন ওঠে না? ওই অমৃত কি না খেলেই নয়? ধর্ম্ম কর্ম্ম, বাচ বিচার সব গেল। যেন মোছোনমানের ঘর করে তুল্লে গা! ইচ্ছা করে এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। বলি আমি আর ক'দিনই বা আছি, তার পর তোদের যা ইচ্ছা হয় করিস্। মোছনমানের ছোঁয়া খাস্, বউ নিয়ে চেরেটে করে হাওয়া খেতে যাস্, বিবি বিয়ে করিস্, যা ইচ্ছা

তাই করিস্। সে কটা দিনও কারুর দেরি সয় না।" যখন দেখিলেন, কেহ তাঁহার কথা শোনে না, তখন তিনি আর সব ছাড়িয়া দিয়া আপনি সাবধান হইলেন। তাঁহার ঘরে কোন ছেলে গঙ্গাজল না স্পর্শ করিয়া, প্রবেশ করিতে পায় না। তাঁহার পাকের সামগ্রীতে কোনও ছেলে হাত দিলে, সে দিন আর তাঁহার খাওয়া হয় না। এক দিন রাত্রে, কিরণের একটি পিস্‌তুত ভাই, বাহির বাড়ীতে কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া ভিতরে আসিয়া, কিরণের পিতামহীকে ছুঁইয়া ফেলিল। কিরণের পিসির নাম বিন্দুবাসিনী। পিতামহী ডাকিলেন, "বিন্দু"!

"কে, মা ডাক্‌চ?" একটু চড়া স্বরে এই উত্তর হইল।

মা বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ তোর ছেলের আক্কেল! আমার মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে।"

বিন্দুবাসিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের বাহিরে আসিয়া, কিছু রুক্ষ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিনোদ কি করেছে?"

মা। "কর্‌বে আবার কি? আমার মাথা খেয়েচে। এই শীতের রাত্রে আবার নেয়ে মরি।"

কন্যা। "কি হয়েছে তাই বল না।"

মা। "হবে আবার কি? আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে। বিনোদ আমায় ছুঁয়ে ফেলেচে।"

কন্যা। "ড্যাক্‌রা গেল কোথায়? তাকে আমি দাদার সঙ্গে খেতে বারণ কোরে দিয়েচি না?"

মা। "তোমার ছেলেরা কথা শোন্‌বার ছেলে সব কি না। যেটি বারণ কর, সেইটি আগে করবে।"

কন্যা রাগে ফুলিতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বিনোদ, গেলি কোথায়? ড্যাক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, এক বার এদিকে আয় তুই।"

মা তখন নরম হইয়া বলিলেন, "তাই বলে গালাগালি দিলে কি হবে? ছেলেমানুষ ছুঁয়ে ফেলেচে তার এখন কি হবে? ওর কি এখনও জ্ঞান হয়েচে?"

বিনোদ সব কথাটা জানে না, বাহিরে গুম্ফ-শ্মশ্রুধারী পাচক-মহাশয়ের সহিত আলাপপরিচয়ে ব্যস্ত ছিল। মার কাছে আসিয়া কহিল, "কি মা?

বিন্দুবাসিনী দৃঢ়মুষ্টিতে বিনোদের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আজ তোমাকে আস্ত রাখব না। তোকে দাদার সঙ্গে খেতে মানা করেচি, তবু তুমি নোলার জ্বালায় কুকুরের মত পাত চাট্‌তে গিয়েচ। তোর নোলায় ছিঁচ্‌কে পুড়িয়ে দেব, জান না?"

বিনোদবিহারী, সেখ হুসেন আলির দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল, আর সেই শুভ্রপ্লেটস্থিত অপূর্ব্ব সামগ্রীর সৌরভ ও আস্বাদ স্মরণ করিতেছিলেন। মাতার কঠোর কথায় সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পৃষ্ঠের সঙ্গে মাতার কোমল হস্তের মধ্যে মধ্যে বড় কঠিন আলাপ হয়, এজন্য তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিলেন, "মামা আমায় ডাক্‌লেন, তাই গিয়েছিলাম।"

"আর আমি যা বল্লুম, তা মনে ছিল না? দিদিমাকে ছুঁয়েচিস্ কেন, পোড়াকপালে?" এই বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

মাতা আসিয়া বিন্দুবাসিনীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, "বিন্দু, মার উপর রাগ কোরে কি ছেলে ঠেঙ্গাতে আছে? ছেড়ে দাও, লক্ষ্মী মা আমার।"

কন্যা মাকে এক ঠেলা দিয়া কহিলেন, "ছেড়ে দাও বল্‌চি, নইলে ভাল হবে না। আমার ছেলেকে আমি মার্‌ব, আর কারুর তাতে কি?"

এই বলিয়া চড় ছাড়িয়া, ছেলের পিঠে দুম দুম্ করিয়া কিল মারিতে আরম্ভ করিলেন।

বুড়ী ঠেলা খাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিল।

ঘরের ভিতর কিরণ লীলাকে বলিতেছিল, "ভাদ্র মাসের তাল কার ঘাড়ে পড়্‌চে? সেজপিসীর গলা শুনেচ ত? বাবা, এমন মেয়ের পায়ে গড় করি।"

এদিকে ঠাকুরমা স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "ও মারা ত বিনোদকে হল না, ও আমাকেই মারা হল।"

বিন্দুবাসিনী ছেলেকে মনের সাধ মিটাইয়া ঠেঙ্গাইলে পর, পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

কিরণের মা আর লীলা, দুই জনকে কত বুঝাইলেন, তাঁহারা কোন মতেই জলস্পর্শ করিতে সম্মত হন না। কিরণের পিতা-

মহী যা ফলমূল খান, কিছুই খাইতে চান না। তাঁহারা না খাইলে আর কেহ খায় না দেখিয়া, রাত্রি দুপুরের পর আহার করিলেন।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর গরিবের ঘরে বিবাহ হইয়াছে। এজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে থাকেন। তাঁহার তিন চারিটি সন্তান। বাপের বাড়ী আসিলে বাড়ী শুদ্ধ লোক তাঁহার ভয়ে তটস্থ থাকিত।

আবার যখন ঠাকুরমা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, নবান্ন মাখিতে বসিতেন, হরির লুট দিতেন, সে সময় ছেলেরা হাত পাতিয়া তীর্থের কাকের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সে বৎসর যখন তাঁহার অনন্তব্রত সারা হয়, তখন ভারি ঘটা হইয়া ছিল। সাত দিন আগে হইতে ব্রতের সামগ্রী সাজান আরম্ভ হইল। ছেলেরা দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত। ঠাকুরমা সুবিধা বুঝিয়া নাতিদের বলিলেন, "আমার কাছে ত মোছনমানের ভাত নেই, আমার কাছে তোরা এসেছিস কেন?

জন দুই নাকি সুরে ধরিল, "না ঠাকুরমা, আর আমরা সে সব খাব না।"

ঠাকুরমা তখন চাপিয়া ধরিলেন, "আর কখন মোছনমানের এঁটো খাবিনে বল।"

"না ঠাকুরমা, আমরা আর কখন খাব না।" "না দিদিমা, তিন সত্য করছি।"

"খাবিনে।"

"না, খাবনা।"

"খাবিনে।"

"না, গো, খাবনা, খাবনা। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ঐ সন্দেশটা দাও না ঠাকুরমা।"

এই বলিয়া তাহারা ঠাকুরমার কাছে উত্তম আহার করিল। রাত্রিকালে আবার যে কে সেই। আবার সেই যবনান্ন পাইবার আশায় ছুটিত। ঠাকুরমা মনে মনে সঙ্কল্প করিতেন, তিনি ছোঁড়াদের আর একটা কথাও বিশ্বাস করিবেন না। আবার সে সঙ্কল্প ছোঁড়াগুলার কাকুতি মিনতিতে ভাঙ্গিয়া যাইত।

ঠাকুরমার আর একটি অভ্যাস ছিল। তিনি একজনের কাছে তাহার মনরাখা কথা বলিতেন, আবার তাহার পশ্চাতে ঠিক বিপরীত কথা বলিতেন। কিরণের মার কাছে এক রকম কথা বলিলেন, কিরণের পিসীর সাক্ষাতে আর এক রকম বলিলেন। বাড়ীতে একটি নূতন ব্রাহ্মণের মেয়ে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ঠাকুরমা মনে মনে সন্দেহ করেন, বামনঠাকুরুণের একটু আধটু হাতটান আছে, অথচ সে কথা মুখে ফুটিয়াও বলা যায় না। ব্রাহ্মণী ছাড়িয়া গেলে আর একটি সহজে মেলে না। এক দিন বামনঠাকুরুণ আসিয়া বলিল, "মা, এক পলা তেল দাও ত গা।"

ঠাকুরমা কিছু সন্দিগ্ধান্তঃকরণে কহিলেন, "কেন বাছা, রোজ

যেমন একবাটি তেল দি, আজও ত তেমনি দিয়েছি। আবার তেল কেন ?"

ব্রাহ্মণী। "আজকে মাছ ভাজ্‌তে একটু বেশি তেল লেগেছে, আর আলু পটল ভাজ্‌তেও তেল বড় কম লাগে না। তা না দাও ত আমি পুড়িয়ে রাখিগে। আমার তাতে কি ? আমার ভাতার পুতে ত আর খাবে না, তোমারই নাতিপুতি খাবে।"

ঠাকুরমা অন্যকথা না কহিয়া এক পলা তেল বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণীর মধ্যমা কন্যা তখন বাপের বাড়ী। সেই দিন ঠাকুর মা কন্যার সাক্ষাতে গল্প করিলেন, "বামনঠাক্‌রণের উপর আমার বড় সন্দ হয়। আজ্‌কেই সে তেল চুরী করেচে।"

শৈলবালা কিরণের মাকে ইঙ্গিত করিলেন, "বউ একবার শুনে যাও।" এই বলিয়া একটি নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিরণের মা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে ঠাকুরঝি ?"

ঠাকুরঝি কহিলেন, "তুমি ভাঁড়ার ভাল করে দেখো শুনো। বামনঠাক্‌রুণটি লোক ভাল নয়।"

"কেন, সে কি করেচে ?"

"তুমি বুঝি তা জান না ? মা বলেচেন যে, সে আজ তেল চুরী করেচে।"

"তা নিলেই বা ভাই ? আমাদের একটু তেল চুরী কর্‌লে ত আর আমরা গরিব হ'ব না। তুমি ভাই ঠাকুরুণকে বুঝিয়ে ব'ল, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের যে কষ্ট।"

"প্রকাশ হ'বে কেন ? কিন্তু তুমি একটু সাবধান থেক।"

কিরণের মা কহিলেন, 'তোমরা যেন ঢাক বাজিও না ভাই। কতই বা চুরী কর্‌বে ? ভাঁড়ার ত আর তার হাতে নয়।"

"তোমার যদি এত বড়মানুষী হয়ে থাকে ত তোমার ধন যাকে ইচ্ছা তুমি বিলিয়ে দাও না কেন ? সত্যিই ত আমি কোথাকার কে যে, তুমি আমার কথা শুন্‌বে ? আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌তে এসেছিলাম।" এই বলিয়া শৈলবালা সুন্দরী ফর্‌কিয়া বাহির হইয়া গেলেন!

পর দিবস ঠাকুরমা স্নান করিয়া পূজা আহ্নিকে বসিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, মা, তুমি নাকি বলেচ যে, আমি রান্নার তেল বোতলে করে বিক্রী করি ? তা, এমন কলঙ্ক কি না দিলেই নয় ? লোকের নামে মিছে কো'রে এমন কথা বলতে নাই। বলেচ, বেশ করেছ বাছা, আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, আমি এই বেলা মানে মানে বিদায় হই।"

ঠাকুরমা বাম হস্তের উল্টাপিঠ মাথার উপর রাখিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশের কথা! তুমি হ'লে ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার নামে আমি এমন কখন ব'ল্লাম! কে তোমায় এমন কথা বলেচে, আমায় বল ত ?"

ব্রাহ্মণী হাঁড়ির কালিকলঙ্কিত হস্ত দোলাইয়া কহিলেন, "কেন, আমায় আজ কালো-ঝি বল্লে।"

অমনি কালো-ঝির ডাক পড়িল। ঠাকুর মা কহিলেন, "হ্যাঁলা ময়না, আমি কখন তোমার গলা ধরে তোমার কানে কানে বল্‌তে গিয়াছিলাম যে, বামণঠাক্‌রুণ তেল চুরী করে, তাই তুমি ঠগ্‌ লাগাতে গিয়েচ?"

ঝি বলিল, "আমার কি অপরাধ বাছা? আমায় হরি বল্লে, তাই শুনেছি।"

আবার হরির উপর আক্রমণ হইল। সব শেষ ঠাকুরমা সূর্য্যের দিকে দুই হাত তুলিয়া কহিলেন, "হে দিননাথ! আমি যদি এমন কথা বলে থাকি ত যেন আমার দুটি চক্ষু অন্ধ হয়।"

বামনঠাক্‌রুণ ত কোনমতে থাকিবে না। কিরণের মা কত করিয়া তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়া সান্ত্বনা করেন। তারপর শাশুড়ীকে থামাইতে একবেলা লাগিল।

অনেকেই বলিত, কিরণের ঠাকুরমা দোঠকা, এক মুখে দুই কথা বলেন। তুমিও হয় ত তাই বলিতেছ। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিতেছি, তাঁহার বেশি কিছু দোষ নাই। বিবেচনা কর, স্ত্রীলোকে চিরকালই পরাধীন। ছেলেবেলা বাপের, বয়সকালে স্বামীর, বুড়া বয়সে ছেলে কি মেয়ের বশে থাকিতে হয়। সকলেরই মন রাখিতে হয়। আগে বাপ মার, তারপর শ্বশুর শাশুড়ীর, তারপর পুত্র কন্যার মন রাখিয়া চলিতে হয়। যাহাকে অনেকের

মন রাখিতে হয়, সে এক রকম কথা কিরূপে কহিবে। অতএব তোমরা যাহাই বল, কিরণের পিতামহীকে আমার বড় মন্দ লোক বোধ হয় না।

লীলাকে দেখিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। লীলার আচার-ব্যবহারেও বড় আহ্লাদিত হইলেন। লীলা তাঁহার পূজার সময় গঙ্গাজল আনিয়া জল ছড়াইয়া দেয়, আগে যাহা কিরণের মা করিতেন, এখন সব লীলা করে, তাঁহাকে কিছু করিতে দেয় না। লীলার পবিত্র স্বভাব দেখিয়া তিনি বলিতেন, লীলার হাতের রান্না খেতে আমার রুচি হয়। লীলার এমন বয়সে বৈধব্যদশা হইল, এই বলিয়া কতবার কাঁদিতেন। স্ত্রীলোকে পরের জন্য নিজের চক্ষে এত জলও রাখিতে পারে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ।

বিবাহের পর কিরণকে একবার শ্বশুরবাড়ী লইয়া গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তার পর আর কিরণকে পাঠান হয় নাই। কিরণের মা ভাবিতেন, জামাই মানুষ হইলে আপনার বাড়ীতে লইয়া যাইবে, সে কয় দিন মেয়ে ঘরেই থাক্। হরগৌরী বাবু আপন গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তাও কি হয়! সুরেশের এই বাড়ী। বউমাকে আর অধিক দিন বাপের বাড়ী রাখা হবে না।"

বাড়ীর সকলে জানে, সুরেশচন্দ্র কিছু দিনে নিজে উপার্জ্জন করিতে শিখিবেন, এজন্য পৃথক না হইয়াও সকলে সুখে থাকিবে, সুরেশচন্দ্রকে আর স্বতন্ত্র সংসারের ভার বহন করিতে হইবে না। বিশেষ, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সংসারের খরচপত্রের কোন ধার ধারে না। পুরুষেরা টাকা আনিবে, সংসার চালাইবে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিবে, সন্তান পালন করিবে, বিবাহের সময় সকলে একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে। বড় জোর বাজার খরচের পয়সা হাতে রাখিবে। ঘরে আর একটি বউ আসিলে, মেয়েছেলেরা তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, এই কথা মনে করিয়া, সকলেই চারিদিকে বউ কবে আসিবে বলিয়া কর্ত্রী গিন্নীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। মেয়েরা সব সুরেশচন্দ্রের শয়নগৃহ কোন্‌টা হইবে, তাহাই স্থির করিতে বসিয়া গেল। অন্দরমহলে উপরের ঘর খালি নাই, সকল ঘরেই কেহ না কেহ শয়ন করে। একথা যাই উঠিল, তৎক্ষণাৎ হরগৌরী বাবুর দুই কন্যা ও এক পুত্র পিসিমাকে কহিল, "পিসিমা, আমরা তোমার ঘরে শোব। দাদা আমাদের ঘরে শোবে।" বউ আসিলে কে তাহাকে অধিক যত্ন করিবে, কে তাহাকে আপনার কাছে লইয়া ভাল খেলিবে, কে তাহার সহিত ভাব করিবে, সদা সর্ব্বদা এই কথার আন্দোলন চলে, এমন কি এক একবার ঝগড়া হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। সুরেশচন্দ্র খুড়ীমাকে বলিতেন, "খুড়ীমা, আর কিছু দিন যাক্ না, তারপর না হয় নিয়ে এস। এত তাড়াতাড়ি কেন? সত্যি ত আর জলে

পড়ে নেই।" এই রকম আজ নয় কাল, এ মাস নয় ও মাস, আর কিরণের মাতার অনুরোধে, এ পর্য্যন্ত কিরণের শ্বশুরবাড়ী আসা হয় নাই। কিন্তু আর বড় বেশী দিন নয়। দু'মাস ছ'মাসের মধ্যে কিরণ আপনার ঘর চিনিতে আসিবে।

যখন সুরেশচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে দুই চার কথা উঠিল। সকলে যদি শুনিল, ত কিরণই বা না শুনিবে কেন? কিরণের মা একটু দুঃখ করিলেন, তাহাতে কিরণ মনে মনে স্বামীর উপর রাগিল, ভাবিল,—তাহার স্বামী বড় মূর্খ। আবার যখন কিরণের মা কহিলেন, "তা, সকলেই কি আর একবারে পাস দিতে পারে? জামাই বাবু আর এক বছর পড়্লেই পাস হবেন," তখন কিরণের দুঃখ হইল, ভাবিল, সকলেই ত আর সমান হয় না, তা নয় আবার পড়্বেন। কিরণের সে দুঃখ কমিল না। সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বে যেমন মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এখন আর তেমন আসেন না। নিমন্ত্রণ করিলে আসেন না, লোক আনিতে গেলেও আসেন না। আচ্ছা, কিরণের কাছে আসিতে লজ্জা কি? পাস করিলেও যেমন কিরণের স্বামী, না করিলেও তেমনি স্বামী। স্ত্রীর কাছে আসিতে স্বামীর আবার লজ্জা কি? তবে বুঝি শ্বশুরবাড়ী আসিতে লজ্জা করে? হবে! কিরণ এত শত বুঝিতে পারিল না। সে রোজ রোজ সন্ধ্যাবেলা সুরেশের আশায় বসিয়া থাকে। কখন কে আসিয়া সংবাদ দিবে—জামাই বাবু

এয়েছে, অমনি কিরণের বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিবে। একবার ভাবিয়াছিল, দেখা হইলে সুরেশকে খুব বকিবে, কিন্তু সে পণ ভাঙ্গিয়া গেল। তার পর ঠিক করিয়াছিল, দেখা হইলে কেবল ভালবাসার কথা বলিবে, রাগ দুঃখের কথা মুখে আনিবে না। দিন কতক পরে দিব্য করিল, অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিবে, একটি কথাও কহিবে না। কৈ, সে সব যে কিছুই হইল না। নিত্য সন্ধ্যাবেলা সে ছাদে বসিয়া থাকে, কিন্তু কেহ কোন দিন বলে না, কিরণের বর এয়েছে। তুমি দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না যে, কিরণের মনে উদ্বেগ আছে। বৈকালে সে ছাদে বসিয়া থাকে, বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, যেন কোন ভাবনাই নাই, যেন সে স্বামীর কোন ভাবনা ভাবে না। যদি কেহ স্বামীর নাম করে ত হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরে, নহিলে সেখান হইতে পলাইয়া যায়। কিরণের মনের কথা কে জানে? একবার যখন সন্ধ্যার সময় পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার মনে কি ছিল, কে জানে? কেহ কোন কথা জোরে বলিলে সে কান পাতিয়া শুনিত, সন্ধ্যার সময় বসিয়া এক একবার যে ঈষৎ কটাক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিত, তাহা কেহ দেখিত না, প্রতিদিন তাহার কতখানি আশা ঘুচিয়া যাইত, তাহা কেহ জানিত না।

এক জন কেবল জানিত। তাহার কাছে কিরণ কিছু লুকাইত না, কিছু লুকাইতে পারিত না। এক মাস, দু'মাস, তিন

মাস গেল, তবু সুরেশচন্দ্রের দেখা নাই কিরণ একদিন লীলাকে বলিল, "আচ্ছা ভাই! এতদিন গেল, তাঁর কি একবারও আমায় মনে পড়ে না?"

লীলা। "মনে পড়্‌বে না কেন? এখানে আস্‌তে বুঝি তাঁর লজ্জা করে।"

কিরণ। "এ পোড়া লজ্জা কি এত দিনে যায় না? মানুষের কি লজ্জা চিরকালই থাকে না কি? আর কি এমন লজ্জার কথা হয়েছে যে, তিনি আমায় একেবারে ভুলে গেছেন?"

আশা ভরসা সব ঘুচিয়া গেলে, জন্মের মত সব সুখ বিসর্জ্জিত হইলে, যদি কেহ জগতের উপর বিষদৃষ্টি না করে, আপনার দুঃখের জন্য যে অপরকে দোষ দেয় না, তাহার মুখে কি একরকম হাসি লাগিয়া থাকে। লীলা যখন তখন সেই হাসি হাসিত। কিরণের কথায় সেই হাসি হাসিয়া উত্তর করিল।

"তা কি জানি ভাই, তোমার বরের যে কিসের এত লজ্জা, তা আমি কি কোরে জান্‌ব বল?"

তখন কিরণ চুপ করিয়া লীলার একটি চম্পক অঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

লীলার নিজের জন্য কিছু ভাবিবার নাই, এইজন্য সে পরের জন্য বেশী ভাবিতে পারে। যাহাকে আত্মসুখের ভাবনা ভাবিতে হয় না, সে পরের দুঃখে সমধিক দুঃখী হইতে পারে। কিরণকে নীরব দেখিয়া লীলা কহিল, "ছি! তুমি এত ভাব কেন ভাই?

আজ না হয় কাল তিনি আস্‌বেন; আর দু’দিন পরে তোমায় শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে, তখন ত দেখা হবেই।”

কিরণ লীলার আঙ্গুল ছাড়িয়া দিয়া মাথা তুলিয়া কহিল, “আমার ত তেমন কিছু দুঃখ হয় নি।”

লীলা। “আমার কাছে মিছে কথা, ছি! মানুষের ত কত দুঃখ আছে, তোমার কোন দুঃখ হয় নি, তবু তুমি আগে হতে ভাব্‌তে বস্‌লে। কত লোকের স্বামী বিদেশে যায়, কত কাল দেখা হয় না। আবার কারুর কারুর একেবারেই—”

লীলা আর কিছু বলিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

কিরণ বুঝিতে পারিয়া অন্য কথা পাড়িল।

এদিকে লোকে বলে যে, সুরেশচন্দ্র বিবাহ করিয়া উচ্ছন্ন গেল! পাঠাবস্থায় যে বিবাহ করে, তার বড় একটা কিছু হয় না। লোকে যা বলে, তা নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে। হয় ত সুরেশচন্দ্র দিবানিশি কিরণের কথা মনে করিতেন, কবে সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই ভাবিতেন ইহাতে পাঠাভ্যাসের ক্ষতি হইত। হয় ত কিরণের সেই ছোট মুখখানি তাহার বুকের ভিতর হইতে উঁকি মারিত, তাহাতে পড়াশুনা সব ঘুরিয়া যাইত। হয় ত সে মুখের হাসিটুকু তাঁহার চোকের কাছে ভাসিয়া বেড়াইত, তিনি আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। যাই হউক, এ বিষয়ে আমি কোন কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গণেশচন্দ্র দত্ত।

গণেশচন্দ্র দত্ত গরীবের সন্তান। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ঘরে তাঁহার মাতা ও বৃদ্ধা মাতামহী ছিলেন। মাতুলের যত্নে ও ব্যয়ে, বাল্যকালে গণেশচন্দ্র লেখাপড়া অভ্যাস করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া পাঠের ব্যয় নিজেই করিতেন, মাতুলের আর সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। গণেশচন্দ্র মাতুলের নিতান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই বলিতেন যে, মাতুল তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার শতাংশের এক অংশও কখন শুধিতে পারিবেন না। মাতুল ধনী ছিলেন না, তাঁহার মনে আশা ছিল, গণেশচন্দ্র মানুষ হইয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন।

মানুষ পরিবর্ত্তনশীল। গণেশচন্দ্র যেমন যেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি তাঁহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। অবশেষে যখন এম্‌-এ পাস করিলেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি একেবারে ফিরিল। কালেজ ছাড়িয়া মুরুব্বির জোরে, অথবা বিদ্যার জোরে, তাঁহার এক শত টাকা বেতনের কর্ম্ম হইল। তাঁহার মাতুল আশি টাকার কর্ম্ম করিতেন.
নের পর চল্লিশ টাকা বই আর পাইতেন না।
মাতুল ভাগিনার বিবাহ দিয়াছিলেন। গণেশ

কিছুদিন পরে তাহার মাতামহীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মাতুল পিণ্ডদানের, শ্রাদ্ধের অধিকারী। তিনি গণেশচন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, মার ক্রিয়ায় কিছু সাহায্য কর।"

গণেশচন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া অনেক ক্ষণ পরে দশ টাকার তিনখানি নোট হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই তিন খানি নোট মাতুলের হাতে দিলেন। মাতুল কিছু বিস্মিত, কিছু বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন,

"গণেশ, তুমি এক শ' টাকার চাকুরী করিতেছ। পরিবারও বড় নয়। দিদিমার শ্রাদ্ধে ত্রিশটি টাকা দেওয়া কি তোমার ভাল দেখায়?"

গণেশচন্দ্রের ক্ষুদ্র চক্ষু ঈষৎ জ্বলিল। তিনি মাতুলের দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আমি সাধ্যমত দিয়াছি। শ্রাদ্ধে ঘটা করিবার কোন আবশ্যক নাই। আর আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাই মনে করিয়া যে এখনও আমার শিক্ষা দেন, ইহা ভাল নয়। আমার জন্য আপনার কত ব্যয় হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব করিবেন, আমি মাসে মাসে শোধ দিব।"

মাতুল কোন কথা না কহিয়া, নোটগুলি টেবিলের উপর নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

আপিসের বড় সাহেব গণেশচন্দ্রের তোষামোদে বেতন বৃদ্ধির জন্য লিখিয়াছিলেন।

সেই দিন রাত্রে এক সভায় গণেশচন্দ্র স্বদেশানুরাগের জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

গণেশচন্দ্র বিদ্যার গৌরব করিতেন। ইহাতে দোষের কোন কথা নাই। যে এম্-এ পাস করিয়াছে, সে যদি বিদ্যার গৌরব না করিবে, ত আর কাহার সে গৌরব করিবার অধিকার আছে? একদা কোন কথার সহজ মীমাংসা অথবা সহজ অর্থ করিতে হইলে তিনি বলিতেন, যে এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছে, সেও বলিতে পারে। একদিন তিনি একটা বাঙ্গালা শব্দের অর্থ করিতে পারেন নাই, একজন এণ্ট্রান্স পাস করা ব্যক্তি সে শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছিল। গণেশচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, ইংরাজি ত নয়। ইংরাজি শব্দের অর্থ করিতে না পারিলে লজ্জার কথা বটে। কে অত খোঁজ রাখে, কেই বা বাঙ্গালা পড়ে?

একবার তিনি একখান ইংরাজি সংবাদপত্রে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক সে পত্র প্রকাশিত করেন নাই, পত্রপ্রেরককে এইটুকু বলিয়াছিলেন;—"এই পত্রের লেখক একজন এম্-এ। পরীক্ষকেরা রচনা প্রাপ্ত হইলে লেখককে অনেক নম্বর দিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা তাঁহার পত্র মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। তাঁহার ডিগ্রীকে আমরা অবজ্ঞা করি না। তবে যাহা বিদ্যালয়ের উপযোগী, তাহা সংবাদপত্রের উপযুক্ত নহে।"

গণেশচন্দ্র কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের বিদ্যা বা রচনার প্রতি এক মুহূর্ত্তের তরেও কোন সন্দেহ হইল না। তিনি স্থির করিলেন, সম্পাদকটা মূর্খ।

তাঁহার স্ত্রী মনোমোহিনী বড় ঘরের মেয়ে। পাস করা ছেলের দর বরাবর বেশী, তাহাতে গণেশচন্দ্র খুব ভাল পাশ করিয়াছিলেন। অনেক ধনীর বাড়ী হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছিল। গণেশচন্দ্রের মাতুল, দেখিয়া বড় মানুষের ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর এ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ী হইতে গণেশচন্দ্র বিশেষ কিছু আদায় করিতে পারেন নাই।

বড় মানুষের মেয়ে গরীবের ঘরে আনা সোজা কথা নয়। মনোমোহিনী বাপের বাড়ী হইতে এক বাক্স গহনা, এক সিন্ধুক কাপড়, বাসন, ঝি, আর খুব বড় নজর লইয়া আসিলেন, কিন্তু বাপের বাড়ীটি ত আর সঙ্গে করিয়া আনিতে পারেন না। কাজেই তাঁহার বড় কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। ভাল, তুমি বল দেখি, যার বড় বড় দোতলা ঘরে থাকা অভ্যাস, বেশ ফাঁকা বারান্দায় বেড়ান অভ্যাস, ছোট একটি একতালা ঘরে থাকিতে হইলে, বেড়াবার জায়গা দুই হাত রোয়াক না হইলে, তার কত কষ্ট হয়? ভাল বাড়ীতে যাঁহারা থাকে, তাহারা একটা মন্দ বাড়ীতে গিয়া পা ফেলিতেই ভয়ে সারা হয়। এখানটা শ্যাওলা, ওখানটা জল, আর এক দিকে অন্ধকার, বোধ হয় যেন পদে পদে একটা করিয়া গর্ত্ত

রহিয়াছে। ছোট ঘরে ঢুকিলে হাঁপ লাগে। একজন দীর্ঘকায় মানুষ বড় বড় জানালা দরজাওয়ালা বাড়ীতে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকে, কোন ঘরে প্রবেশ করিতে কখন তাহাকে হেঁট হইতে হয় না। হঠাৎ তাহাকে সে বাড়ী ছাড়িয়া যদি একটি ছোট বাড়ীতে থাকিতে হয় তবে তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। নীচু দরজায় হেঁট হইয়া ঢুকিতে হয়, এটুকু শিখিতে শিখিতে তাহার মাথা দশ বিশ বার ফুলিয়া ঢিবি হয়। মনোমোহিনীরও অনেকবার সেইরূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী যেমন করিয়া হউক থাকিতে হইবে, দুঃখ কষ্ট সব অল্পে অল্পে সহিয়া যায়। তাঁহারও কষ্ট সেইরূপ সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব আসিলে, দুঃখের নিভন্ত আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিত। বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্য, বাপের বাড়ীর সুখ, আবার মনে পড়িত, গণেশচন্দ্রের কর্ম্ম হইলে ও মাতুলের সহিত মনান্তর হইলে, স্বতন্ত্র হইয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিলেন। বাড়ীটি ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। মনোমোহিনীর দুঃখ কতক নিবারণ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরবাড়ী।

কিরণ শ্বশুববাড়ী আসিল। শ্বশুরবাড়ী দিনকতক খুব আদর, ননদেরা একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কত রকম ঠাট্টা তামাসা করে, কত যত্ন করে। এই সময় আমার কর্ত্তব্য যে, ননদদিগের বউয়ের সঙ্গে কথোপকথনের একটা নমুনা দিই। বেশ গোচাল গোচাল ধারাল ধারাল কথা হবে, কথার বাঁধুনি, সাজানো পরিষ্কার হবে, আর কথাগুলি রসে ভরা হওয়া চাই। তা যদি না পারি ত এ পরিচ্ছেদ এই মাটী। কিন্তু দুঃখ, আমার সে কাজ নয়। যাহারা বেশ ধারাল কথা কয় না, তাহাদের মুখে আমি চাঁচা ছোলা সাজান গুজান কথা কেমন করিয়া গুঁজিয়া দিই? যাহারা সারাদিনের মধ্যে কদাচ একটা হাসির কথা কয়, তাহাদিগকে আমি মিনিটে মিনিটে হাস্যোদ্দীপক কথা কেমন করিয়া কহিতে বলি?

আর কিরণের হাসি তামাসার কথা তেমন ভালও লাগে না। শ্বশুরবাড়ীতে যে তাহাকে বেশী আদর করে, তাহারই উপর কিরণের সন্দেহ হয়। সে এক রকম স্থির করিয়াছে যে, যে বেশী যত্ন করে, সেই বুঝি অধিক নিন্দাও করে। বাপের বাড়ী ছাড়িয়া আসিলেই একটা দুঃখ হয়, কিরণের সেই দুঃখের উপর আর এক

দুঃখ। লীলাবতীর বিচ্ছেদে তাহার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল। সে লীলাকে পাইয়া অবধি, আর কাহারও কাছে চুল বাঁধিত না, আর কাহারও চুল বাঁধা মনস্থ হয় না। লীলা সিন্দূর পরাইয়া দিলেই বেশ দেখায়, আর কেহ চিরুণীর আগা দিয়া মাথায় সিন্দূর দিয়া দিলে কিরণ মনে করে, সিন্দূর বড় বেশী হইয়াছে, না হয় ত সমান সিঁথের উপর সিন্দূর পড়ে নাই, একটু বাঁকা হইয়াছে, কিম্বা সিন্দূর একটু অধিক উঁচুতে পরান হইয়াছে। লীলা না হইলে আর কাহারও কাছে সব মনের কথা বলা হয় না। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া কত কথা কিরণের মনে উঠিত, কিন্তু বলিবার লোক খুঁজিয়া পায় না। মনের কথার বোঝা দিন দিন ভারি হইতে লাগিল, যাহার কাছে সে বোঝা নামাইলে কিরণের তৃপ্তি হয়, তাহার সহিত শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই।

কোন্ সুখে কিরণ হাসিবে? সুরেশচন্দ্র দ্বিতীয়বারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। যে যেখানে ছিল, তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। বাড়ীর সকলেই বলিল, "সুরেশের কপালে সুখ নাই, নহিলে এত সুবিধা থাকিতেও পাস করিতে পারিল না? হরগৌরীবাবু বড় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার রাগ অধিক দিন রহিল না। কিরণ ভাবিল, যত দোষ সুরেশচন্দ্রের; আমারও তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। কিরণ স্বামীকে রাত্রে একেলা পাইয়া, বিলক্ষণ দু'চার কথা শুনাইয়া দিল। লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া, কিরণের ভারি রাগ হইয়াছিল, কাজেই

সে স্বামীর উপর ঝাল ঝাড়িল। সুরেশচন্দ্র চুপ করিয়া সব শুনিলেন, শেষে যখন কিরণ চাপা গলায় খানিকক্ষণ বকিয়া হাঁপাইয়া পড়িল, তখন সুরেশচন্দ্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি কিরণকে কহিলেন, "বেশ বক্তৃতা হয়েচে! তার পর।"

এই কথায় কিরণ তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিল, রাগের মুখে স্বামীকে নানা কথা বলিল। সুরেশচন্দ্র আবার খানিকক্ষণ পরে কহিলেন, "তুমি যে এরি মধ্যে বেশ ঘুম-পাড়ানি সুর শিখেচ।"

কিরণ রাগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে সময় কাঁদা ভাল দেখায় না বলিয়া, রোদন সামলাইয়া, আবার অনেক কথা বলিল। সুরেশচন্দ্র হা না কিছুই বলেন না দেখিয়া, অবশেষে থামিল। থামিয়া দেখে, সুরেশচন্দ্রের দিব্য তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছে। তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

হরগৌরীবাবু যখন দেখিলেন, সুরেশের আর লেখা পড়া হইবার রকম নয়, তখন চেষ্টাচরিত্র করিয়া, পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে কহিলেন, "সুরেশের বিবাহ হওয়াতেই, তাহার আর কিছু হইল না।"

আমার আশা ছিল, সুরেশচন্দ্র এবং কিরণের বিবাহ বেশ সুখের হইবে। এখন তাহাতে বড় সন্দেহ হয়! এই দেখ, কিরণ

শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই, স্বামীর উপর রাগ করিল। সুরেশচন্দ্রের যখন কর্ম্ম হইল, তখন কিরণ তাঁহাকে পরামর্শ দিল, "ভাল কোরে কাজ কর্ম্ম কর, সাহেবের মন রাখ, তা' হলে মাহিয়ানা বাড়্‌বে।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "কেন? আমি পঞ্চাশ টাকায় বেশ সন্তুষ্ট আছি। আমি আর চাইনে।"

কিরণ ভাবিল, তাহার স্বামী পাগল হইয়াছে। বলিল, "তোমার কি এমন ধন ঐশ্বর্য্য আছে যে, তুমি টাকা চাও না?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "সে জন্য নয়। সকলেই যে টাকা চায়, তা' ত নয়। টাকাই ত কেবল সার নয়।"

এমন নূতনতর কথা কিরণ কখন শুনে নাই। তাহার মনে মনে রাগ হইল। সে স্বামীর উপর কথায় কথায় রাগ করে। বলিল, "টাকা চাই না ত কি চাই?"

সুরেশ। "জ্ঞান চাই, ধর্ম্ম চাই, আরও কত কি চাই। কেবল টাকা টাকা করিয়া বেড়াইলে কি কিছু সুখ আছে? পঞ্চাশ টাকা এমন অল্পই বা কি?"

কিরণ। "কত লোকে পাঁচ শ টাকা, হাজার টাকা রোজগার করে, আর তোমার পঞ্চাশ টাকাই বুঝি ঢের হ'ল?"

সুরেশ। "আবার কত লোকে যে কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকার বেশী পায় না। কত লোকে যে পাঁচ টাকায় মাস চালায়। সকলেই কি পাঁচ শ টাকা আনিতে পারে?"

কিরণ। "এত লোকে আনে, আর তুমিই বা আন্‌তে পার্‌বে

না কেন ? টাকা না হ'লে সুখ নেই, টাকা না হ'লে কেউ জিজ্ঞাসা করে না।"

সুরেশচন্দ্র এক এক সময় বড় অদ্ভুত রকম তর্ক করিতেন। তিনি কিরণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা টাকাই কি সব চেয়ে বড় ?"

কিরণ কহিল, "তা নয় ত কি ?"

সুরেশ। "যার টাকা আছে, সেই তবে খুব বড় ?"

কিরণ। "তাই ত।"

সুরেশ। "বল দেখি, শিব ঠাকুর বড়, না বর্দ্ধমানের রাজা বড় ?"

কিরণ। "দেবতায় আর মানুষে ?"

সুরেশ। "কেন ? ভিখারী দেবতা আর মস্ত বড়মানুষও বুঝি সমান নয় ?"

কিরণ। "তাও কি হয় ?"

সুরেশ। "আচ্ছা, শিব ত যেন দেবতা হ'লেন। সেকালে মুনি ঋষিরা ত আর দেবতা ছিলেন না। তাঁরা বড়, না হরিনারায়ণ দত্ত বড় ?"

কিরণ কিছু মুস্কিলে পড়িল। এমন সব জটিল তর্কের মধ্যে, সে ছেলে মানুষ, প্রবেশ করিতে পারিবে কেন ? কিছু ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একটা উত্তর খুঁজিয়া পাইল। কহিল, "তবে তুমি বুঝি মুনি ঋষি হয়েচ ?"

সুরেশচন্দ্র হাসিলেন, কহিলেন, "আমি কি এমন পুণ্য করিয়াছি যে, মুনি ঋষি হ'ব? আর তোমাকে ছেড়ে মুনি ঋষি হতেও আমার ইচ্ছা হয় না। আমি ত সংসার ছাড়িতে চাইনে। আমি অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে চাই। টাকায় যে সুখ নাই, তাহাও ত চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি ছেলে মানুষ, যা সকলের মুখে শুনেছ, তাই বল্চ। তোমার দোষ কি? এর পর যখন সব কথা খুলে বল্ব, তখন তুমি আমার মতন বুঝ্তে পার্বে।"

ছেলে মানুষ বলিলে কিরণের যেমন রাগ হয়, এমন আর কিছুতে নয়। সে রাগে চুপ করিয়া রহিল। তার সাড়ে তের বছর বয়স, আর তাকে ছেলেমানুষ বলে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

একা! একা!

তুমি, পুরুষ, বিধবার দুঃখ বুঝিতে পারিবে না। পরদুঃখে দুঃখী হওয়া অপেক্ষা আর কিছুই নাই, কিন্তু এই যে হিন্দুবিধবার দুঃখ, ইহা আমরা কোন মতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারি না। যদি পারিতাম ত এ দেশে এমন বিধি শাস্ত্রে স্থান পাইত না। স্বামীর মৃত্যু, চিরজীবনের তরে অনাথিনী হওয়াই যে বিধবার

প্রধান দুঃখ, তা নয়; এই জগৎ সংসারে সে সম্পূর্ণ একাকিনী। এমন দুঃখ আর আছে? একাকিনী অর্থে কেবল সঙ্গীহীন বুঝিও না। একা থাকিতে অনেকে ভাল বাসে, একা থাকিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। যোগীরা ত স্বেচ্ছামতে অরণ্যে বাস করেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, তাঁরা কি একা? তাঁরা কেবল একজন নিত্যসঙ্গীকে লইয়া, পথের পরিচিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করেন বই ত নয়। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কেহ কোথাও একা থাকিবে না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, কেহ একা থাকে না। কোথায় সূর্য্য, আর কোথায় পৃথিবী, অথচ একদিন সূর্য্যকে না দেখিতে পাইলে, পৃথিবী আর বাঁচে না। এ উভয়ে কি কোন সম্বন্ধ নাই? যাহা কিছু আছে, সব অপর কিছুর সঙ্গে বাঁধা। সব পূর্ণ, সব এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সব এক সতীর জীবন্ত দেহ, অবিশ্রাম ঘুরিতেছে, সে দেহ ছিন্ন করে, এমন চক্রের বিশ্বকর্ম্মা এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। সকলে সকলের মুখ চাহিয়া আছে, সকলে সকলকে সাহায্য করিতেছে, ইচ্ছা পূর্ব্বক হউক, অথবা অনিচ্ছা প্রযুক্তই হউক, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে হউক, একে অপরের হাত ধরিতেছে। দেশ, কাল, পাত্র, কোন বিবেচনা নাই, নক্ষত্র হইতে, পৃথিবী হইতে, অন্ধকার হইতে, আলোক হইতে, কেবল হস্ত প্রসারিত হইতেছে, আর নিরন্তর শব্দ হইতেছে, ধর! ধর! হাত ধর।

অভাগিনী বিধবার হয় ত সব আছে, হয় ত তার রূপ আছে, যৌবন আছে, সুখের আশা আছে, অথচ তাহার কিছু নাই, তাহার কেহ নাই, সংসারের, জীবনের কোন বন্ধন নাই। কেবল যে তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করে, এমন নয়, সমুদয় জগৎ, বুঝি স্বর্গের দেবতাও তাহাকে পরিত্যাগ করে। মানুষের মধ্যে থাকে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিশিতে পারে না, কোন হৃদয় তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সে এক অশরীরিণী ছায়ার মত লোকালয়ে বিচরণ করিতে থাকে।

এমন অবস্থায় জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠে। এমন হইলে কোন বিধবা জীবনের ভার বহন করিতে পারিত না। এইজন্য আর একটা কিছু তাহার শূন্য হৃদয়ে প্রবেশ করে। যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের জন্য ভাবে। যখন স্বার্থপরতা একেবারে দূর হইয়া যায়, তখন পরার্থপরতা সহজেই আসে। পরের সুখে সুখ হয়, পরের রোগের সেবা করিলে নিজেকে সুস্থ বোধ হয়, পরে হাসিলে মুখে হাসি আসে।

লীলার তাহাই হইল। বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত লীলার কিছুতেই সুখ ছিল না, এখন সে পরের সুখে সুখী হইতে শিখিল। কিরণ শ্বশুরবাড়ী গেলে পর, দিনকতক লীলার কিছু কষ্ট বোধ হইয়াছিল। ঝিকে দিয়া চিঠি লিখিয়া কিরণের খবর লইত। কিরণ কেমন থাকে, তাহার কোন কষ্ট হয় কি না, শ্বশুরবাড়ী তার মন টেঁকে কি না, লীলার কেবল সেই ভাবনা। কিরণকে কাছে না

পাইয়া, সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদাই যত্ন করে, সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত সর্ব্বদাই পরের উপকারে ব্যস্ত, এক দণ্ড স্থির হইয়া বসিতে চায় না। যেন একটা বিষাদের ছায়া অনবরত তাহার সঙ্গে ফিরিতেছে, যেন সে কেবল লীলার বুকের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতেছে, সেইটাকে দূর রাখিবার জন্য লীলা এ কাজে সে কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

তবু ত ভুলিয়া থাকা যায় না। তবু কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হয়,—একা! একা! রাত্রিকালে গোপাল লীলার বিছানায় শয়ন করে, ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহাকে না দেখিতে পাইলে দিদিমণি বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। লীলা শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে কত বার উঠিয়া বসে। কত রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, কত রাত্রে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চক্ষের জলে বালিশ ভাসিয়া যায়। সকলের সব আছে, লীলার কিছু নাই। লীলা কাহারও সুখ দেখিয়া হিংসা করে না। সে কেবল নিজের অদৃষ্ট ভাবে। সবাই যেমন মানুষ, লীলা ত তেমনি মানুষ, তবে সে মানুষের সকল সুখে বঞ্চিত কেন? তার হৃদয়ের মধ্যে এতখানি ভালবাসা, এত সুখের তৃষ্ণা, এ সব কোথায় রাখিবে? আর কেবল মনে হয়—একা! একা! কেহ তাহার মুখ দেখিয়া হাসে না, কেহ তাহার জন্য দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে না, কেহ ভাবে না—লীলার কি দুঃখ। লীলার গলার আওয়াজের জন্য কেহ কাণ পাতিয়া থাকে না, অসুখ হইলে কেহ তাহাকে

স্নেহস্বরে নাম ধরিয়া ডাকে না। সমস্ত দিনের পর কেহ জিজ্ঞাসা করে না,—লীলা কোথায়? কেহ দেখে না,—তাহার পা দুখানি কেমন সুন্দর, তাহার চক্ষু কত কোমল। নারীজন্ম লইয়া প্রণয় কেমন, তাহা জানিতে পাইল না।

গ্রীষ্মকালে জ্যোৎস্নারাত্রে গোপালচন্দ্রের ঘুমন্ত মুখের উপর মুক্ত জানালা দিয়া জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে। বালকের জ্যোৎস্না-শোভিত নিদ্রিত মুখ দেখিয়া, লীলার চক্ষে জল আসিল। ভাবিল, যদি আমার একটি সন্তান থাকিত, তা' হ'লে তাহার মুখ দেখিয়া সুখে থাকিতাম। লীলার মনে কত সুখের স্বপ্ন, কত কি উঠিতে লাগিল। গৃহপ্রবিষ্ট জ্যোৎস্নায় বসিয়া করতলে মস্তক রাখিয়া সে ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে গোপালচন্দ্র স্বপ্নে ভয় পাইয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। লীলার জাগ্রতস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ঘর ভাঙ্গিল।

সুরেশচন্দ্র যে পঞ্চাশটি টাকা বেতন পাইতেন, সে গুলি পিতৃব্যের হাতে দিতেন। হরগৌরীবাবু সে টাকা গুলি সুরেশচন্দ্রের নামে জমা করিতেন। সংসারের ব্যয় যেমন আগে তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, তেমনি এখনও করেন, সুরেশের টাকা

সুরেশেরই থাকিত। সুরেশের কর্ম্ম হইলে, ছয় মাস পরে হরগৌরী বাবু পেন্সন লইলেন।

লোকে বলে, স্ত্রীলোকেই ঘর ভাঙ্গে, ঘরে ঘরে ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা পুত্রে যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, গৃহের সুন্দরীরাই তাহার কারণ। তাঁহাদের নামে এমনতর অনুযোগ শুনিয়াও যে তাঁহারা কিছু বলেন না, আমি তাহাতে কিছু বিস্মিত হই। এই দেখ, সুরেশচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া পিতৃব্যালয়ে বাস করেন। যা হউক দশ টাকা নিজেও আনিতেছেন। হরগৌরী বাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি পেন্সন লইয়াছেন। এমন অবস্থায়, এই এত বড় সংসারের ভার কি তিনি একেলা বহন করিতে পারেন? মানুষে যদি এই সব কথা একবার বলে, অমনি বাড়ীর বাবুরা বলিয়া বসেন যে, স্ত্রীলোকেরা ঘর ভাঙ্গে।

হরগৌরী বাবুর স্ত্রী যে মানুষ মন্দ, তাঁহার যে মন কুচুটে, এ কথা আমি কখনই বলিতে পারিব না। তবে আমি শুনিয়াছি যে, তাঁর কাণ কিছু পাতলা। তাঁর এক মাসী বাড়ীতে থাকেন, তিনি লোক বড় ভাল নয়। তিনি দিবা রাত্রি গিন্নীর কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কত কি বলেন। সে সব শুনে শুনে কাজেই গিন্নীর মন ভারি হইয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্রের বিবাহের পর হইতেই গিন্নীর মুখ একটু ভার ভার। সুরেশের বিবাহ হইল, আর তাঁর ছেলের বিবাহ হইল না, এই তাঁর দুঃখ। সুরেশচন্দ্রের যখন বিবাহ হয়, তখন হরগৌরী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের

বয়স পনর বৎসর বই নয়। তাহার বিবাহের কথা বলিলে কর্ত্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তার পর, কিরণ যখন ঘরবসতি করিতে আসিল, তখন মাসী গিন্নীকে বলিলেন, "সুরেশের ত কর্ম্ম হয়েছে, ও এখন দুধ জলখাবার নিজে করুক না কেন? কেন গো? ওঁদের কি চিরকাল খরচ যোগাতে হবে না কি? সত্যিই ত তুমি আর তার ধার করে খাওনি!" গৃহিণী ভাবিলেন, "তাও ত বটে, চিরকাল আমি কেন সব খরচ করে মরি? আমারও ত সময় অসময় আছে, ছেলেমেয়ের বিয়েথাওয়া আছে, আমি কত খরচ করিবা উঠিব?" শেষে যখন কর্ত্তা পেন্সন লইলেন, তখন এক প্রলয় কাণ্ড বাধিবার উদ্যোগ হইল। হরগৌরী বাবু পেন্সন লইয়াও সুরেশের টাকা খরচ করিতেন না; ব্যাঙ্কে জমা করিতেন।

এক কথা উঠিলেই দশ কথা ওঠে। সুরেশচন্দ্রকে একদিন গৃহিণী বলিলেন, "বাবা, তুমি মাইনের টাকা ওঁকে না দিয়ে আমায় দেও না কেন?"

সুরেশ উত্তর করিলেন, "বেশ ত, এইমাস থেকে দেব এখন।"

পেটের কথা একবার মুখে আনিলেই সে কথা আর ছাপা থাকে না। হরগৌরীবাবুও এই সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন। পরে যখন সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে জানাইতে আসিলেন যে, এই মাস হইতে বেতনের টাকা খুড়ীমাকে দেওয়া হইবে, তখন কর্ত্তা রাগিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, “খুড়ীমা চাহিয়াছেন।”

কর্ত্তা পূর্ব্বেরমত রাগিয়াই বলিলেন, “যদি তুমি টাকা আনিয়া আগের মত আমায় না দেও, তাহা হইলে আমি মনে করিব যে, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর।”

সুরেশচন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন, আস্তে আস্তে গিয়া বাড়ীর গৃহিণীকে সব বলিলেন। শেষে কহিলেন, “খুড়ীমা, আমি ত কাকার কথা ঠেলতে পারিনে।”

গিন্নী তাঁর মাসীর কাছে গিয়া মনের ঝালটা ঝাড়িলেন, বলিতে লাগিলেন, “উনি সুরেশ আর তার বউকে নিয়ে ঘর করুন, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। আমি বাড়ীতে আছি মাত্র, কোন কথায় একটী কথা কহিবার যো নেই। আমি এমন থাকা থাকতে চাইনে।

তুমি যেন মনে করিও না যে, তিনি যথার্থই বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমাকে যদি সত্য কথা বলিতে হয় ত আমি বলিব যে, গিন্নীর বাপের বাড়ী বড় কেহ ছিল না। কিন্তু স্ত্রীলোকের রাগ হইলেই কেমন বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, অভিমান হইলেই বাপের বাড়ী মনে পড়ে! সেই কারণে, হরগৌরীবাবুর স্ত্রী বুড় বয়সে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলেন।

এই রকম নানা কথার মধ্যে কিরণ বাস করে। সে ত আর কাণে তুলা গুঁজিয়া বেড়ায় না যে, কোন কথা তাহার কাণে উঠিবে না? সে সব কথা শুনিল। গিন্নী ইদানীন্তন

অনেক কথা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেন। শুনিয়া শুনিয়া কিরণ জ্বালাতন হইয়া উঠিল। স্বামীকে সব বলিল, তাহার পর কহিল, "এ বাড়ীতে আর কিছু দিন থাকিলে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন; বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতৃব্যের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল, পিতৃব্যকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে স্মরণ করিয়া, তিনি কাতর হইলেন। কিন্তু না গেলেও নয়; যে বাড়ী আগে তাঁহার পক্ষে অমৃতালয় তুল্য ছিল, সে বাড়ীতে আর তাঁহার থাকা হয় না, আর একটা দাঁড়াইবার জায়গা দেখিতে হইবে।

সুরেশচন্দ্র কত বার আগুপিছু করিলেন, কত বার ইতস্ততঃ করিলেন, মুখে সে পোড়া কথা আর কোন মতেই আসে না। এ দিকে পিতৃব্যগৃহ দিন দিন কণ্টকময় হইয়া উঠিল। অবশেষে সুরেশচন্দ্র পিতৃব্যকে বলিলেন।

হরগৌরী বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া পড়িলেন, তার পর সুরেশের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমার উপর রাগ কর নি ত?"

সুরেশচন্দ্র, সেই চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক পুরুষ, বালকের ন্যায় রোদন করিয়া, পিতৃব্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন, ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি আমার পিতার অধিক করিয়াছেন, আপনি অমন কথা বলিবেন না। আপনি কি সব জানেন না?"

হরগৌরী বাবুর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িল, সে অশ্রুবিন্দু তিনি কোঁচার মুড়ো দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "বাবা, আমি সব জানি। তোমাকে যদি আমি বাড়িতে থাকিতে বলি ত তোমার কষ্ট বাড়িবে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই গৃহ-বিচ্ছেদ দেখিতে হইল। স্ত্রী হইতে এত কষ্ট হইবে কে জানিত?"

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যাক্, ও-কথা থাক্, আপনি ও-সব কিছু মনে করিবেন না। আমাকে পূর্ব্বে যেমনি স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তেমনি দেখিবেন। আমি আপনার সন্তান, আপনাকেই পিতা বলিয়া জানি। চিরকাল আমি আপনাকে সমান ভক্তি করিব।"

কর্ত্তা মহাশয় ঘরের ভিতরে গিয়া বাক্স খুলিয়া, একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। সেখানি সুরেশচন্দ্রের হাতে দিয়া কহিলেন, "তোমার এক বৎসরের বেতন ব্যাঙ্কে জমা আছে। এই খাতা ধর। টাকা তোমার নামেই আছে। দেখ, বাবা, আমার সঙ্গে যেন কখন অসরস না হয়। বুড় খুড়োকে এক একবার দেখিতে আসিও। আর ক'দিনই বা আছি!"

সুরেশচন্দ্র সাশ্রুনয়নে পিতৃব্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বেতন-বৃদ্ধির নিমন্ত্রণ।

আজ রাত্রে বেতন-বৃদ্ধি উপলক্ষে গণেশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বৈঠকখানার ঘর একতালা। সেই ঘরে একখানা তক্তপোষের উপর বিছানা পড়িয়াছে, আশে পাশে খান চার পাঁচ চেয়ারও আছে। ঘরে হুঁকা, গুড়গুড়ি, দুই চলিতেছে। গণেশচন্দ্র পূর্ব্বে তামাকু খাইতেন না, কিন্তু এখন না খাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া, সম্প্রতি তামাকু ধরিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে একটা সটকার নল চাদরের উপর পড়িয়া আছে, গণেশচন্দ্র নিজে ধূমপান করিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুকে মুখনলটি বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহার অধিকাংশ ইংরাজি, আমি তাহার অনুবাদ করিব।

গণেশচন্দ্র ধূমপানান্তর বলিতেছেন, "কলিকাতায় উচ্ছন্ন যাইবার অনেক উপায় আছে। সব প্রথম, ব্রাহ্ম হওয়া, তাহার পর লেক্‌চর দেওয়া, স্পীচ্ ঝাড়া, দেশ উদ্ধার করা, আর খবরের কাগজ লেখা। আর একটা পথ আছে, কিন্তু তাহাতে যত নিজের অপকার হয়, তত আর কাহারও ক্ষতি হয় না।—কি হে! কবিকঙ্কণ যে! এস, এস!"

সুরেশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে, গণেশচন্দ্র সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বলিতেছিলাম, কবি হওয়া আর একটি মন্দ লক্ষণ। বলি, সুরেশ, সরস্বতীর সঙ্গে এখন তোমার বনিবনাও কেমন? আর কত দিন কবি থাকিবে?"

ভোলানাথ মিত্র পাঠাবস্থায় সুরেশের বন্ধু ছিলেন। তিনি এখন দুই শত টাকা বেতনের অধ্যাপনা কর্ম্ম করেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সুরেশ, তুমি কেন একটা মহা কাব্য লেখ না? তুমি বকাসুরবধ মহাকাব্য লেখ।"

সুরেশচন্দ্র ফিরিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি আগে শিশুপালবধের পরিচয় দাও।"

ভোলানাথ হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু হাসিটা চড়্‌কে রকম।

রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় গণেশচন্দ্রের আপিসে কর্ম্ম করেন। তাঁহার সহিত সুরেশচন্দ্রের সামান্য আলাপ ছিল। রামকান্তকে লোকে বড় হিসাবি বলিয়া জানিত। তিনি সুরেশের দিকে মাথা বাড়াইয়া, দক্ষিণ হস্তের উপর চিবুক রক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেশ বাবু, আপনি না কি একখানা বই লিখিয়াছেন?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞা না, আমি কোন বই ছাপাই নাই।"

রামকান্ত বাবু অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সুরেশ বাবু, তোমায় একটা পরামর্শ দি, শুন। তুমি একখানা মানের বই কি আর কোন স্কুল বই লিখিতে পার? দেখ, গঙ্গারাম বাগ্‌চি একখানা মানের কেতাব লিখিয়াছে, সেখানা কটক পর্য্যন্ত বিক্রী হয়। আমি জানি, সেই বই বিক্রী করিয়া সে দুই তিন হাজার টাকা লাভ করিয়াছে।"

সুরেশচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া এ কথায় সায় দিলেন।

ভোলানাথ বাবু কথাটা শেষ করিলেন, "স্কুলের পাঠ্য, কি অর্থের পুস্তক লেখা সকলের সাধ্য নয়। যে সে এ সকল বই লিখিতে পারে না। গঙ্গারাম নিজে কিছুই লেখে না। পরকে দিয়া লিখাইয়া লয়। নাম আর লাভ নিজের। গঙ্গারাম ত গঙ্গারাম।"

তাহার পর সুরেশচন্দ্রকে ছাড়িয়া অন্য কথা উঠিল। গণেশচন্দ্র বিদ্রূপ করিতে খুব দক্ষ। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, যশ, যাহা কিছু আছে, তাঁহার বিদ্রূপের মুখে কিছুই টিঁকিতে পারে না। গণেশচন্দ্র যে স্বয়ং যথার্থ বিদ্বান, ইহাই তাঁহার প্রধান পরিচয়। লোকে যাহাকে বিদ্বান বলিয়া জানে, গণেশচন্দ্র জানেন, সে হস্তীমূর্খ। যাহাকে সকলে ধার্ম্মিক বলিয়া পূজা করে, গণেশচন্দ্র তাহাকে ভণ্ড প্রমাণ করেন; তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমক্ষে কিছুই লুক্কায়িত থাকে না। আর সকলে যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখে, গণেশচন্দ্র তাহাতে কলঙ্ক দেখেন। বিদ্যাশিক্ষার ফলই

এই। সাধারণ লোকে যেমন অন্ধ, উপাধিধারী বিদ্বান আর তেমন থাকে না।

পাঠাবস্থায় গণেশচন্দ্র মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন। এখনও তিনি পানাসক্তির বিরুদ্ধে আবশ্যকমতে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু নেশার ভয়ে সুরা স্পর্শ না করা দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় বিবেচনা করিয়া, কথন কদাচ দু'এক গ্লাস্ পান করিতেন। আজ বন্ধুদিগের অনুরোধে তিনি এক গ্লাস্ পান করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে চক্ষুদ্বয় গোলাপি রংগে রঞ্জিত হইল। গণেশচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে কহিলেন, "সুরেশ! এক গ্লাস্ খাও।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আমি ত খাই না, তুমি জান। আমি আর অধিক বিলম্ব করিব না, বাড়ী যাই।"

গণেশচন্দ্র হাসিলেন, "হা! হা। কেন হে? বাড়ীতে কি বুড় বকিবে না কি?"

সুরেশচন্দ্র কিছু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "না, তা নয়। আমি এখন আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়াছি। বাড়ীতে আর কেহ নাই, তাই আর অধিক রাত করিব না।"

গণেশচন্দ্রের রঞ্জিত চক্ষু বিকশিত হইল। কহিলেন, "বটে? বুড়ার হাত এড়িয়েচ? ভাল মোর ভাই! এস, সেক্হ্যাণ্ড করি। বুড়দের দড়া দড়ী না ছিঁড়িলে কোন সুখ নাই।"

সুরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "দেখ, গণেশ-

চন্দ্র! আমি আমার পিতৃব্যকে পিতার অধিক ভক্তি করি, তাহা তুমি জান। তাঁহার জন্য আমি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করি নাই। দোষ থাকে ত আমার, তাঁর নয়; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আর কখন বিদ্রূপ করিও না।"

এ কথায় গণেশচন্দ্রের চমক হইল। তিনি সুরেশচন্দ্রের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বসাইলেন। কহিলেন, "রাগ করিও না, ভাই? তামাসার মুখে একটা কথা বলিয়াছি, তাহাতে কি আমার উপর রাগ করিতে আছে? আহারের উদ্যোগ হইয়াছে, আহার করিয়া বাড়ী যাও।"

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি আহার করিয়া বাড়ী গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন গৃহিণী!

সুরেশচন্দ্র পৃথক হইয়া একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। সহরের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী ভাল বাড়ীতে কেমন করিয়া থাকিবে? তবু সুরেশচন্দ্র যে বাড়ীখানি ভাড়া করিলেন, সেটি নিতান্ত মন্দ নয়। সংসার নূতন পাতিয়াছেন কি না। সুরেশচন্দ্র তেমন হিসাব করিয়া উঠিতে পারিতেন

না। বাড়ীখানি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে, সেইমত ভাড়া কিছু বেশী হয়; বাড়ীভাড়া মাসিক বারো টাকা পড়িল। আবার একটি ঝি নহিলে খুব গরিব গৃহস্থেরও কোন মতে চলে না, তাহাকে খাওয়া পরা, আর মাসে মাসে দেড় টাকা হিসাবে দিতে হইবে। অনেকে আমার উপর রাগ করিতে পারেন। সামান্ত টাকার জমাখরচের হিসাব দিবার আবশ্তক কি? এরূপ টাকাকড়ির হিসাব দেওয়া কোন ক্রমেই সুরুচিসঙ্গত নয়। আজ কাল কাহাকেও বেতনসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা আর অভদ্রতা নাই। তাহা হইলে সংসারখরচের তালিকা বাহির করা কিসে ভাল হইল? তবে যদি দু' এক লক্ষ টাকার হিসাব হয়, সে কথা আলাদা। যে মাসে বিশ টাকা বেতন পায়, তাহাকে বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আপনাকে অপমানিত মনে করে, কিন্তু যে হাজার টাকার কর্ম্ম করে, সে সেই পরিচয় দিবার জন্ত ব্যাকুল হয়। সেইরূপ দশ বিশ টাকার হিসাব দেওয়া নিঃসন্দেহ কুরুচির পরিচয়, কিন্তু লক্ষ টাকা যেখানে, সেখানে কুরুচি তিষ্ঠিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, যাহাদের কথা বলিতে বসিয়াছি, তাহারা গরিব মানুষ। আর যখন আমি সত্য কথা বলিতে বসিয়াছি, তখন কিছুই গোপন করিতে পারিব না।

কিরণ পৃথক হইবে শুনিয়া, কিরণের মা একজন পাচিকা ব্রাহ্মণী স্থির করিয়া দিলেন, আর কিরণকে বলিয়া পাঠাইলেন,

তুমি টাকার জন্য ভাবিও না। আমি ব্রাহ্মণীর মাহিয়ানা দিব। সুরেশচন্দ্র শাশুড়ীর কাছে সে টাকা লইতে সম্মত হইবেন কেন? এইরূপে খরচের কোন দিকে কিছুই সাশ্রয় হইল না।

যেমন করিয়াই হউক, ঘর ত ভাঙ্গিয়াছে। দোষ কার? কিরণের না বাড়ীর গৃহিণীর? সেটা বিষম সমস্যা। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি মাটীতে আঁচড় দিয়া বলিতে পারি যে, এ বিচার করা আমার কাজ নয়। তোমরা এখন বুঝিয়া দেখ। আমি হয়ত কিরণের দোষ ঢাকিয়া গৃহিণীর নিন্দা করিব। তাহা তোমরা বিশ্বাস করিবে কেন? অনেকের মতে এই যে, এক হাতে তালি পড়ে না, একটা কাঠিতে কিছু বাজে না। অতএব, দোষ কিরণের আর গৃহিণীর, দু'জনেরই। কিন্তু এই কথায় আর এক কথা উঠিতে পারে। দু'টা হাত আর দু'টা কাঠির সঙ্গে, দুই জন মানুষের তুলনা করা ত ভাল নয়। মনে কর, দু'টা কাঠি এক জায়গায় থাকিলেও বাজিতে পারে না, দু'টা হাত একত্রে থাকিলেও তালির শব্দ হয় না। দু'টা লোক এক স্থানে থাকিলে ঝগড়া হয়। যদি মানুষের সঙ্গে আর কাঠির সঙ্গে তুলনাই চলে, তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, যে দু'টা কাঠিতে বাজে, যে দুই জন লোক ঝগড়া করে, তাহাদের কোন দোষ নাই। যে বাজায়, তাহার দোষ। তোমরা যদি এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বিবেচনা কর, তাহা হইলে দোষ, না কিরণের, না গৃহিণীর। দোষ যত সেই লাগানে ভাঙ্গানে মাসী ঠাকুরাণীর।

তা, সে যাই হউক, কিরণ নূতন বাড়ীতে আসিয়া আর আহ্লাদ সামলাইতে পারে না। সে জন্য তোমরা কিরণের উপর রাগ করিও না। কিরণের আনন্দ আর কোন কারণে নয়, তার আনন্দ, সে এখন ঘরের ঘরণী গৃহিণী হইয়াছে বলিয়া। অজাতশ্মশ্রু বালক যেমন মনে করে যে, গুম্ফশ্মশ্রুতে অধিকার হইলেই জগতে আর কিছুই তাহার বাঞ্ছনীয় থাকিবে না, সেইরূপ আমাদের এই ছোট ছোট মেয়েগুলি মনে করে যে, সংসারের গৃহিণী হইতে পারিলেই, ঝিকে বাজারের পয়সা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই, ভাণ্ডার আপনার হাতে হইলেই, নারীজন্মের কোন সুখ বাকী থাকিবে না। কিরণ বরাবর জানিত যে, তাহাকে চিরকাল একটা সংসারের মধ্যে বউয়ের মত থাকিতে হইবে, গৃহিণীপনা শিখিবার কখন কোন সুবিধা হইবে না। এখন দেখ, চৌদ্দ বছর বয়সে সে একেলা আপন সংসারের কর্ত্রী হইল।

কিরণ দেখিল, বাড়ীখানি মন্দ নয়। বাহির বাড়ীতে একখানি একতালা ঘর, ভিতরে দোতালায় দু'টি ঘর, নীচে তিনটি। পাড়াতে তেমন গোলমাল নাই। সে দিকে গাড়ীঘোড়া তত অধিক চলে না, সেই জন্য ঘর ভাড়া কিছু কম। উপরের একটি ঘর শয়নের, আর এক ঘরে সুরেশচন্দ্র লেখা পড়া করেন। ঘরের সুমুখে একটুখানি বারান্দা আছে। ছাদে উঠিবার এক ভাঙ্গা সিঁড়ী, কিন্তু ন্যাড়া ছাদ বলিয়া সিঁড়ির দরজায় কুলুপ দেওয়া

থাকে, কেহ ছাদে উঠিতে পায় না; কেবল গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় কিরণ ছাদে উঠিত। নীচের একটি ঘরে রান্নাবান্না হয়, এক ঘরে ভাঁড়ার, আর একটি ঘর লইয়া ঝি এবং ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী বিবাদ করেন।

ভাঁড়ার বাজার হাতে পাইয়া কিরণ ঠাহরাইল, খরচের খুব ধরা বাঁধা করিবে। লক্ষ্মী স্বয়ং যদি কাহারও বাড়ীর দাসী হন, ত বাজারের পয়সা হইতে তিনি কিছু চুরী না করিয়া থাকিতে পারেন না। দাসীর দোষ কি গৃহস্থের দোষ, তা আমি জানি না; তবে এ কথা জানি যে, এই ভারতে এমন একটি দাসী নাই, যাহার হাতে বাজারের পয়সা দিয়া বিশ্বাস করা যায়। কেহ যদি আমাদের বোকা বলে ত আমরা তাহার মাথা হাতে কাটিতে উদ্যত হই। অথচ যে ঠকে, সে বোকা নয়। আমরা পদে পদে ঠকিতেছি, কাহাকেও ঠকাইতে পারি না, তবু বোকা বলিলে আমাদের ভারি রাগ হয়। বাড়ীতে ঝি চাকর, একটা সামান্য ফেরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় দোকানদার পর্য্যন্ত, স্যাক্‌রা, দর্জ্জি, সকলেই আমাদিগের ঠকাইতেছে, কিন্তু আপিসের সাহেব ছাড়া আর কাহাকেও ঠকাইবার আমাদের সাধ্য নাই।

সে কথা এখন থাক্। কিরণ রাজকোষের মন্ত্রিত্ব পদ পাইয়া, বড় কঠোর শাসন আরম্ভ করিল। ঝি বাজার করিয়া আসিলে তাহার সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া, কিম্বা মাথা নীচে করিয়া দাঁড়াইয়া, ধামা লইয়া, ওলট পালট করিয়া, এক এক কড়ি

করিয়া, হিসাব বুঝিয়া লইতে লাগিল ; হিসাবে যে কিরণ তেমন পাকা, তা আমার বোধ হয় না, সেই জন্যই সে হিসাব লইয়া এত টানাটানি করিত। মাছ, আলু, পটল, বেগুন, আম, কলার হিসাব দিতে বেচারী দাসী গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিত। এমন অনল পরীক্ষায় পড়িয়া হাড় ভাজা-ভাজা হইবার উপক্রম দেখিয়া, দাসী একদিন রাগিল। বলিল, "দিদিঠাকৃরুণ," একটুকু মেয়েকে কিছু মা ঠাকৃরুণ বলা যায় না, "তুমি আমার হাতে কি এমন জমিদারী সঁপে দিয়েচ যে, এত কোরে নাজেহাল কর? দু-আনা চার আনার বাজার কোরে আমি কত টাকা খাব? তা না হয় আমি কাল থেকে আর বাজারে যাব না; বাবু যেন নিজে বাজার করেন।"

দাসী রাগিল ত কিরণ অমনি নরম হইল। দাসী, কিরণ কিছু ভাল বুঝিতে পারে না দেখিয়া, পূর্ব্বেই বিলক্ষণ এক আধ পয়সা চুরী করিত, এখন সুবিধা বুঝিয়া আরও কিছু লাভ করিতে লাগিল।

যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না। কিরণ যতখানি হিসাবী হইবার ভাণ করিয়াছিল, তাহার কিছুই হইল না। সে কাজকর্ম্মে তেমন পটু নয়। ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল বাহির করিবার সময়, রোজ একটা না একটা কাণ্ড বাধে। কোন দিন তেল ফেলিয়া দেয়, কোন দিন ঘি ফেলিয়া দেয়, কোন দিন ডালের সহিত সরিষা মিশাইয়া ফেলে। তার পর, নিজে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিয়া

কাটিয়া রসাতল করে। এদিকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, তাও কিরণের সাধ্য নয়। ঘর ঝাঁট দিতে গেলে এক দিকের ধূলা আর এক দিকে জমা করে, আর নিজের নাকে মুখে চোকে চুলে ধূলা মাখামাখি করে। বালিসের ওয়াড় কোনমতেই সোজা পরাইতে পারে না। ঝি যত ক্ষণ ভাল করিয়া কাজ কর্ম্ম করে, ঘর দোর পরিষ্কার কবে, ততক্ষণ এ সব হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, ঝির সঙ্গে এমন আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁরি ক'দিন চলে ? যদি নিজের তেমন গতর থাকে, নিজের সব কাজ কর্ম্ম কবিবাব যোগ্যতা থাকে, তা' হ'লেও বা দু'দিন ঝির সঙ্গে ঝগড়া কোন্দল করিলে তেমন কিছু ক্ষতি হয় না।

সুরেশচন্দ্রের নিষেধ ছিল, তাঁহার ঘরে যেন কখন ঝাঁটপাঁটের উপদ্রব না হয়। তাঁর ঘরে দেখ, কতকগুলা বই, খাতাপত্র, কাগজের টুকুরা, একটা দোয়াত ভাঙ্গা আর একটা দোয়াত আস্ত, একখানা মাদুর, একটা ভাঙ্গা চেয়ার, কলম চাবিদিকে ছত্রকার হইয়া রহিয়াছে। চেয়ারেব উপরে মানুষ বসিবার জায়গা নাই, খানকতক ছেঁড়া বই সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যে দিকে দেখ, কেবল ধূলা। পুস্তকে, খাতায় মাদুরে, কাগজপত্রে চার আঙ্গুল পুরু ধূলা। যেন বাড়ীর সমস্ত ধূলা, ঝির ঝাঁটার চোটে অন্য সকল গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, এই ঝঞ্ঝাটশূন্য গৃহের আশ্রয় লইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের সেই রাশীকৃত ধূলার সঙ্গে কোন বিবাদ ছিল না।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অবধি কিরণের ভারি ইচ্ছা যে, লীলার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কিরণ অনেক দিন শ্বশুরবাড়ী আসে নাই, তাহাতে মাস ছয়েক শ্বশুরবাড়ী থাকিয়াই পৃথক হইল, এই জন্য বাপের বাড়ী যাওয়া হয় নাই। নূতন ঘরের গৃহিণী হইয়া, দিন কতক গৃহিণীপনা না করিয়া আর কোথাও যাইতে তাহার তেমন মন সরিল না। এ দিকে সুরেশচন্দ্রও একেলা, তাঁহাকে এমন সময় ছাড়িয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। এইরূপ নানা কারণে, কিরণের বাপের বাড়ী যাওয়া এ পর্য্যন্ত স্থগিত ছিল। শ্বশুরবাড়ী থাকিতে কিরণ দুই তিন বার ঝিকে দিয়া লীলাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু লীলা আসে নাই। একে ত কিরণের শ্বশুরবাড়ী অনেক লোক, বাপের বাড়ীর কেহ আসিলে দশ রকম কথা উঠিতে পারে, তাহাতে লীলা আর কোনখানে যাইতে রাজি নয়। দশ জনের বাড়ীতে লীলা কি বলিয়া যাইবে? কিন্তু যখন কিরণ আলাদা বাড়ীতে উঠিয়া গেল, তখন ত আর কোন আপত্তি রহিল না। নূতন বাড়ীতে আসিতেই, কিরণ লীলাকে মাথার দিব্য দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। লীলা কি করে, বাড়ীতে আহারাদি করিয়া, কিরণের ঝির সঙ্গে পাল্কী করিয়া কিরণের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। লীলা আহার করিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, কিরণের কিছু রাগ হইল। তাহার পর যখন বুঝিল যে, আবার

উনুন পাতিয়া পাক করিয়া খাইতে অনেক কষ্ট, তখন সে রাগ থামিল।

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া উপরে লইয়া গেল। লীলা হাসিয়া কিরণের সঙ্গে উপরে উঠিল! দোতালায় লীলাকে লইয়া গিয়া, কিরণ মহা বিপদে পড়িল। বাড়ীতে কেহ আসিলে, তাহাকে ঘর দোর, জিনিসপত্র দেখাইবার একটা নিয়ম আছে। বৈঠকখানায় ছবি, ঝাড়, ঘড়ি, বিছানা দেখাইয়া, স্ত্রীলোকেরা নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগকে আপ্যায়িত করে। বাপের বাড়ী থাকিতে, কিরণ কত লোককে বাহিরবাড়ীর ঘর দেখাইত। এখন সে ঘরের কি দেখাইবে? তা, লীলার কাছে আবার লজ্জা কি? কিরণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, "দেখ, দিদি, আমার ঘর দেখ!"

বোধ করি কিরণ মনে করিয়াছিল, লীলা তাহার ঘর দেখিয়া হাসিবে। তাহার ঘরে দেখিবার মত কোন সামগ্রী নাই, আন্‌লা-সাজান ভাল ভাল কাপড় নাই, দেয়ালে ছবি নাই, কাঁচের আলমারী করা খেলনা নাই, বিছানার উপর ধোপ্ চাদর পর্য্যন্ত নাই। কিরণ যদি মনে করিয়া থাকে যে, লীলা তাহার ঘর দেখিয়া তামাসা করিবে, তবে সেটা কিরণের ভারি ভুল। ঝাড় ঝুলান, ছবি টাঙ্গান ঘর লীলা যতক্ষণ ধরিয়া না দেখে, ততক্ষণ কিরণের সেই সামান্য ঘর ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। কি দেখিল, বলি শুন। ঘরের এক কোণে

কতকগুলা ময়লা কাপড়, এক দিকে কতকগুলা জঞ্জাল, বিছানার উপর একখানা ভাঙ্গা চিরুণী, এইরূপে ঘর সজ্জিত রহিয়াছে। ঘরের এই অবস্থা দেখিয়া, লীলা একটুখানি হাসিল। তাহার পর কিরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, গৃহিণীও ঘরের উপযুক্ত বটে। মাথার চুলগুলা রুক্ষ রুক্ষ, দেখিতে ঠিক টোকার মত। আর খোঁপার শ্রী কি আর বলিব! লীলা বলিল, "কিরণ, তুমি এমন অগোচাল কেন? ঘর দোর কি এমন কোরে রাখ্‌তে হয়?"

কিরণ আঙ্গুল মট্‌কাইয়া, আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল, "আমি পারিনে ভাই। ঘর আমি যত পরিষ্কার কর্‌তে যাই, তত আরও নোংরা হয়।"

লীলা আর কিছু না বলিয়া, কাপড় চোপড় গোচগাচ করিয়া রাখিল, এক দণ্ডের মধ্যে ঘরখানি দিব্য পরিষ্কার হইল। কিরণ হাসিয়া বলিল, "তুমি ভাই যদি মাঝে মাঝে এসে আমার ঘর দোর দেখে যাও, তা' হলে কেউ আর আমায় নোংরা বল্‌তে পার্‌বে না। তুমি ঘরে এলে ঘরের যেন লক্ষ্মীশ্রী হয়।"

লীলা বলিল, "পাশের ঘরে কি হয়?"

এই ত কিরণ আর হাসি রাখিতে পারে না। বলিল, "ওটা ওঁর পড়্‌বার ঘর। এস, এস, একবার ঘরের মূর্ত্তি দেখসে।"

সুরেশচন্দ্রের ঘরে শিকল দেওয়া থাকিত। কিরণ শিকল

খুলিয়া, লীলাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি আমার ঘরের নিন্দা কর্‌ছিলে? একবার এ ঘরখানি দেখ।"

লীলা অনেক ক্ষণ ঠাহরাইয়া ঘরের সব সাজ সজ্জা দেখিল। দেখিয়া বলিল, "এ ঘরও তোমার দোষেই এমন ময়লা হয়েচে। ঘর ঝাঁট দেওয়া ত আর পুরুষের কর্ম্ম নয়। তুমি এ ঘর এমন করিয়া রেখেচ কেন? এই ঘর তোমার আরও পরিষ্কার রাখা উচিত।"

কিরণ ঠোঁঠ ফুলাইয়া বলিল, এ ঘরে ঢুক্‌তে পাইনে, ঝাঁট দেওয়া ত চুলায় যাক্। এ ঘরে ঝাঁটপাট বারণ, এ ঘরে কারুর আসা পর্য্যন্ত বারণ। এ ঘরে আবার ঝাঁট দেবে কে?"

লীলা বলিল, "আমি দেব।"

কিরণ কহিল, "সর্ব্বরক্ষা! তা' হলে আজ আর কি আমার মাথা থাক্‌বে? এ ঘরে ঝাঁট দেবার হুকুম নেই। আর যদি শুন্‌তে পান যে, তুমি ঝাঁট দিয়েচ, তা' হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? বল্‌বেন যে, ঘরঝাঁট দেবার জন্য বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?"

লীলা হাসিল। কহিল, "দেখ ত, আমি আগে ঘরটা পরিষ্কারই করি। তার পর তিনি এলে পরে তুমি আমার নাম কোরো। আমিও ত তখন থাক্‌ব। তোমার কোন ভয় নেই।"

কিরণ। '-তা তুমি যা জান, তাই কর ভাই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেলে, আমি বেশ দেখ্‌ব এখন। আমি বল্‌ব—আমি কি জানি, দিদি জোর কোরে ঘর ঝাঁট দিলে।"

লীলা। "তা তুমি ব'ল।"

লীলা ঘর ঝাঁট দিবার আগে একটি বুদ্ধির কাজ করিল। কোথায় কি থাকে, সব খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তার পর কাগজপত্র বই, খাতা যেটি যেমন ছড়ান রহিয়াছে, সেটি ঝাড়িয়া সেইখানে রাখিল। শেষে সেই ধূলার রাশি ঝাঁট দিয়া দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। ঝাঁট দেওয়া হইলে কিরণ দেখে, লীলার চুলে ধূলা লাগিয়াছে। তখন কিরণ সাত তাড়াতাড়ি চিরুণী আনিয়া লীলার চুল আঁচড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল। লীলা কিছুতেই চুলে চিরুণী দিতে দিবে না, কিরণও কোনমতেই ছাড়িবে না। কিরণের জিদ্ বেশী, একটা কথা চেপে ধরা তার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, কাজেই তাহার জিত হইল। কিরণ জোর করিয়া লীলাকে বিছানায় বসাইয়া, তাহার চুল খুলিয়া ফেলিল। লীলার মাথায় খোঁপা ছিল না, চুলগুলা কেবল জড়ান ছিল। তার পর যখন লীলার মাথার সেই রাশি রাশি কাল কাল কোঁকড়ান চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন কিরণ বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। লীলা কিরণের চেয়ে মাথায় কিছু বড়, আর তাহার চুল হাঁটুর নীচে পড়ে। গোচে চুল এত বেশী যে, কিরণ দুই হাতে ধরিতে পারে না। চুল এমনি ঘন যে, চিরুণীতে ভাল গেলে না। কিরণ আর কোনমতেই সে চুলের ভার সামলাইয়া উঠিতে পারে না। দু'চার বার চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া কিরণ ঘামিতে লাগিল। লীলা ফিরিয়া তাহার

মুখ দেখিয়া বলিল, "থাক্, বেশ হয়েচে।" কিরণ তা শুনিবে কেন? সে যেমন করিয়া পারিল, জোট পাকাইয়া, কতক চুল ছিড়িয়া, চিরুণীর দু'টা দাঁত ভাঙ্গিয়া, লীলার চুল আঁচড়াইয়া দিল। অবশেষে লীলা একটু হাসিয়া কহিল, "তুমি আমার চুল ছিঁড়ে দাও, তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মাথায় বড় লাগে যে।"

তখন কিরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া, লীলার চুল ছাড়িয়া দিল। লীলা, সেই কেশরাশি এক হাতে তুলিয়া লইয়া জড়াইয়া একটা গেরো দিয়া বাঁধিল।

কিরণ কহিল, "দিদি কি সুন্দর চুল তোমার! আহা! আমার যদি এমন চুল থাক্‌ত। তোমার চুল আমায় দেবে ভাই?"

লীলা কিরণের মুখ চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "এখনি। আমার এ এক রাশি চুলে কাজ কি ভাই? তোমার মা কোনমতে কাট্‌তে দেন না, নইলে এ চুল কবে ফেলে দিতাম!"

কিরণ আর কিছু না বলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। চোক দু'টি জলে পুরিয়া উঠিল।

লীলা তাড়াতাড়ি বলিল, "এস কিরণ, তোমার চুল বেঁধে দিই, কত দিন তোমার চুল বেঁধে দিই নি।"

কিরণের চোকে জল ভরিয়া আসিয়াছিল। চোকের জল সামলাইয়া, হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিদি, চুল বেঁধে দাও না। আর কারুর কাছে চুল বেঁধে আমার মন ওঠে না।"

এই বলিয়া, কিরণ মাথার ফিতা, কাঁটা, আরসী সব সংগ্রহ করিল।

লীলা অনেক ক্ষণ ধরিয়া কিরণের চুল আঁচড়াইয়া, জোট ছাড়াইয়া, একটি সোজাসুজি এলো খোঁপা বাঁধিয়া দিল। কিন্তু সেই খোঁপায় কিরণকে এমনি সুন্দর দেখাইতে লাগিল যে, সে বলিবার নয়। খোঁপা বাঁধিয়া, গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, লীলা কিরণের থুঁতি ধরিয়া বলিল, "এইবার বেশ দেখাচ্চে।" কিরণ লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া রহিল। লীলাও কিরণকে দুই হাতে জড়াইয়া, বুকের ভিতর টানিয়া লইল। দুইজনে অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বৈকালে সুরেশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। কিরণ সিঁড়ির নীচে মাথার কাপড় খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র কিরণকে দেখিয়া কহিল, "এমন সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়া দিল কে? এ ত তোমার সাধ্য নয়।"

সুন্দর খোঁপাটি কিরণের ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। কিরণ সেই খোঁপা দোলাইয়া কহিল, "কেন, আমি কি আর খোঁপা বাঁধ্‌তে জানিনে না কি? তুমি কেবল বল যে, আমি কিছু কর্‌তে পারিনে। দেখ, আজ কেমন খোঁপা বেঁধেছি।"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তাই ত। তোমার যে এত রকম আসে, তা' ত আমি জান্‌তাম না।" এই বলিয়া, সুরেশচন্দ্র কিরণের খোঁপা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

"কি কর! এখনি ঝি আসিবে," বলিয়া কিরণ সিঁড়িতে উঠিয়া গেল। সিঁড়িতে উঠিতে আগে সুরেশচন্দ্রের ঘর; সে ঘরে প্রত্যহ শিকল দেওয়া থাকে, আজ দোর হাট করা রহিয়াছে। সুরেশচন্দ্র সিঁড়িতে উঠিয়া দোর খোলা দেখিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোর খোলা কেন?"

কিরণ আপনার ঘরের দরজাগোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, "আমি কি জানি?" সুরেশচন্দ্র আরও গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোর খুলিবার কি আবশ্যক ছিল?"

কিরণ কহিল, "তা আমি কি জানি?"

সুরেশচন্দ্র তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘরে ঝাঁট পড়িয়াছে। অমনি গম্ভীর স্বর সপ্তমে উঠিল। সুরেশচন্দ্র ঘর হইতে বলিলেন, "আমার ঘর কে ঝাঁট দিল?"

কিরণ তার সেই খোঁপা দোলাইয়া বাহির হইতে বলিল, "তা আমি কি জানি?"

হাসিতে হাসিতে কপাল ব্যথা। সুরেশচন্দ্র সবে আপিস হইতে আসিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার ধড়াচূড়া ছাড়া হয় নাই। যে ঘর ঝাঁট দিতে তিনি বার বার বারণ করিয়াছেন, সেই ঘরে ঝাঁট পড়িয়াছে। কিরণ কোন কথার উত্তর দেয় না, কেবল রঙ্গ দেখিতেছে। কাজেই সুরেশচন্দ্রের ভারি রাগ হইল। তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া রাগিয়া বলিলেন, "এমন কোরে বিরক্ত কর্‌লে আমি বাড়ী থাক্‌বনা। আমার ঘরে ঝাঁট দেবার আবশ্যক

কি ? কাগজপত্র সব ফেলে দেওয়া হয়েচে। এমন কোরে বিরক্ত করলে, আমি বাড়ী থাক্‌তে পার্‌ব না। কি বল, আমি বাড়ী ছেড়ে যাই ?"

এত দূর হবে, সেটা কিরণ বুঝিতে পারে নাই। আমি ত বলিয়াছি, হাসিতে হাসিতে কপাল ব্যথা ধরিল। কিরণ যে সদা সর্ব্বদা এত হাসে, সেটা তার বয়সের দোষ। এমন বয়সে মেয়েরা কেবল কথায় কথায় হাসে। শুধু হাসির কথায় যে হাসে, এমন নয়। সব কথায় হাসিয়া একেবারে গড়াগড়ি। এত হাসি পায় কোথা হইতে, আমি তাই আশ্চর্য্য হই। আজ আবার তাহাতে সত্য সত্যই হাসিবার কারণ রহিয়াছে। এতক্ষণ কিরণ মুখে কাপড় দিয়া খুব হাসিতেছিল। সুরেশচন্দ্রের এমনতর রাগ দেখিয়া, থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশচন্দ্র আরও দু'চার কথা শুনাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় লীলা কিরণের ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, "আমি তোমার ঘর ঝাঁট দিয়েচি। কিরণের কোন দোষ নেই।"

তখন সুরেশচন্দ্র আর লুকাইবার পথ পান না। লীলাকে ঢিপ্‌ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দিদি এসেচ, তা আমার মনে ছিল না।"

লজ্জায় পড়িলে মানুষ যেমন করিয়া হউক, সে লজ্জা ঢাকিবার চেষ্টা করে। সুরেশচন্দ্র আর কোন উপায় না দেখিতে

পাইয়া, কিরণের উপর আর একবার একটু রাগিয়া কহিলেন, “দিদিকে দিয়ে কি ঘর ঝাঁট দেওয়াতে হয়? এই জন্য বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?”

কিরণ আগে থাকিতে সুরেশচন্দ্রের এই কথাটি বলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সে এখন আর স্বামীর সঙ্গে কথা না কহিয়া, ঘোমটা টানিয়া আপনার ঘরে লুকাইল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, “কিরণের খোঁপা কার হাতের, এইবার বুঝিলাম। আর যখন তুমি আমার ঘর পরিষ্কার করেচ, তখন সব ঠিক আছে।”

লীলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “তুমি ঘরে গিয়া দেখ না, কিছু ওলট্ পালট্ হয়েচে কি না।”

সুরেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সব যেমন ছিল, তেমনি আছে। বাহিরে আসিয়া কহিলেন, “সব ঠিক আছে বটে, কিন্তু একটি জিনিস যে নেই।”

লীলা কিছু চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি নেই?”

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, “আমার সে ধূলাগুলি কোথায় গেল? তাদের যে আর দেখ্‌তে পাই না।”

তখন ভারি হাসি পড়িয়া গেল। লীলা হাসি রাখিতে পারে না। কিরণ ঘরের ভিতরে খুব হাসিতে লাগিল। লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, “তা সত্য বটে। তবে কি ধূলাগুলা আবার এনে দিব না কি?”

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "না, আন্‌তে হবে না। দু' চার দিনের মধ্যে তারা আপনি আস্‌বে এখন।"

এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র কাপড় ছাড়িতে গেলেন। মুখ হাত ধোওয়া হইলে, লীলা তাঁহার ঘরে জলখাবার লইয়া গেল। কিরণ দরজার বাহিরে নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লীলার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিবার সম্পর্ক, কিন্তু সুরেশচন্দ্র কখন তাহার সহিত তামাসা করিতেন না, লীলাও কখন তাঁহাকে তামাসা করে না। কিরণ ঘরে আসে না দেখিয়া সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "দিদির সাক্ষাতে আবার লজ্জা কি? ওঁকে মাঝে মাঝে নিয়ে আস্‌বে, কিন্তু ওঁর সাক্ষাতে লজ্জা কর্‌লে উনি আস্‌বেন কেন? ঘোমটা খুলে তুমি ঘরে এস।"

কিরণের মনে মনে কতক ইচ্ছা ছিল যে, লীলার সাক্ষাতে স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, তার পর সুরেশচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে যে টুকু লজ্জা বাকি ছিল, সে টুকুও গেল। কিরণ ঘরে আসিয়া মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল। সুরেশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দিদি, কিরণ কিছু গোচগাচ করিতে পারে না, সেই জন্য আমার ঘরে ঝাঁট দিতে বারণ করি। কোথায় কোন কাগজখানা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিবে, তার পরে আমি হাত পা আছড়াইয়া মরিব। আর আমার ঘর অপরিষ্কার থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আমার তাতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।"

লীলা কহিল, "এখন কিরণ ছেলেমানুষ, তাই সব দিকে

পেরে ওঠে না। এর পর আপনি সব দেখিবে শুনিবে, তখন আর কিছু বলে দিতে হবে না।"

কিরণ বরাবর লীলার দিকে চাহিয়াছিল, একবারও স্বামীর দিকে তাকায় নাই। সে লীলার আঁচল ধরিয়া কহিল, "দিদি, তুমি যদি এ বাড়ীর গিন্নী হতে ত ঘর দোর বেশ পরিষ্কার থাকৃত। আমার মত কথাও শুন্‌তে হত না।"

লীলার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, "ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে!"

সুরেশচন্দ্রও বড় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "কিরণ, তুমি বুঝি দিদির সঙ্গে তামাসা আরম্ভ কর্‌লে? তামাসার সম্পর্কটা হয়েচে ভাল। আর আমি কখন একবার একটু রেগেছিলাম, তা বুঝি চিরকাল মনে করে রাখ্‌তে হয়?"

নূতন নূতন লজ্জা দূর হইলে, মানুষে প্রথম প্রথম বড় অধিক কথা কয়। বিয়ের কনে স্বামীর সঙ্গে যখন প্রথম কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন আর তাহার কথা ফুরায় না। কিরণের এখন অনেকটা সেই অবস্থা উপস্থিত। আগে ত লীলার সাক্ষাতে কথা কহিতে লজ্জা হইত, যদি কথা ফুটিল, ত মুখে হাত চাপা দিলেও আর কথা থামে না। এখন কিরণের মুখে খই ফুটতে লাগিল। স্বামীর কথায় উত্তর করিল, "বালাই! তুমি আবার আমার উপর রাগ কর্‌তে গেলে কেন? আজ আপিস থেকে এসে ত তুমি আমার উপর রাগ করনি,

তুমি আমার পূজা কর্‌ছিলে। এই যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে বল্‌ছিলে, সে ত রেগে নয়।”

সুরেশচন্দ্র হাসিলেন, কহিলেন, “আজকে রাগের মুখে একটা কথা বলেচি বলে কি এতই রাগ কর্‌তে হয়? আর কখন কি তোমার উপর রাগ করেচি?”

কিরণ কহিল, “রাগ কর্‌বে কেন? সে দিন তোমার ঠাকুরঘরে বুঝি একবার এড়াকাপড়ে গিয়েছিলাম, তাই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলে। আর একদিন বাড়া ভাত আঁট্‌কে হয়ে যায় বলে দু’ বার ভাত খেতে ডেকেছিলাম বলে, একেবারে চোক পাকিয়ে ধম্‌কে এলে। তোমার শরীরে রাগ নেই ত। তোমায় আবার রাগী কে বলে? আবার একদিন—”

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, “থাম, হয়েচে। আমার হার, তোমার জিত; এই সব সামান্য কথা তোমার যেমন মনে থাকে, অন্য কথা যদি তেমন মনে থাকৃত, তা হলে বাঁচতাম।”

লেখাপড়ার কথা হইলেই কিরণ আর বড় এগোয় না। ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, “সকলের ত আর সমান বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না। তা না হয় আমি বোকা আছি। তার এখন কি হবে?”

সুরেশচন্দ্র লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, তোমার পড়াশুনা অভ্যাস আছে?”

পড়াশুনার কথা, খাওয়ার কথা, আর স্বামীর অথবা শ্বশুর-

বাড়ীর কথা উঠিলেই, স্ত্রীলোকদের মহালজ্জা উপস্থিত হয়। অভ্যাস ত সহজে ছাড়া যায় না। কাজেই লীলা একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "আমায় ত কেউ পড়্তে শেখায় নি। নিজে নিজে একটু শিখেছিলাম, কিন্তু এখন আর কিছু পড়া হয় না।"

সুরেশচন্দ্র। "কেন?"

লীলা "কি পড়্ব? পড়্বার আর ত ভাল বই পাই না।"

সুরেশচন্দ্র। "পাইলে পড়?"

লীলা। "পড়ি।"

সুরেশচন্দ্র। "আমি তোমাকে বই দিব, তুমি খুব যত্ন করিয়া পড়িবে। বই পড়ায় যে কত উপকার, তা পড়িতে পড়িতে আপনি জানিতে পারিবে। পৃথিবীতে এমন কষ্ট নেই, যা পড়াশুনার অভ্যাসে না কমে।"

লীলা তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল, তুমি আমাকে বই দিও, আমি পড়িব।"

বোধ করি, লীলার মনে আশা হইল যে, তাহার সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুঃখের যে ছায়া ভ্রমণ করে, এইবার তাহাকে দূর করিবার উপায় হইল।

অন্ধকার হয় দেখিয়া, লীলা কিরণকে কহিল, 'রাত হয় ভাই, আজ আমি বাড়ী যাই।"

সিঁড়িতে নামিয়া আসিতে, লীলা কিরণের কাণে কাণে

কহিল, আমার সঙ্গে ঝগড়া হবে বলেছিলে, না? কেমন, আমি ত তোমাদের দু'জনের কোন্দল দেখে নিয়েছি।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে কার সাধ্য যে ঝগড়া করে? তোমার মুখখানি দেখে ঝগড়া কর্‌তে মন সর্‌বে কেন?

পাল্কীতে উঠিয়া লীলা কহিল, "এ পোড়া মুখ পুড়িলেই বাঁচি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মনোমোহিনী নিমন্ত্রণে।

গণেশচন্দ্রের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া সুরেশচন্দ্র বিবেচনা করিলেন, একবার তাঁহারও নিমন্ত্রণ করা উচিত। কিরণ ছেলেমানুষ, একেলাটি থাকে, কোথাও যাওয়া আসা নাই, এজন্য সুরেশচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "এক দিন গণেশচন্দ্রের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ কর।"

শ্রীমতী মনোমোহিনী গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণে আসিলেন; সঙ্গে চার বছরের একটি ছেলে। কিরণ একটু সলজ্জভাবে, একটু হাসিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া, ঘরে লইয়া গেল। মনো-

মোহিনী ঘরে বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। ঘরে কিছু দেখিবার মত নাই বলা লজ্জার কথা, কিন্তু তোমরা সকলেই জান যে, কিরণের ঘর সাজান নয়, আর সে তেমন পরিষ্কারও নয়। সুতরাং শ্রীমতী মনোমোহিনী সে ঘর দেখিয়া যে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমন আশা করা যায় না। ঘর দেখা হইলে মনোমোহিনী কহিলেন, "এখানে তোমার বড় একলা একলা বোধ হয়, না?"

কিরণ কহিল, "আগে আগে যেমন বোধ হইত, এখন আর তত একলা বোধ হয় না।"

মনোমোহিনী আপনার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার গায়ে বড় অধিক গহনা ছিল না, কিন্তু যে কয়খানি ছিল, সেগুলি বেশ ভারি ভারি। আপনার শরীর দেখিয়া কহিলেন, "আমি আর এক গা গহনা পরিতে পারি না, বড় গরম বোধ হয়। গহনা বাক্সের মধ্যেই তোলা থাকে। বল দেখি, গহনা পরিতে তোমার কেমন বোধ হয়?"

কিরণ কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমার খুব বেশী গহনা নেই, আর যা আছে, তাও তেমন ভারি নয়। গহনা প'রে আমি তেমন কিছু কষ্ট বুঝ্‌তে পারিনে।"

মনোমোহিনী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তা ভাই, সকলের ত সমান সুখ, হয় না। কিন্তু আমরা তাতে কিছু মনে করিনে। এই দেখ, আমার বাপের বাড়ীর পাশে এক ঘর

বামণ আছে, তারা বড় গরিব, কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে ঠিক আপনার লোকের মত ব্যবহার করি।”

কিরণ। “সে ত সুখ্যাতির কথা।”

মনোমোহিনী। “তুমি আমার বাপের নাম শুনেচ?”

কিরণ ভারি লজ্জায় পড়িল। কহিল, “না।”

মনোমোহিনী। “রাজবল্লভ সরকার, মস্ত মুচ্ছুদ্দী, নাম শোন নি? সহরশুদ্ধ লোকে তাঁর নাম জানে যে! তা তুমি ছেলে-মানুষ, কখন বাড়ীর বার হও নি, তুমি কি করেই বা শুন্‌বে?”

কিরণ। “হাঁ, নাম শুনেচি।”

মনোমোহিনী। “শোন্‌বারই ত কথা। কে তাঁর নাম না জানে? আমাদের বাড়ী তুমি দেখ নি বুঝি? আর দমদমায় আমাদের যে বাগান-বাড়ী আছে, সেটা কত বড় বাড়ী! ঘর দোর চমৎকার সাজান, ঘরে ঘরে বড় বড় আরসী, মস্ত বাগান, দু'টা পুকুর। বাগানের আমই বা কি মিষ্ট! একবার তোমাকে আমাদের বাগানে নিয়ে যাব।”

কিরণ যে বড় কম কথা কয়, তা নয়, কিন্তু আজ সে বড় বড় আরসী, আর খুব মিষ্ট আঁবের কথা শুনিয়া, কিছু গম্ভীর হইল। কহিল, “বেশ ত।”

আমি নিঃসংশয় বলিতে পারি, তুমি আমি বড় বড় বাড়ী, বড় বড় আরসী, বড় বড় বাগান যেমন হাঁ করিয়া দেখি, এ সকলের কথা তেমনি হাঁ করিয়া শুনি। আশ্চর্য্যের কথা এই,

যে শ্রীমতী মনোমোহিনীর খোকা বাবুর এমন কথাবার্ত্তার দিকে মূলেই কাণ ছিল না। হয় খোকা বাবু বড় বড় বাগান-বাড়ী অনেক দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য তিনি পুরাণো কথায় আর তেমন মন দিলেন না, না হয় খোকা বাবু এই সব গুরুতর বিষয়ের মর্ম্ম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হন নাই। সে যাই হউক, তিনি একটা অতি তুচ্ছ সামগ্রীতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। কিরণের অধিবাসের ডালার একটা কাঁচের পুতুল, ঘরের একটা কুলুঙ্গীতে পড়িয়াছিল। খোকা বাবু একমনে সেইটা দেখিতেছেন, চক্ষের পলক পড়ে না। অবশেষে তিনি মাতার অঞ্চল ধরিয়া সজোরে টানিয়া কহিলেন, "মা, আমি ঐ কুকুরটা নেব।"

একবার তোমরা মনে করিয়া দেখ, মনোমোহিনীর কতখানি মাথা হেঁট হইল। গরীবের ছেলে বড় মানুষ হইয়া বাপকে দেখিয়া আরও অধিক লজ্জিত হয় কি না সন্দেহ। যাহার বাপের এমন বাগানবাড়ী, এত টাকার বিষয়, তাহার ছেলে মাতুলালয়ের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়া, পরের বাড়ীতে আসিয়া, একটা সামান্য কাঁচের পুতুল চাহিয়া বসিল, যেন তাহা কখন দেখে নাই! বল দেখি, তোমরা এমন হতভাগা ছেলে কোথাও দেখিয়াছ? মনোমোহিনী কত চোক টিপিলেন, কত হাত নাড়িলেন, কত বার চোক রাঙ্গাইলেন, কিন্তু সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কিছুতেই বুঝিল না। চোকরাঙ্গানি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু আগের

সুর ছাড়িল না। অনুনাসিক সুরে আবার ধরিল, "আমি ঐ কুকুরটা নেব।"

কিরণ হাসিয়া সে কুকুরটা তাহার হাতে আনিয়া দিল। তখন খোকা বাবু সেটাকে কোলে করিয়া, হাতের উল্টা পিঠ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চোক মুছিয়া চুপ করিলেন।

মনোমোহিনী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তার পর বাপের বাড়ীর কথা রাখিয়া শ্বশুর-বাড়ীর কথা পাড়িলেন। কহিলেন, "উনি যখন পাস কোরে আপিসে বেরোন, তখন কত লোকে ওকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছিল। উনি যেতে চাইলেন না। আগে এক শ টাকার কর্ম্ম হয়েছিল, এখন কুড়ি টাকা বেড়েচে। আর সাহেব যে ভাল বাসে, দেড় শ টাকা খুব শীঘ্রই হ'বে। সাহেব বলেচে, বাঙ্গালী লোকে এত বিদ্যা শিখ্তে পারে না।"

একটু পরে মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোন্ ঘরে বসেন?"

কিরণ কহিল, "পাশের ঘরে।"

মনোমোহিনী। "কেমন ঘর দেখি?"

কিরণ কি করে, সুরেশচন্দ্রের ঘর দেখাইল। লীলার ঝাঁট দেওয়ার পর, সে ধূলাগুলি আবার আসিয়া জমা হইয়াছিল। মনোমোহিনী সে ঘর দেখিয়া বুঝিলেন, গণেশচন্দ্রের বিদ্যা কত বেশী। গণেশচন্দ্রের ঘর খট্ খট্ করিতেছে, কোথাও একটি কুটা

নাই, ঘরে টেবিল পাতা, চেয়ার সাজান। সুরেশচন্দ্রের ঘর অত্যন্ত অপরিষ্কার, টেবিল নাই, যাও একখানি চেয়ার আছে, সেটি মানুষ বসিবার জন্য নয়।

গমনকালে মনোমোহিনী কিরণকে পরামর্শ দিয়া গেলেন, "তুমি ঘরে একটি টেবিল আর চেয়ার রেখ। ঘর বেশ কোরে ঝাঁট দেবে, আর যত সব কুচো কাগজ ফেলে দেবে। বাঁধান খাতাপত্র, বই, এই সব ছাড়া আর কিছু থাক্‌তে দেবে না। তা' হ'লে ঘর বেশ হ'বে।"

পর দিবস প্রভাতকালে সুরেশচন্দ্র তাঁহার ঘরে বসিয়া পড়া শুনা করিতেছেন, এমন সময় কিরণ সম্মার্জ্জনী হস্তে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশচন্দ্র দেখিয়া অবাক্।

কিরণ কহিল, "তুমি ওঠ, আমি ঘর ঝাঁট দেব।"

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

"ঘর দেখ্‌লে গা কেমন করে। আজ থেকে আমি ঘর ঝাঁট দেব।"

"ভারি যে মাথাব্যথা দেখ্‌তে পাই। আমার ত ঘর কখনও ঝাঁট দেওয়া হয় না জানই, তবু ঝাঁটা নিয়ে এসেছ কেন ?"

"কাল গণেশ বাবুর বউ ঘর দেখে যে কোরে বল্লেন। এমন ঘরে আবার মানুষ থাকে! একটা টেবিল, আর খানকতক চেয়ার কিন্‌তেই হ'বে।"

"তাই বল। আমি ভাবছিলাম বুঝি দিদির কথাটা

আজ মনে পড়্‌ল। গণেশ বাবুর স্ত্রী বলেচেন! তিনি কি বলেচেন?"

"বলেচেন আমার মুণ্ডু আর আমার মাথা! এমন ঘর দেখে মানুষের হরিভক্তি উড়ে যায়। ঘরে চারিদিকে কাগজের টুকুরা ছড়ান রয়েচে। এ গুলা সব ফেলে দেব।"

এই বলিয়া কিরণ কাগজগুলা কুড়াইতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে সেগুলা কাড়িয়া লইয়া রাগিয়া কহিলেন, "এ গুলা ফেলে দেবে বই কি! আমাকে ফেলে দেও না কেন? আর টেবিল, চেয়ার আনা না আনা আমার ইচ্ছা। তুমি আমার ঘরে কিছু কোরো না! নিজের ঘর যত ইচ্ছা হয় সাজিও. আমার ঘর হাঁটকাতে এস কেন? আমি কখন তোমার ঘরের কিছু ঘাঁটি?"

কিরণ নাকের নোলক নাড়িয়া কহিল, "তুমি ভারি জান! গণেশ বাবুর বউ কত বড় মানুষের মেয়ে, তা জান? তার বাপের কত বড় বাগানবাড়ী আছে, দু'টা পুকুর, কত জায়গা। তাদের যেটা পচন্দ, সেটা ওঁর পচন্দ হ'লো না। তুমি অমন কেন?"

সুরেশচন্দ্র আরও রাগিলেন, কহিলেন, "যাদের আছে, তাদের আছে, তোমার ত নেই। আমাদের যেমন আছে, আমরা তেমনি কর্‌ব, যাদের বেশী টাকা আছে, তারা তেমনি কর্‌বে। এ সব পরিচয় তোমায় কে দিল? গণেশবাবুর স্ত্রী নিজে বল্‌লেন বুঝি?"

কিরণ। "বল্‌বে না কেন? তাদের আছে, তারা বল্‌বে না কেন?"

সুরেশচন্দ্র তখন হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দু'জনে মিলেচে ভাল। কর্ত্তাগিন্নী দু'জনেই সমান। কেমন করে বল্‌লেন, একবার বল না। ''আমার বাপের মস্ত বাড়ী, মস্ত পুকুর, কত ছবি।' আর কি বল্‌লেন?"

সুরেশচন্দ্র হাত নাড়িয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া এই সব কথা বলিতে লাগিলেন। কিরণের তখন আর সহ্য হইল না। ঘরের বাহিরে ঝাঁটাগাছটা ফেলিয়া দিয়া, রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখ দুঃখ!

যেটি আমরা মনে করি, সেটি কিন্তু হয় না। দেখ, কিরণের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, কিরণ সুখে থাকিবে। কিরণ যে এখন অসুখে আছে, তা নয়, কিন্তু আমরা যেমন সুখের কথা বলি, তা কিরণের কপালে ঘটিল কৈ? ঘরে ঘরে স্বামি স্ত্রী যেমন করিয়া থাকে, তাহাতে প্রণয়ের আদর্শ

কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বই লিখিতে হইলে সেই আদর্শটিই দেখান চাই। বোধ করি, কেতাবের মধ্যে ফুলের গন্ধটুকু দেওয়ার নিয়ম আছে, কাঁটাটি দেওয়া বারণ। অতএব যদি আমি বলি যে, সুরেশ ও কিরণের ক্রমে মনান্তর হইবার উপক্রম হইল, তাহা হইলে সেটা আইনবিরুদ্ধ কাজ হয়। বাস্তবিক, কিরণের তেমন কিছু অসুখ হয় নাই, কিন্তু তাহাদের মনের মিলন তেমনতর ত হইল না। কেমন করিয়া মিলিবে? মনের মানুষ মিলা ত সোজা কথা নয়। তুমি কি ভাব, দু'দিন একত্রে থাকিলেই, প্রণয়ের দুট মিষ্ট কথা কহিলেই মনের মিলন হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় বাঁধা পড়ে? দেখ না, এই বিশ্ব একতা-পূর্ণ অথচ বৈষম্যময়। যে জগৎ জগদন্তরকে অনন্ত কাল ধরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে, সে উভয়ের মধ্যে কত লক্ষ যোজন ব্যবধান! অসীম স্থানে জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া অন্য পিণ্ড ঘুরিতেছে, নক্ষত্র হইতে আলোকতরঙ্গ শত সহস্র বৎসর অচিন্ত্য বেগে প্রধাবিত হইয়া মানব লোকে নিপতিত হইতেছে। কেহই কাহার সহিত মেলে না, মেশে না। এই ভবসমুদ্রে আমরা পাশাপাশি সাঁতারিয়া চলিয়াছি, কেহ ডুবিতেছে, কেহ উঠিতেছে, কেহ পার হইতেছে। সকলে কাছাকাছি আসিতেছে, কিন্তু মিশিতেছে কয় জন? হৃদয়, মন বাঁধিলে বাঁধা যায় না। দুইটি মানুষ একত্র হওয়া সহজ, দুইটি হৃদয় মেশা বড় কঠিন!

তবু দিন যায়। যেমন করিয়াই হউক, দিন কাটিয়া যায়। যাহারা মনে করিয়াছিল, তাহাদের সুখ ফুরাইবার নয়, তাহারা সে সুখের আশা ছাড়িয়া দিয়া দিন যাপন করে। যখন সংসার পাতা যায়, তখন আমরা কত সুখ-শান্তির আশা করি, তার পর সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সংসার এক রকম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের কিরণেরও তাই হইল। সে যে তেমন কিছু অধিক সুখের আশা করিয়াছিল, তা আমি বলিতে পারি না, তবে সে যেটা মনে করিয়াছিল, সেটা হইল না। সুরেশচন্দ্র যে কখন তাহাকে আদর করেন না, কখন তাহাকে দুটা মিষ্ট কথা বলেন না, এমন নয়, কিন্তু কিরণ দেখিল যে, আগেকার মত ভালবাসা আর নাই, দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কিরণ কিছু কর্ম্ম, কিছু অকর্ম্ম করিয়া, একটু সোহাগ পাইবার জন্য স্বামীর কাছে যায়। মনের মানুষ না পাইলে কত অসুখ! সুরেশচন্দ্র কি লেখেন, কি পড়েন, কি ভাবেন, কিরণ তা কিছুই বুঝিতে পারে না। কাজেই যখন দেখিত যে, তাহার স্বামী অন্য দিকে ব্যস্ত, কিরণের দিকে বড় নজর নাই, তখন তার মনে আপনা-আপনিই একটু রাগ, একটু দুঃখ হইত। কোন কোন দিন ঝগড়া হইলে সে বলিত, "আমার চেয়ে একটু খানি কাগজ পর্য্যন্ত ভাল। আমায় মনে পড়বে কেন? আমি কোথাকার কে?" এটা হল রাগের মুখের কথা, কেন না, সুরেশচন্দ্র এক এক সময় কেতাবপত্র ফেলিয়া কিরণের সঙ্গে গল্প করিতেন,

তাহাকে কত আদর করিতেন। তখন মেয়ের অভিমান দেখে কে! কিছুতেই আর কাছে যাওয়া হয় না, কোন মতেই আর ভাল করিয়া কথা কওয়া হয় না। সুরেশচন্দ্র যত ডাকেন, তত বলে, "আমায় কাজ কি? আমাকে আবার ডাক্‌চ কেন? তুমি যা ভালবাস, তাই নিয়ে থাক।" এক এক সময় আবার যেন আগেকার সেই ভালবাসা ফিরিয়া আসে। সুরেশচন্দ্র তখন দুঃখ করিয়া বলেন, "আমি তোমার মত কিছুই করিতে পারি না কিরণ, তোমার ভালবাসার কিছুই শুধিতে পারি না। আর কাহারও হাতে পড়িলে অনেক সুখে থাকিতে।"

কিরণ অমনি হাত দিয়া সুরেশচন্দ্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "অমন কথা বল্‌লে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

এক এক দিন কিরণের খেয়াল চাপিত, ঘর মুক্ত করিবে। পাশের ঘরে সুরেশচন্দ্র ঘোর ভাবনায় মগ্ন, কিম্বা একমনে লিখিতেছেন, এমন সময় কিরণ বিছানা বালিশ দুম্ দাম্ করিয়া বারান্দায় ফেলিয়া, ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। সুরেশচন্দ্র ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "এই সময় না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্ম হয় না? আমার সঙ্গে তোমার যে কেন এমন শত্রুতা, তা জানি না।"

কিরণ কহিল, "তা থাক্ না, ঘরে পোকা পড়ুক, আমি আর কিছু কর্‌ব না।" এই বলিয়া তড়্‌তড়্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আর একদিন সকাল বেলা ঝি বাজার করিয়া আসিয়া বামনঠাকুরুণের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা কহিতেছে, আর বামনঠাকুরুণ মাঝে মাঝে বলিতেছে, “হ্যাঁ ঝি, সত্যি ! কি সর্ব্বনাশের কথা ! আস্পর্দ্ধাটা দেখ !” কিরণ উপর হইতে গলা বাড়াইয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, “কি ঝি ?”

ঝি তখন কিরণের দিকে মাথা তুলিয়া, সেই সঙ্গে একটু গলা চড়াইয়া কহিল, “দেখ, দিদিঠাকুরুণ, আজকে বাজারে সব বল্‌চে কি না, এক ঘর বড়মানুষের বাড়ীর চাকর, দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর ঢুকে সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা চুরি করেচে। বাড়ীর গিন্নী বুড়মানুষ, ঘুমিয়েছিল, তার গলার হার কেটে নিয়েচে। নিয়ে কাপড়ের ভিতর পুরে বেরিয়ে যাচ্চে, এমন সময় একজন ঝি দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে ‘কাপড়ের ভিতর কোরে কি নিয়ে যাচ্চিস্ রে ?’ মিন্সে বল্‌লে ‘ইস্কুলে জলখাবার নিয়ে যাচ্চি।’ এই বলে যে গেল, সে আজও গেল কা’লও গেল। পুলিসের লোক এখন তাকে খুঁজ্‌চে। এখনো ধর্‌তে পারে নি।”

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় ?”

ঝি বলিল, “এই যে গো, বিস্তর দূর নয়।”

সুরেশচন্দ্র যে ঘরে লিখিতেছেন, সেটা আর কিরণের মনে রহিল না। কিছু জোরে বলিল, “মাগী কি মরেছিল না কি ? গলা থেকে হার কেটে নিয়ে গেল, তাতে মাগীর সাড় হলনা। কি ঘেন্নার কথা !”

এই কথা সুরেশচন্দ্রের কাণে গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ওগো, ক্ষমা দাও গো! চীৎকার কর্‌বার এত ইচ্ছা থাকে, নীচে গিয়ে চেঁচাও না। আমাকে কি বাড়ীতে টেঁক্‌তে দেবে না?"

এ সব ত গেল রাগারাগির কথা। এইবার দুট ভাল কথা বলি। একদিন বামনঠাক্‌রুণের জ্বর হইয়াছে, সে দিন সে আর রাঁধিতে পারে না, কোথায় তার মাসীর না পিসীর বাড়ী চলিয়া গেল; বলিয়া গেল, "কাল আসিব।" এদিকে বাড়ীতে এমন কেহ নাই যে, রাঁধিতে জানে। কিরণ কখন হাতে বেড়ী ধরে নাই, রাঁধার ত কথাই নাই। আজ সে অম্লানবদনে বলিল, "কেন, আমি রাঁধিব।" সুরেশচন্দ্র ভয়ে সারা, বলেন, "না কাজ নাই, শেষে হাত পা পুড়াইয়া বসিবে। আর এক বিপদ ডাকিয়া কাজ নাই। এক দিন না হয় রান্না নাই হইল, বাজার হইতে লুচি কিনিয়া আনাও।"

কিরণ কহিল, "আমি ত আর খুকী নই যে, হাত পুড়িয়ে ফেল্‌ব। আর, এক দিন বামনঠাক্‌রুণ নেই বলে যে হাঁড়ি চড়্‌বে না, সেই বা কেমন কথা? আমার কি এমন সঙ্গতি আছে যে, আমি চিরকাল রাঁধুনি রাখবো?"

সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, এ তর্কে কিরণেরই জিত, অতএব তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক চুপ করিয়া রহিলেন।

তার পর রান্নার বড় ধূম পড়িয়া গেল। অন্য দিন যেমন

সাদাসিধা মাছের ঝোল ভাত আর কিছু ভাজা পোড়া হয়, আজ আর সে রকম হবে না। সুরেশচন্দ্রের আফিসের তাড়া, সকাল সকাল যা জুটিয়া ওঠে, আহার করিয়া যান, কিন্তু আজ কিরণ পঞ্চব্যঞ্জন ভাত রাঁধিতে বসিল। অম্বল, চড়চড়ি, ডালনা, ঘণ্ট, কিছু ছাড়িল না। সুরেশচন্দ্র উপরে ছিলেন, কিন্তু সে দিন আর তাঁর তেমন পড়াশুনা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার ঘরের বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “কত দূর ?” লঙ্কার ফোড়নের ধোঁয়া লাগিয়া খানিক ক্ষণ কাসি আর থামে না। উপরে সুরেশচন্দ্র কাসেন, রান্নাঘরে কিরণ কাসে। তার পর তেলের চড়চড়ানি, ঘিয়ের কলকলানি, মাছসাঁতলানি প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ হইতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে একটু ক্ষান্ত হইলে, সুরেশচন্দ্র কতক স্থির হইয়া ঘরে বসিলেন। খানিক পরে, কোথাও কিছু নাই, কিরণ ছুটাছুটি উপরে আসিয়া সুরেশচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিল। দেখ, একবার কিরণের মুখখানি দেখ! কপালে চুলগুলি ঘামে জড়াইয়া গিয়াছে, মুখখানি আগুনের তাতে লাল হইয়া উঠিয়াছে, কপাল দিয়া দর দর করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে খুন্তী। কিরণ আসিয়া ডাকিল, “ওগো, একবার শুনে যাও না।”

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া কহিলেন, “হাত পোড়াও নি ত ?”

কিরণের হাত যে একেবারে পোড়ে নাই, এমন নয়। হাতে

তপ্ত তেলের ছিটা লাগিয়া দুটা ফোস্কা পড়িয়াছিল। সে কিরণের মনেও নাই। সে কহিল, "হাত পুড়্‌বে কেন? আমি কেমন রেঁধেছি, একবার দেখে যাও।" সুরেশচন্দ্র কিরণের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে গিয়া কিরণ বলে, "কেমন রেঁধেছি, একটু মুখে দিয়ে দেখ্‌তে হবে।"

সুরেশচন্দ্র হাস্যমুখে কহিলেন, "হ্যাঁ, তা হবে বই কি। তুমি রেঁধেছ, আমি খাব, তার আবার কথা?"

আগে কিরণ চিংড়ীমাছের ডাল্‌না বাহির করিল। ডাল্‌না তপ্ত আগুনের মত, তখন পর্য্যন্ত ধোঁয়া উঠিতেছে। ফুঁ দিয়া জুড়াইলে পরে, সুরেশচন্দ্র একবার আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। মুখে দিয়া কহিলেন, "বাঃ! চমৎকার!"

কিরণের মুখময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "যাও, ঠাট্টা কর্‌তে হবে না। ছাই হয়েচে বুঝি? নুনে পুড়ে গিয়েচে না কি?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "না, নুন সমান হয়েচে।"

এইরূপে একে একে সব মুখে দিয়া দেখা হইল। সুরেশচন্দ্রের মুখে আর সুখ্যাতি ধরে না।

তুমি হয় ত মনে করিতেছ, কিরণ বুঝি সত্য সত্যই বড় রাঁধিয়াছিল। সেটা কিন্তু ভুল। কিরণ যেমন রাঁধিয়াছিল, তোমার বাড়ীর ব্রাহ্মণী তেমন রাঁধিলে, তুমি তার পর দিন তাহাকে তাড়াইয়া দিতে, আর যদি সে দিন সুরেশচন্দ্রের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ থাকিত, তাহা হইলে সাত বাড়ী নিন্দা করিয়া

বেড়াইতে। আমি বেশ জানি, যদি ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী সেই অপূর্ব্ব ডালনা রাঁধিতেন ত সুরেশচন্দ্র বকিয়া বাড়ী ফাটাইয়া দিতেন। ঝি মাগী সে দিন কিছুই খাইতে পারে নাই, ডাল্না মুখে দিয়া বলিয়াছিল, "এ কি সুক্তুনি হয়েচে না কি? মানুষে কি এমন রান্না খেতে পারে?" তার পর মাগী ভাত ফেলিয়া দিয়া, বাজার হইতে জলপান কিনিয়া খায়। কিন্তু সুরেশচন্দ্র আর কিরণ, দু'জনে সোনাহেন মুখ করিয়া দিব্য ভাত খাইয়াছিলেন।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় কিরণ ছাদে বসিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কখন তারা দেখে নাই, এমন মানুষ কোথাও আছে? আমরা আমাদের কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, আকাশ দেখিবার অবকাশ থাকে না। তবু এক একবার একেলা বসিয়া সন্ধ্যার আকাশে তারা দেখিলে, কতকগুলা অদ্ভুত কথা মনে আসে। হয় ত ভাবি, এমন এক দিন আসিবে, যখন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আর আশ্রয় পাইব না, যখন এই নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া ঐ নীল আকাশে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিব, যা কিছু ভাল বাসিতাম, সব পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে, অনন্তের মধ্যে অনন্ত বাসনা ভাসিয়া বেড়াইবে। হয় ত তখন এই পরিশ্রান্ত আত্মা আর কোথাও বিশ্রাম করিবে, নক্ষত্রের চরণে উপবেশন করিবে। হয় ত মনে করি, ইহজগতে কেহ আমার মন বুঝিল না, কেহ আমার মুখ চাহিয়া দেখিল না। ওই নক্ষত্রে এমন কেহ আছে, যাহাকে পাইলে, আমার সুখ হইত। কিরণ এমনতর কোন কথা ভাবিতে

জানে না। সে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এক জায়গায় অনেক ক্ষণ চাহিয়া দেখিলে, আরও তারা দেখা যায় কি না। তার পর ভাবিল, তারাগুলি কত দূর, কত বড়? মানুষ মরিয়া কি তারা হয়? আজ কাল আবার বলে, তারাগুলা সূর্য্যের মত, তবে কি এতগুলা সূর্য্য আছে? এই রকম খানিক ভাবিয়া, কিরণ সে ভাবনা ছাড়িয়া দিল। তখন বাপের বাড়ীর কথা; লীলার কথা, মনোমোহিনীর কথা ভাবিতে লাগিল। এমন সময় সুরেশচন্দ্র আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাব্‌ছিলে?"

কিরণ কহিল, "ভাবব আবার কি? আমি তোমার মত দিনরাত ভাব্‌তে পারিনে। তা' হ'লে পাগল হয়ে যাব যে।"

সুরেশচন্দ্র কিরণের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দেখ, কিরণ, কেমন সুন্দর তারা উঠেছে!"

কিরণ কহিল, "তা ত রোজ দেখ্‌চি। আজ এমন কি বড় সুন্দর?"

সুরেশচন্দ্র। "আচ্ছা, কিরণ, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও ত। দেখ, সূর্য্য, চাঁদ, তারা, এ তিনই আমরা আকাশে দেখতে পাই। বল দেখি, এ তিনটির মধ্যে তোমার কি হ্তে ইচ্ছা যায়?"

কিরণ। "কি বল, ভাল লাগে না। অমন অনাছিষ্টি কথা বল কেন?"

সুরেশচন্দ্র। "তা হোক্, তুমি আমার কথার উত্তর দাও না। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি, উত্তর দিলে ক্ষতি কি ?"

কিরণ। "আমার তারা হতে ইচ্ছা করে। তারা হওয়া বেশ।"

সুরেশচন্দ্র। "কেন বল দেখি ? সূর্য্য এত বড় দেখ্‌তে, যা নহিলে দিন হয় না, যাকে সকলে পূজা করে, যার এমন আলো, সে সূর্য্য হতে তোমার ইচ্ছা করে না ? আচ্ছা, সূর্য্য যেন আগুনের মত দেখ্‌তে, কিন্তু চাঁদ হতে তোমার ইচ্ছা করে না, সে কি কথা ? চাঁদ এমন সুন্দর যে, চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা করে। চাঁদের মতন মুখ হলে বর্ত্তাও, অথচ চাঁদ হতে চাও না ? জ্যোৎস্না কেমন সুন্দর বল দেখি ? এমন চাঁদ থাক্‌তে তারা হতে তোমার কেন ইচ্ছা যায়, বল না ?"

কিরণ। "তা আমি জানি না। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমি উত্তর দিলাম। কেন, কি বৃত্তান্ত, অত শত আমি জানি না।"

সুরেশচন্দ্র উর্দ্ধমুখে নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, কিরণ ! তোমার তেমন বই পড়া অভ্যাস নাই, বইয়ের কথা বলাও অভ্যাস নাই, তবু তুমি মানুষের মনের ইচ্ছা ঠিক বলিয়াছ। কত কথা আমাদের মনে আসে, আমরা কিছুই বলিতে পারি না ; সে সব কথা কেন মনে আসে, বুঝাইবার যো নাই। তারা হইতে আমাদের কেন ইচ্ছা হয়, জান ? মানুষ যেমন অনেক, তারাও তেমনি গণা যায় না। মানুষের জীবন যেমন

চঞ্চল, তারার জ্যোতি তেমনি চঞ্চল। তাই আমরা ভাবি যে, সংসারের খেলাধূলা ফুরাইলে, আমরা তারা হইয়া আকাশের এক কোণে লুকাইয়া থাকিব। চন্দ্র সূর্য্য হইয়া আমাদের কি সুখ? চিরকাল একেলা থাকিতে হইবে; যাহাদের ভালবাসি, কখন তাহাদের মুখ দেখিতে পাইব না। যখন আমাদের দিন ফুরাইবে, যখন আর আমরা এমন হাত ধরিয়া নক্ষত্রের নীচে বসিয়া থাকিব না, তখন আমরা দুই জনে দুটি তারা হইব। দুই জনে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশে উঠিয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া দেখিব। কেমন, কিরণ, তাহা হইলে সুখ হয় না?”

উত্তরে কিরণ স্বামীকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া, মুখের উপর মুখ, চোখের উপর চোখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া কহিল, “আমি যেন আগে যাই। আমি সেখানে তোমার পথ চেয়ে থাক্‌ব।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবজীবন।

লীলার জীবনের অন্ধকার রজনীতে কোথায় যেন অতি মৃদু প্রভাত পবন বহিল। সে দেখিল যে, বই পড়িলে আপনার চিরদুঃখের কথা কতকটা ভুলিয়া থাকা যায়। লীলা বুদ্ধিমতী প্রখরা

স্মৃতিশালিনী পাঠাভ্যাসে স্মরণশক্তি আরও মার্জ্জিত হইতে লাগিল। লীলা কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই বিস্তৃত রাজ্যের অতুল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে সে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়ে। হাসে, কাঁদে, ভাবে নিশ্বাস ত্যাগ করে। আপনিই ভাঙ্গে, আপনিই গড়ে। যে এত দিন অন্ধকারে পথ হাঁৎড়াইয়া বেড়াইতেছিল, যে দিকে যায়, সেই দিকেই অন্ধকার, আজ সে এক দিকে আলোক দেখিতে পাইল। যে শয়নে স্বপনে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিত, সে এখন সুখের স্বপ্ন কল্পনা করে। একটা মানুষ নিজের দুঃখে অভিভূত হইবে, আর কাহারও জন্য ভাবিবে না? আর কি কোন ভাবনা নাই? লীলা এখন ভাবে, আমার এইটুকু দুঃখ লইয়া আমি জগৎ পূরিয়া রাখিয়াছিলাম? আমার এই দুঃখ, পৃথিবীর কত কোণে এমন কত দুঃখরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। আমার কোন সুখ নাই, এই আমার দুঃখ, নহিলে আর আমার দুঃখ কি? কত লোক দুঃখের বোঝা বহিতে পারে না, তাহারা জীবন বহন করে কিরূপে? অনেক সময় লীলা আপনার দুঃখের কথা কিছুই ভাবে না। কল্পনানগরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, সুখশান্তির নিকেতন বিরচিত করে। কোথায় কোন্ চন্দ্রলোকে তরল কৌমুদী তটিনী বহিয়া যাইতেছে, তীরে বসিয়া লীলা। কত লোকে যায় আসে, কত বালক হাসে গায়, কত আনন্দের ধ্বনি, কত লোকের মেলা। কত লোকে লীলার মুখ দেখিতে আসে, কত বালক

তাহার আঁচল ধরিয়া টানে। এখানে দেবতা, সেখানে দেবী, লীলা ফুল তুলিয়া দেবদেবীর পূজা করিতেছে। পাখী আসিয়া তাহার সম্মুখে গান করে, তাহার কাঁধে বসে। মাথার উপরে উড়িয়া ডাকে, "লীলা ! লীলা !" ফুল মাথায় ঝরিয়া পড়ে, বাতাস আসিয়া গায়ে লাগে। লীলা কল্পনারাজ্যের প্রজা হইল। এক দিন লীলা একখানি গ্রন্থে পড়িল ঃ—

"আমাদের দেশের একটি আচার দেখ। এই তোমার স্ত্রী,—তুমি হিন্দু, তোমার স্ত্রী, তুমি মরিলে যাঁহার অদৃষ্টে চিরবৈধব্য রহিয়াছে, যিনি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তুমি যাঁহার কণ্ঠরত্ন, তিনি তোমার মৃত্যুর সময় কি করেন ? তুমি কালশয্যায় শুইয়া আছ, যম দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, তোমার যাত্রার আর বিলম্ব নাই। স্ত্রী পাশে বসিয়া আছেন, স্বামীর শ্বাস হইয়াছে। ক্রমে হাত পা হিম হইয়া গেল, অবশেষে প্রাণবায়ু বাহির হইল। অমনি স্ত্রী সরিয়া দাঁড়াইলেন। মরিলে ভূত হয়, ছুঁইতে নাই ! এই শরীর, এই একজনের সর্ব্বস্ব, আর এই শব, সেই জনেরই অস্পৃশ্য।"

লীলা ভাবিল, শরীর ত সর্ব্বস্ব নয়, সর্ব্বস্ব ত চিরকালই সর্ব্বস্ব থাকে। স্ত্রীলোকের আর কি আছে যে, সে স্বামীকে ভুলিয়া থাকিবে ? মরণের পর কে সহজে ভোলে, স্ত্রী না স্বামী ?

আর এক স্থানে পড়িল, "এক বিন্দু অশ্রু জল হাসির, আর এক বিন্দু রোদনের, এ দুইয়ে কিছু প্রভেদ আছে ? দুই সমান

লবণাক্ত, দুই সমান স্বচ্ছ। আনন্দের অশ্রু, আর বিষাদের অশ্রু একত্রে রাখিলে কে বুঝিবে—কোনটি কিসের? আনন্দ আর নিরানন্দ, দুইয়ের ত একই ফল, দুই ত এক।”

লীলা একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হবেও বা! বুঝি সুখ দুঃখ কিছুই নাই, দুই বুঝি মনের ভুল! যেমন দুঃখ ভুলিয়া থাকা যায়, বুঝি সুখ ভুলিয়াও তেমনি থাকা যায়। হয় ত **ভুলিতে পারাই সুখ, মনে রাখাই দুঃখ।**

এক একবার কোথাও কিছু নাই, লীলা আপনার মনে পড়িতেছে, সহসা তাহার প্রাণ চমকিয়া ওঠে, সহসা তাহার মনে হয়, একা! একা! কল্পনার সমুদ্রে কত লোকের সঙ্গে ভাসিয়া গিয়া, মাঝখানে গিয়া দেখ, আর কেহ তাহার সঙ্গে নাই, সকলে তাহাকে একেলা ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার বোধ হয়, লীলার প্রাণের এক অংশ শূন্য ছিল, তাহা কখন পূরে নাই। সেই স্থানের নিকট দিয়া আর কেহ গমন করিলে, সেই বিজন শূন্য স্থানে পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইত, তাহাতেই লীলা চমকিয়া উঠিত। সে অন্ধকারে, আর কোথাও হইতে আলোকরশ্মি পতিত হইলে, সে অন্ধকার সঙ্কুচিত হইয়া লুক্কায়িত হইত। প্রাণের একটা তৃষ্ণা লীলা কখন মিটাইতে পারে নাই, মনুষ্যজীবনের একটা সুখ সে ভয়ে কল্পনা করিত না, ভাবিত, সে সুখ স্বপ্নেও মনে করিলে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করিবে। তথাপি লীলার নবজীবন আরম্ভ হইল।

লেখা পড়ার কথায় আমার আর একটা মনে পড়িতেছে। সুরেশচন্দ্রের রচনার আর একটা নমুনা দেখাইব। গণেশচন্দ্র একদিন সুরেশচন্দ্রের বাড়ী আসিয়া একখানা জীর্ণ খাতা টানিয়া বাহির করিলেন। যাহা যাহা পড়িলেন ও তাহার পর যে কথা-বার্ত্তা হইল, পরে বলিতেছি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজি।

"অন্ধকার! আর কোথাও কিছু নাই। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, ঊর্দ্ধে, অধোমুখে, অবিচ্ছিন্ন, অনন্ত অন্ধকার! ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী, কল্পনাব্যাপী, প্রগাঢ় অন্ধকার! যুগলমূর্ত্তি সেই অনন্নু-মেয় আয়তন জুড়িয়া আছে,—বিশাল ভীষণ, ছায়াময় মূর্ত্তি। পুরুষ আর রমণী, ভয়ময় কালদম্পতী! ভবিষ্যৎ আর অতীত, দুই তমোময়, বিভীষিকাময়, মরণময় মূর্ত্তি চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। শ্বাসরোধকারী অন্ধকার গলদেশে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতেছে,—অতি ভয়ানক! মুক্তকেশী যামিনী চক্ষুশূন্য কোটরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সেই ভীষণ দম্পতীযুগলের মধ্যে প্রফুল্ল শিশু মূর্ত্তি! চক্ষে তারা জ্বলিতেছে, মুখে মধুর হাসি;

কুঞ্চিত কেশ, কোমল গঠন, সুঠাম, সুললিত। দুই পার্শ্বে সেই ভয়ানক জনক জননী! অন্ধকারের কোলে আলো, মরণের কোলে জীবন! অতীত পিতা, ভবিষ্যৎ মাতা, সন্তান আজি!

তারা নাই, চাঁদ নাই, নদী বহিতেছে,—নীরবে, নিঃশব্দে, অন্ধকারে, সুধীরে। কূল নাই, কিনারা নাই, তরী নাই, তুফান নাই, তরঙ্গ নাই। কালো জল, কালো আকাশ, জলে তারার হার নাই, কেবল অন্ধকার। অন্ধকার তটিনী বহিতেছে, মুখে কল কল কথা নাই, শরীরের মন্দ মন্দ আন্দোলন নাই, সোহাগ নাই, যৌবন নাই, মন্থর গতি নাই। অজস্র, অবিরাম ধীর প্রবাহ।

বিদ্যুৎবিলসন, মেঘগর্জ্জন, বজ্রপতন! কর্ণ বধির হইয়া গেল। কড়্ কড়্—পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। স্রোতস্বিনী অতি প্রবলবেগে ছুটিয়াছে। তোলপাড় করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, লহরের উপর লহর তুলিতেছে! প্রলয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস! গেল, গেল, সব গেল! পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নগর নগরী ভাসিয়া গেল! অন্ধকার, অন্ধকার! ভীম কোলাহল, আলোড়ন, ভৈরব উচ্ছ্বাস, সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যা! সৃজনের চিহ্ন লোপ করিয়া ধাবিত হইয়াছে।

এই মিলন! নদীতে নদীতে অন্ধকার মিলন। এই কোলাহলে আর নিস্তব্ধতায় মিলন, বেগে আর শান্তিতে মিলন। আঘাত প্রতিঘাত, জলে জলে সঙ্ঘর্ষণ, এই শুভ্র ফেন উঠিল, এই

আলোক ফুটিল। এই ফেনের নাম, এই আলোকের নাম,—আজি !

বিস্তৃত মরুভূমি, বালুকারণ্য! উপরে আকাশ নাই, সীমাচক্র নাই, শুধু অন্ধকার। অতি বিশাল আয়তন, তরঙ্গায়িত সমুদ্রবৎ। অন্ধকাবময় মরীচিকা, ছায়াময় দেহীর ভীষণ নৃত্য! ধূঃ ধূঃ ধূঃ ধূঃ অসীম স্থান ব্যাপ্ত প্রসার! আশার অস্থিকঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে, এখানে সে বাঁচিবে কিরূপে ?

আবার মরু! উভয় মরুভূমিব সংযোগস্থানে এক খণ্ড মৃত্তিকার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়াছে। সেই স্থলে একটি কুসুম ফুটিয়াছে। কাল মরু মধ্যে এই এক মাত্র ফুল্ল কুসুম,—আজি !”

* * * * *

পড়িয়া গণেশচন্দ্র কহিলেন, “কবিকঙ্কণ, তুমি লিখিয়াছ ভাল। তুমি এমন লিখিতে পার, আমি তা জানিতাম না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি বর্ত্তমান সময়কে ভূত ভবিষ্যতের অপেক্ষা ভাল বল কেন ?”

সুরেশচন্দ্র। “বর্ত্তমানেব সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। অতীতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই, ভবিষ্যৎ আমাদিগের আয়ত্ত নয়।”

গণেশচন্দ্র। “তা নাই হউক, ভূত এবং ভবিষ্যৎকে মরু বল কেন ? বর্ত্তমান ভাল হইল, মানিলাম, আর দুই কাল মন্দ কেন ?”

সুরেশচন্দ্র। "আমার ঘাট হইয়াছে, আর কখন এমন লিখিব না। আমি যখন লিখিয়াছিলাম, তখন আমি অত তর্ক বিতর্ক করি নাই। তর্কের কাছে আমি নাচার।"

গণেশচন্দ্র পাত উল্টাইতে লাগিলেন। আর এক স্থানে পড়িলেন,—

"রাস্তায় যেমন ময়লা-গাড়ী চলে, সেইরূপ এই সংসার-পথে অনেক ময়লা-গাড়ী আছে। তাহারা আর কেহ নহে,—নিন্দুকের দল। ময়লার গাড়ী দরজাগোড়ায় দাঁড়াইয়া বাড়ীর সম্মুখে যে আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে, তাহাই তুলিয়া লইয়া যায়। নিন্দুক গৃহে প্রবেশ করিয়া চরিত্রের, মনের জঞ্জাল লইয়া যায়। গুণ দেখিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই, দোষ বহন করাই ইহাদের কাজ। ময়লাগাড়ী এবং নিন্দুক, উভয়ে প্রভেদ এই যে, ময়লা-গাড়ী নিত্য পরিষ্কৃত হয়, নিন্দুক তাহার নিন্দার বোঝা কখন নামাইতে পারে না। তাহাকে চিরকাল সে ভার বহন করিতে হয়।"

গণেশচন্দ্র আর পড়িলেন না। কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না। এক বার একটি ঘোর কুৎসিত রমণী দর্পণে মুখ দেখিয়া, সে দর্পণ আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। বোধ করি, গণেশচন্দ্রের সেই দশা হইল। তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "এ কথাটা কি আমাকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েচে না কি?"

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কথাটা ?"

গণেশচন্দ্র উক্ত স্থান দেখাইয়া কহিলেন, "এই তুলনাটা।"

সুরেশচন্দ্র পড়িয়া বলিলেন, "তোমাকে লক্ষ্য কোথায় ?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "কেন, এই যে নিন্দুকের কথা রহিয়াছে।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আমি কাহাকেও লক্ষ্য করি নাই। নিন্দুকমাত্রকেই বলিয়াছি। যদি আমি নিন্দা করিয়া বেড়াই, তাহা হইলে ও-কথা আমার প্রতিও প্রযোগ করা যাইতে পারে। তুমি আপনি ঘাড় পাতিয়া লও কেন ? তুমি কি নিন্দুক ?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "না, সে জন্য নয়। তবে আমি তোমাকে ঠাট্টা তামাসা করি, আর তোমার লেখার তেমন সুখ্যাতি করি না, যদি সে জন্য লিখিয়া থাক।"

সুরেশচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, "নিন্দা করা স্বতন্ত্র, ভাল মন্দ বলা স্বতন্ত্র। যে মন্দ অভিপ্রায়ে নিন্দা করে, সেই নিন্দুক। আমার লেখা তোমার ভাল লাগে না, তুমি ভাল বল না। ইহাতে নিন্দার কথা কি ?"

গণেশচন্দ্র আর বড় কথাবার্ত্তা না কহিয়া বিদায় হইলেন। সুরেশচন্দ্রের বাড়ী তাঁহার আসিবার কথা নয়, কেন না, তিনি এখন একজন গণ্য মান্য লোক হইয়া উঠিতেছেন, আর সুরেশচন্দ্র একজন সামান্য কেরাণী মাত্র। গণেশচন্দ্র আসিতেন, পূর্ব্বে বন্ধুতার অনুরোধে,—আর সুরেশচন্দ্রকে এক আধটু বিদ্রূপ

করিবার জন্য। যে আমাদের কথার সমান উত্তর করিতে পারে না, তাহাকে দুই চারিটা কথা শুনাইতে আমরা বড় ভালবাসি। যে আমাদের অপেক্ষা হীনবল, তাহাকে ব্যঙ্গ করিলে ও রাগাইলে আমাদের বড় আহ্লাদ হয়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা গৃহিণী।

গণেশচন্দ্রের গৃহিণীকে আজ বিকালে নাপিতানী আল্‌তা পরাইয়া দিয়া গিয়াছে. এখন আর আগেকার মত চার আঙ্গুল চওড়া আল্‌তা পরার রেওয়াজ নাই। শ্রীমতী মনোমোহিনী বেশ সরু করিয়া আল্‌তা পরিলেন। নাপিতানী মাগী তাঁহার বাপের বাড়ী আল্‌তা পরায়। বড় বাড়ীর নাপিতানীও আপনাকে বড় লোক মনে করে। ছোট খাট বাড়ীতে সে বড় একটা কামায় না, তবে দিদিঠাকুরুণের মায়া কাটাইতে না পারিয়া, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। নাপিতানী বিধবা, বয়স বছর পঁইত্রিশ হবে, দেখিতে নিতান্ত কুশ্রী নয়। পরণে দিব্য পরিষ্কার থান কাপড়, দু'হাতে দু'গাছা

মোটা মোটা তাগা, গলায় মোটা মোটা দানা। নাপিতানী মনোমোহিনীকে সরু করিয়া আল্‌তা পরাইয়া, পায়ের নখ, আঙ্গুলের গলি, সব আল্‌তায় রাঙ্গা করিযা দিয়া চলিয়া গেল। মনোমোহিনী নখের উপর কোন মতেই আল্‌তা দিতে দিবেন না, বলেন, "এখন ত আর নিতান্ত ছেলেমানুষটি নই, ও আবার কি আল্‌তা পরাবার শ্রী!" নাপিতানী তত চাপিয়া ধরে, বলে, "নখে আলতা পর্‌বে না, সে আবার কোন্ দেশী কথা! তোমায় সে দিন কোলে কোরে আল্‌তা পরিয়ে দিয়েচি, এরি মধ্যে বুঝি তুমি একেবারে মস্ত গিন্নী হয়ে উঠ্‌লে? ন্যাও, দিদি ঠাক্‌রুণ, তুমি আর জ্বালিও না।" নাপিতানী চলিয়া গেলে, মনোমোহিনী উঠিয়া কাপড় ছাড়িতে গেলেন। আল্‌তা পরিয়া তিনি আর সোজা চলেন না, পা টিপিয়া টিপিয়া, পায়ের আঙ্গুল গুলি উঁচু করিয়া, অতি সাবধানে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, পায়ে যেন কাঁটা ফুটিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "অমন করিয়া না হাঁটিলে মেজেতে আল্‌তার দাগ লাগিবে।" কিন্তু আমার সন্দেহ, প্াছে তাঁহার পায়ের আল্‌তা মুছিয়া যায়, এই ভয়ে তিনি অত সাবধানে পা ফেলিতেছিলেন। কাপড় ছাড়া হইলে, খুব সাবধানে পা মুছিয়া উপরে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পুত্র চন্দ্রনাথ ছুটাছুটি আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "মা, আমায় কোলে নে।"

মনোমোহিনী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখন ছেড়ে দে।

এই বুঝি কোলে নেবার সময়! যা, এখন খেলা কর্‌গে, না হয় ঝির কাছে যা।”

চন্দ্রনাথের বয়স চার বছর, তিনি কিছু আব্‌দারে। মাকে ছাড়িয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি জোঁকের মত দুই হাতে মাতার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া, ধূলামাখা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “আমি কোলে উঠ্‌ব। কোলে না নিলে আমি ছেড়ে দেব না।”

মাতা কহিলেন, “কি আমার আদুরে ছেলে এলেন রে! ছেড়ে দে বল্‌চি, নইলে মার খাবি।”

চন্দ্রনাথ সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। মাতা যত তাহার হাত ছাড়াইতে যান, সে তত প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে। এইরূপে জড়াজড়ি করিতে, চন্দ্রনাথ একবার মাতার পা মাড়াইয়া ফেলিল। মনোমোহিনী সবে সেইমাত্র আল্‌তা পরিয়াছেন তার পর জল লাগিয়া পা ভিজিয়া আছে। তাঁহার পায়ের এক দিকের আল্‌তা, চন্দ্রনাথের পায়ের ধূলা লাগিয়া মুছিয়া গেল, মনোমোহিনীর পায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া রহিল। তিনি পায়ের দিকে চাহিয়া, “পোড়াকপালে! চোক্‌খেগো! চোকের মাথা খেয়েচ!” বলিয়াই ছেলেকে এক প্রচণ্ড চড়। চন্দ্রনাথ আব্‌দার ভুলিয়া, মাতাকে ছাড়িয়া দিয়া, করুণ-রসোদ্দীপক নানা প্রকার রাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, ছোট ছোট বালক বালিকারা জগতের যত অনিষ্ট করে, এত আর কেহ করে না।

স্ত্রীজাতিই জগতের সারভাগ, তাঁহাদিগকে লইয়াই জগৎ। অতএব, যে তাঁহাদিগের অনিষ্ট করে, সে নিঃসন্দেহ সমস্ত জগতের অনিষ্ট কবে। হয় ত কোন সুন্দরী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য দুই প্রহর কাল ধরিয়া সাজগোজ করিয়াছেন, এইবার গাড়ী কিম্বা পাল্কীতে উঠিলেই হয়, এমন সময় পঞ্চমবর্ষীয় এক গুণধর পুত্র আসিয়া চুলে টান দিল,—এত ক্ষণেব যত্ন একেবারে মাটী হইয়া গেল। হয় ত আর একজন ছেলে কোলে করিয়া যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—মানভঞ্জনের পালা, শ্রীরাধিকা সবে সহস্রছিদ্র পূর্ণকুম্ভ লইয়া জল আনিতে যাইতেছেন,—এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া আব্দার ধরিল,, “আমি বাড়ী যাব।” যাহারা বলে ছেলে হওয়া পাপ, তাহারা অল্প দুঃখে বলে না।

চন্দ্রনাথ হাঁ করিয়া কাঁদিতেছেন, চক্ষের জল গণ্ড বহিয়া মুখে প্রবেশ করিতেছে, চন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বোদনে ক্ষান্ত দিয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া ও ঢোঁক গিলিয়া, সেই জল উদরস্থ করিতেছেন, তাহার পর আর এক পর্দ্দা গলা চড়াইয়া স্থগিত রাগিণী আবার আরম্ভ করিতেছেন। শ্রীমতী মনোমোহিনী গাম্‌ছা লইয়া পা মুছিতেছেন, এবং বৈচিত্র্যসাধনের নিমিত্ত থাকিয়া থাকিয়া কুলকলঙ্ক চন্দ্রনাথকে দুই চারিটা গালি দিতেছেন। এমন সময় গণেশচন্দ্র আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। রোরুদ্যমান বংশতিলক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দুরে, কাঁদ্‌চিস্‌ কেন রে?

এই মধুর নামে অভিহিত হইয়া চন্দ্রনাথ আর একটু জোরে কাঁদিয়া কহিলেন, "মা মেরেচে।"

গণেশচন্দ্র গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, ওকে মেরেচ কেন? ও কি করেচে?"

মনোমোহিনী রাগিয়া কহিলেন, "মেরেচি আমার খুসী। বেশ কোরেচি, মেরেচি।"

আমি সুন্দরীকুলকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। আপিস থেকে তাতিয়া পুড়িয়া স্বামী যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন তাহাকে ঘাঁটান ভাল নয়। আমি কখন এমন কথা বলি না যে, গৃহিণী কর্ত্তাকে ধমক চমক দিবেন না। টাকা দিতে, গহনা দিতে, রেসমের সাড়ী দিতে এক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলে, স্বামীকে মনের সাধ মিটাইয়া মুখনাড়া দাও, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সময় অসময় আছে। ভাড়াটে গাড়ীর আধমরা ঘোড়াটাও সারাদিন খাটিয়া আস্তা বলে আসিলে আর নড়িতে চায় না; কেহ বিরক্ত করিলে লাথি ছুঁড়ে। আপিসে সারাদিন খাটিয়া, হয় ত সাহেবের গালি খাইয়া, যখন বাবু ভালমানুষের মত বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন বড় একটা পীড়াপীড়ি করিও না,—বাগ মানিবে না।

গণেশচন্দ্র ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "ওই টুকু ছেলে না ঠেঙ্গালে বুঝি দিন যায় না? কোথায় আরও দুঃখ হবে, লজ্জা হবে, না খুসী। মেরেচ, বেশ কোরেচ?"

"তার কি হবে? আমি মেরেচি, বেশ কোরেচি।"

"তুমি ওকে মার্‌বার কে?"

"আমি ওকে মার্‌বার কে? তোমার ছেলে, আর আমার কেউ নয়? তোমার ছেলে তুমি নিয়ে থাক, আমায় এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি বাপের বাড়ী চলে যাই।"

মনোমোহিনী শেষ কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল। চোকের পাতায় দু' ফোঁটা জল আসিয়া দাঁড়াইল, তার পর আঁচলে একবার নাকঝাড়া দিলেন। তার পর আস্তে আস্তে সুর উঠিল। "ও মা, তুমি কি এই সব অপমানের কথা শোনাবার জন্যে আমার বিয়ে দিয়েছিলে! ওমা, আমায় গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েচ! ও মা, আঁতুড়ে আমায় একটু নুন খাইয়ে মার্‌লে না কেন?"

গণেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেলেন।

অনেকে হয় ত মনোমোহিনীর উপর, হয় ত গণেশচন্দ্রের উপর, হয় ত দুই জনেরই উপর, রাগ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, সন্ধ্যার সময় আফিস-ফের্‌তা স্বামীর সঙ্গে কখন বচসা হয় নাই, এমন সুন্দরী কয় জন আছেন?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কল্পনানগরে।

নীচে নদী বহিতেছে। উপরে চাঁদ উঠিয়াছে। নদী ক্রূরগামিনী, অনন্ত বীচিমালিনী। চন্দ্রলোকে রজততরঙ্গ, রজতচূর্ণ জলকণা বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কূলে কুসুম ফুটিয়াছে, গুচ্ছ গুচ্ছ, রাশি রাশি, নানাবর্ণ ফুল সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। জলে ফুল হেলিয়া পড়িয়াছে, শ্যামল পল্লব, নবীন মুকুল, বায়ুভরে ঈষৎ দুলিতেছে। তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু কুসুমে কুসুমে, পত্রে পত্রে হীরকবৎ জ্বলিতেছে। স্বচ্ছ, গভীর, নীল জল, জলতলে মীনদল অলসভাবে পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছে। কোথাও নদী অন্তঃসলিলা, উপরে শৈবাল, নীচে স্রোত নিতান্ত মন্দ। নদীসৈকতে চক্রবাক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। বকুল, চম্পক, কামিনী, গন্ধরাজ, চন্দ্রমল্লিকা,—সংখ্যা করা যায় না। ফুল ফুটিতেছে, গন্ধে দিক আমোদ করিতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে। দূরে দৃষ্টি হয় না, উপবনে চারিদিক ঢাকিয়া রাখিয়াছে। লম্বিত শাখায় প্রস্ফুটিত কুসুম কখন জলে ডুবিতেছে, কখন জলসিক্ত মুখ তুলিয়া হাসিতেছে। সকলের উপর জ্যোৎস্নালোক। ফুলে, জলে, বৃক্ষপত্রে, নদীপুলিনে, বৃক্ষ-

পত্র ভেদ করিয়া তরুশাখায়, তরুমূলে, শাখাস্থিত পক্ষীর নীড়ে, নীড়স্থিত ক্ষুদ্র শাবকের অঙ্গে, বৃক্ষতলে, শুষ্কপত্রে, জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। অন্তর্যামীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তুল্য সর্ব্বব্যাপী রন্ধ্রে রন্ধ্রে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিয়াছে। সেই চন্দ্রকরসলিলে সেই শান্ত, মধুর, রম্য স্থান প্রভাসিত হইয়াছে।

নদীর বাঁক ফিরিলে আর এক শোভা। সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, দিগন্তে সমুদ্র দেখা যায়। আকাশের গভীর, স্থির নীলিমা, এবং সমুদ্রের গভীর, তরঙ্গসঙ্কুল, ক্ষুব্ধ নীলিমার মিলন দেখা যায়। দূর হইতে সমুদ্রকল্লোল শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে; দিগন্তরে পাপিয়ার পূর্ণোচ্ছ্বাস আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। স্বরলহরী জ্যোৎস্নারঞ্জিত বায়ুস্তর ভিন্ন করিয়া, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে উত্থিত হইয়া, চন্দ্রকরসাগর মথিত করিয়া, আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—যেন চক্ষে দেখা যায়। নবীন দূর্ব্বাশোভিত ক্ষেত্রে পশুকুল ভ্রমণ করিতেছে, কেহ স্থিরবিস্ফারিত চক্ষে মুখ চাহিয়া আছে। সুবর্ণমণ্ডিত নদীতটে মৃগকুল শয়ন করিয়া আছে, কেহ উঠিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়ায়, কেহ অতি ধীরে গাত্রকণ্ডূয়ন করে। উপবনমধ্যে কোথাও কুসুমরাশির মধ্যে কুসুমসদৃশ রমণীকুল হাত-ধরাধরি করিয়া বসিয়া আছে। কাহারও মুখে কথা শুনা যায় না, কেবল অস্ফুট ভ্রমরগুঞ্জন তুল্য অতি মৃদু শব্দ শ্রুত হইতেছে। কোথাও জ্যোৎস্নাসুষুপ্ত শিশু সুখস্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছে। নদীর উভয় কূলে সৌধশ্রেণী, শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত,

জ্যোৎস্নাবিধৌত। গৃহদ্বার, বাতায়ন, গবাক্ষ সমুদয় মুক্ত, তন্মধ্যে জ্যোৎস্না পতিত হইয়াছে। গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তিনী সুখসুপ্ত রমণীর স্থির মুখমণ্ডলের উপরে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। গৃহদ্বার মুক্ত, দ্বারে প্রহরী নাই। যাহার ইচ্ছা প্রবেশ করে, যাহার ইচ্ছা চলিয়া যায়। কেহ কাহাকেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। প্রাসাদমূলে নদী, প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত রাজপথ, জ্যোৎস্নায় আলোকিত। নদীবক্ষে একটি তরণী ভাসিতেছে, তাহার ভিতরে কেহ নাই। নদীতরঙ্গ তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, নদীস্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। একজন জলে নামিয়া নৌকা ধরিয়া, নৌকার উপরে উঠিয়া বাহিয়া চলিয়া গেল। আবার সে নৌকা ফিরিয়া আসিল, কয়েক জন যুবতী তীর হইতে সেই নৌকায় উঠিল। তাহারা পুষ্পবৃক্ষের কুসুমিত শাখাসমূহ ক্ষেপণীরূপে নিক্ষেপ করিয়া, তরঙ্গ ভেদ করিয়া অদৃশ্য হইল।

এ কোথায় আসিলাম? এ স্বপ্নময় সুখের চিত্র কে চক্ষের সমক্ষে ধরিল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব?

দেখ, তরঙ্গিণীতীরে, জ্যোৎস্নালোকে, উন্নমিতাননে, শুভ্রবসনা রমণী দাঁড়াইয়া আছে। ঊর্দ্ধমুখী বলিয়া মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকটে আসিয়া দেখ,—কে?

লীলা!

চলিয়া আইস, আর দাঁড়াইও না। লীলা স্বপ্ননগর রচনা করিয়া সেই মহানগরে ভ্রমণ করিতেছে, আমরা আর দাঁড়াইব

না। কি জানি, পাছে আমাদের স্পর্শে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, পাছে আমাদের নিশ্বাসে সেই সূক্ষ্ম লতাতন্তু ছিন্ন হইয়া যায়!

লীলার অনন্তদুঃখপূর্ণ জীবনে এই এক সুখ আসিয়াছে। সে সুখ প্রকৃত নয়, কল্পিত মাত্র। তুমি বলিবে, এমন সুখে কাজ কি? আমার উত্তর, আর কোন সুখ আছে কি? সুখের কল্পনা ব্যতীত আর সুখ কোথায়? কিসে সুখ? যেখানে সুখ চাও, যাহাতে সুখ চাও, তাহাতে ত সুখ পাওয়া যায় না। যে যাহা করে, তাহা সুখের আশায়। সুখের আশা না থাকিলে কৃপণে কেন অর্থ সঞ্চয় করে? সঞ্চয় করিয়াই তাহার সুখ। কিন্তু সে সুখ সে পায় কই? কে কবে সুখ পায়? তবে কি সুখ নাই? নহিলে এ বিশ্বব্যাপী সুখের কামনা কেন? সুখের আশা না থাকিলে, কে এ যন্ত্রণাময় মনুষ্যজীবন বহন করিত? কে প্রত্যহ দুঃখের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিত? কে না ভাবে যে, দুঃখ ফুরাইবে, সুখ আসিবে? সুখ, সুখ, সুখ, ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াই সুখ কোথায়? সুখ কোথায় থাকে, কিসে পাওয়া যায়, কেহ ত কখন বলিল না। তবে যে কল্পনায় সুখ পায়, তাহাকে ভ্রান্ত বল কেন?

দেখ, লীলা মুখ ফিরাইতেছে। সে শূন্যময় চক্ষের দৃষ্টি প্রশান্ত, স্থির, জ্যোতির্ম্ময়। পূর্ব্বের সে চক্ষু আর নাই। 'আইস এখানে আর বিলম্ব করিও না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদ।

ছেলে হইবে না হইবে না করিয়া, কিরণের ছেলে হইবার কথা হইল। এই সংবাদ শুনিয়া একটা ভাল দিন দেখিয়া, কিরণকে বাপের বাড়ী লইয়া গেল। প্রথম সন্তান, বাপের বাড়ী হওয়া চাই। লীলা কেতাবপত্র রাখিয়া দিয়া দিনরাত কিরণকে লইয়া ব্যস্ত। বাড়ীতে একটা ভারি ধূম পড়িয়া গেল। ছেলে হইবে, কি মেয়ে হইবে, এই তর্ক লইয়াই একটা ভারি গণ্ডগোল উপস্থিত। বাড়ীর দাসীগুলা একবাক্যে বলিল, "খোকা হবে।" খোকা হইলে তাহারা কিছু পাইবার আশা রাখে, খুকী হইলে আর সে আশাটুকু থাকে না। কিরণের ঠাকুরমা বলিলেন, "ওর নিশ্চয় মেয়ে হবে, তোরা দেখিস্। আমি ওর চোক দেখেই বুঝ্তে পেরেচি।" বাড়ীর মেয়েছেলে, সকলে, একটা না একটা স্থির করে, ছেলে হবে কি মেয়ে হবে। কেহ বাজী রাখে, কেহ দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল ধরায়, অমনি এক জন বলে, "না ভাই, আঙ্গুল ধর্‌লে ঠিক হয় না। আঙ্গুল ধর্‌লে, উল্টা হয়।" এক দিন দুটা ঝিয়ে হুলস্থুল বাঁধাইয়া দিল, মারামারি হয় আর কি! হরি ঝি বলিল, "ছেলে হয় কি মেয়ে হয়, তা ত

বলা যায় না। সে ত আর মানুষের হাত নয়।" অমনি কালো ঝি বলিল, "মেয়ে কেন হতে গেল? মর্ মাগি!" হরি বলিল, "আমার মর্ বল্লি? তুই মর্, আপন-খাগি! আমি কেন মর্‌তে গেলাম? তুই এখনি মর্!" তার পর চুলোচুলি হইবার উপক্রম। মাঝখানে লোক পড়িয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দেয়।

এদিকে কিরণও কিছু বিপদে পড়িল। কিরণের ঠাকুরমা বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। একালের মেয়েরা আর কিছু বাচবিচার করে না, ঠাকুরমা সেকেলে মানুষ, তিনি তাহাতে বড় রাগ করেন। কিরণের অনেক দিন হইতে সাধ ছিল, সে একখানি আভি রংএর কাপড় পরিবে। একখানি কাপড় রং করাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিল, ঠাকুরমার ভয়ে আর পরিতে পারে না। আবার সাধটাও না মিটাইলে নয়। একদিন বৈকাল বেলা কিরণ সেই কাপড়খানি পরিয়া তাড়াতাড়ি ছাদে গেল। ঠাকুরমা ছাদে বড় একটা ওঠেন না, কিন্তু আজ তিনিও সন্ধ্যার সময় ছাদে উঠিলেন। তিনি কেবল কিরণ কোথায় কি অনিয়ম, কি অকর্ম্ম করে, সেই সন্ধানে থাকেন। কিরণের পরণে রং-করা কাপড় দেখিয়া, তিনি যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিলেন। কিরণ ঠাকুরমার বকুনিতে বড় ভয় করিত, কিন্তু নিত্য বকুনি শুনিলে অবশেষে সহিয়া যায়। কিরণ সেই দিন হইতে আর ঠাকুরমার বকুনিতে বড় ভয় করিত না। কোন দিন ইচ্ছা হইল, বড় বড় মল্লিকা ফুল খোঁপার চারিদিকে গুঁজিয়া দিল। ঠাকুরমা

দেখিয়া বলিলেন, "তোদের ত এখন আর কোন বিচার নাই, ম্লেচ্ছ হয়েছিস্। এই ক'টা মাস কি ফুল মাথায় না দিলেই নয়? কটা মাস গন্ধসামগ্রী নহিলে কি চলে না?"

কিরণ কহিল, "কি হবে ঠাকুরমা? ফুল মাথায় দিলে কি হয়?"

ঠাকুরমা। "নেকি আর কি! ভাল মন্দ আছে, কুবাতাস আছে, জানিস্ নি?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "ভূতে পাবে? হ্যাঁ ঠাকুরমা, ভূত কি আছে?"

ঠাকুরমা। "এখনকার লোকে কি আর কিছু মানে? তোরা ভূত মান্‌বি কেন?"

আর এক দিন কিরণ বড় বাড়াবাড়ি করিল। সেদিন সন্ধ্যার সময় চুল এলো করিয়া ছাদের আলিসা গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরমা আসিয়া দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ! কহিলেন, "কিরণ, তুই হলি কি?"

"হলাম আবার কি?"

"হ্যাঁ লা, তুই কি একটা কাণ্ড না করিয়া থাম্‌বি না?"

"কাণ্ড আবার কি? ঠাকুরমা যেন আমায় পাগল পেয়েছেন।"

"পাগল নইলে কি সহজ মানুষে এমন কাজ করে?" এই বলিয়া ঠাকুরমা কিরণের মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। তার

পর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "যা নীচে যা! ভর্ সন্ধ্যা বেলা কি তোর ছাদে বেড়াতে আছে? এমন মেয় ত কোথাও দেখিনি।"

কিরণ ঠোঁট ফুলাইয়া, টিপি টিপি হাসিয়া, নীচে নামিয়া গেল। অন্য দিন হইলে ঠাকুরমা খুব খানিক বকিতেন, আজ যে চুপ করিয়া রহিলেন, এমন নয়, কিন্তু বকুনিটা যেমন প্রকাশ্য হইত, আজ আর তেমন হইল না। আপনাআপনি গজ্ গজ্ করিয়া চুপ করিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চেঁচাইলে কোন উপকার হয় না।

যথাসময়ে কিরণের একটি পুত্রসন্তান হইল। এই ত, ঝি চাকরেরা কাপড়ের জন্য, টাকার জন্য, মহা ধূমধাম লাগাইয়া দিল। নাতি হইয়াছে বলিয়া, কিরণের মার বড় আহ্লাদ হইল। নাতির আটকৌড়ে, ষষ্ঠীপূজায় বেশ ঘটা করিলেন।

ছেলে দু'মাসের হইলে, কিরণ আবার আপনার বাড়ী যাইবে। লীলা সেইটুকু ছেলেকে একরকম দখল করিয়া বসিল। দিবানিশি কোলে করিয়া থাকে, কাঁদিলে ঘুম পাড়ায়, কাজল পরাইয়া দেয়। ছেলের নাম রাখিল,—প্রফুল্ল। কিরণও সেই নাম মঞ্জুর করিল।

কিরণ যখন যায়, তখন লীলা খোকাকে কোলে করিয়া চুমো খাইয়া, কিরণের মার কোলে দিল। কিরণ দেখিল, লীলা চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছে না। তখন সে তাহার হাত

ধরিয়া কহিল, "দিদি, তুমি খোকাকে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে এস।"

লীলা কহিল, "যাব বই কি।"

তার পর কিরণ চলিয়া গেল। কয়েক দিন লীলার বড় একেলা একেলা, বড় শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ছেলের মা।

ছেলে মানুষ করার ভার সমস্তটাই কিরণের উপর পড়িল। সুরেশচন্দ্রের যে আয়, তাহাতে সব মাসে সংসার খরচই কুলায় না, ছোট ছেলের জন্য একটা দাসী রাখিবেন কোথা হইতে? বাড়ীর দাসী কতকটা খোষামোদ, কতকটা দুই চার পয়সার লোভে, কতকটা অনুগ্রহ করিয়া যে টুকু উপকার করে, সেই টুকু কিরণের সুবিধা, নহিলে কিরণ দিবারাত্র ছেলে কোলে করিয়াই থাকে, কিম্বা ঘুম পাড়াইয়া কাছে বসিয়া থাকে। সময়ে নাওয়া হয় না, খাওয়া হয় না, পাছে ছেলের অসুখ করে, এই ভয়ে পৃথিবীর অর্দ্ধেক সামগ্রী খাওয়া হয় না।

ছেলে দুই মাস উত্তীর্ণ হইয়া তিন মাসে পড়িতে না পড়িতেই, কিরণ মা হইবার সাধ মিটাইতে আরম্ভ করিল। ছেলের উপর রাগ, ছেলেকে তিরস্কার, তাহার উপর রাগ করিয়া উপবাস, কিছুই বাকি রহিল না। এক দিন রাগ করিয়া ছেলের গালে একটি ছোট চড় মারিয়াছিল. তার খানিক পরে ছেলে দুধ তুলিয়া ফেলিল দেখিয়া, কাঁদিয়া অস্থির হয়। যে হাতে মারিয়াছিল, সেই হাত মাটীতে আছাড়িয়া হাতে কালশিরা পাড়াইয়াছিল। আমি নিঃসংশয়ে জানি, কিরণ মনে করিত যে, এত ছোট বেলায় কোন ছেলে কখনও এমন সেয়ানা হয় না। মনে কর, যতক্ষণ কিরণ কাছে বসিয়া আছে, ততক্ষণ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে, যেই কিরণ উঠিয়া গেল, অমনি উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিরণ উঠিয়া গিয়াছে, সে কিরূপে বুঝিল? ছেলে কোলে করিয়া কিরণ সুর করিয়া কত কি বলিত, তাহাকে বুঝাইত, তাহাকে ধমক দিত। "খোকা বড় হলে স্কুলে পাঠিয়ে দেব, আর খোকা বছর বছর গাদা গাদা প্রাইজ নিয়ে আস্‌বে, কেমন খোকা? তার পর পাস কোর্‌বে, জলপানি পাবে। তখন বিয়ে দেব, রাঙ্গা বউ আন্‌ব।—আ দুষ্ট, বউয়ের নাম শুনে বুঝি হাস্‌চ! তা বউ এমনি জিনিসটি বটে। বউ পেলে কি আর আমায় মনে থাক্‌বে! তার পর খোকার খুব বড় কাজ হবে, কত টাকা আন্‌বে। কেমন খোকা, টাকা এনে আমায় দিবি ত? তখন আবার টাকা দেবে! বল্‌বে, বুড় মা, টাকা নিয়ে আবার কি কর্‌বে? খেতে দি

এই ঢের। হাঁ্যা খোকা, তুমি দুষ্ট হবে, না শান্ত হবে। ছি! দুষ্ট কি হতে আছে, তুমি লক্ষ্মী ছেলে হবে কেমন?"

কিরণ শুনিয়াছিল, এইরূপ অনেক অনেক কথা ছোট ছেলেদের বলা মাতাদিগের একটা কর্ত্তব্য। কিরণ জানিত যে, এইটুকু চার পাঁচ মাসের ছেলেকে সে সব কথা বলিলে কোন ফল দর্শিবে না, কেন না, সে একটা কথাও বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কিরণের আর বিলম্ব সহিল না। খোকা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে লাগিল।

খোকা বাবুর সঙ্গে কিরণের কথোপকথন সর্ব্বদাই চলিত, আবার দুইজনে নির্জ্জনে থাকিলে, কখন কখন আর এক রকম কথাবার্ত্তা হইত, সে বড় চমৎকার! সে কোন্ দেশের ভাষা, তা আমি জানি না, কোন অভিধানে তার একটাও কথা পাইলাম না। তার অর্থ করা কি টীকা করা, আমার কাজ নয়। সে ভাষা বুঝি স্বর্গে দেবতারা বলে। খোকা যে সে ভাষা বুঝিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেই ভাষায় কথোপকথনকালে সে মাতার মুখ চাহিয়া হাসিত ও মাঝে মাঝে কথার উত্তর দিত। একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিলঃ—

কিরণ। "সো-নানা, মো-নানা, ধো-নানা।"

খোকা বাবু বলিলেন, "ও-আ।"

কিরণ খোকার থুঁতি নাড়া দিয়া কহিল, "কো-লা-লা, পো-লা-লা, ধো-লা-লা।"

খোকা বাবু বলিলেন, "ই-আ।"

কিরণ আবার এই অপূর্ব্ব ভাষায় কথা কহিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দরজার নিকটে অতি মৃদু হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—সুরেশচন্দ্র! সুরেশচন্দ্র প্রীতিপূর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া উভয়কে দেখিতেছেন ও হাস্য সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হাস্যের বেগ একেবারে চাপিতে পারিলেন না। যে টুকু হাসির শব্দ নির্গত হইল, কিরণ সেই টুকু শুনিতে পাইল। কিরণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে জানিয়া, সুরেশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

সুরেশচন্দ্র তাহার পর কিরণকে কত সাধিলেন, বলিলেন, "তোমরা কি বলাবলি করিতেছিলে, একবার বল না, শুনি। আমি তোমাদের ঐ কথা শিখিব। এমন সুন্দর কথা কোথায় শিখিলে?" কিন্তু আর সে কথা কোথা হইতে আসিবে? সুরেশচন্দ্র এমন সুখের সময় ব্যাঘাত দিয়াছিলেন, আবার কি তাঁহার সাক্ষাতে সে কথা বলা হয়?

এ বিষয়ে আমার সঙ্গে খোকা বাবুর সম্পূর্ণ একমত। তিনি সুরেশচন্দ্রের কর্কশ হাস্যে অসন্তুষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কিরণ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। "ও বাবা! ও বাবা! কে মেরেচে? কে মেরেচে?"—"যাও তুমি, তুমি কেবল কাঁদাবার বেলায় আছ। এস ত খোকা, আমরা এখান থেকে চলে যাই। আর এক জায়গায় গিয়ে

আমরা গল্প কোর্ব এখন। সেখানে আর কেউ যেতে পাবে না।" এই বলিয়া স্বামীর প্রতি কুটিল, প্রেমকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, কিরণ খোকাকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল।

কিরণ যে ছেলেকে কত রকম আদর করিত, কত রকম করিয়া সাজাইত, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারি না। ছেলের মুখে সর মাখাইয়া দিয়া যখন তাহাকে কাজল পরাইতে বসিত. সে সময়কার শোভা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। প্রথম প্রথম কিরণ কোনমতেই কাজল পরাইতে পারিত না, ছেলের গালে, নাকে কালি মাখামাখি করিত। ক্রমে কাজল সরু করিয়া পরাইতে শিখিল। এক এক দিন প্রফুল্লচন্দ্র ঘুম ভাঙ্গিয়া, দুই হাতে চোক রগড়াইয়া ভূত সাজিয়া থাকিত, কিরণ তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া, এক চোকে হাসিয়া, এক চোকে কাঁদিয়া, বকিতে বকিতে ভিজা গামছা দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিত। এক এক দিন ছেলেকে সাবান মাখাইয়া, একখানি চিরুণী হাতে করিয়া, ছেলেকে কোলে করিয়া বসিত। তার পর, তার কোমল মাথার কচি কচি কালো কালো চুলগুলি যে কত যত্নে, কত রকম করিয়া আঁচড়াইয়া দিত, তাহা বলা যায় না। কখন সোজা সিঁতে, কখন বাঁকা সিঁতে, কখন দুই দিকে সিঁতে, শেষে সে সব কিছু মনস্থ হইত না। তখন চুলগুলি আঁচড়াইয়া, ছোট কপালখানি ঢাকিয়া নাক পর্য্যন্ত ফেলিত, কখন একগাছি ছোট বিনুণী

বিনাইয়া দিত, কখন সব চুলগুলি কাঁধে ফেলিত। প্রফুল্ল বড় একটা কিছু বলিত না, প্রায় চুপ করিয়াই থাকিত, দৈবাৎ চিরুণীর দাঁত মাথায় ফুটিয়া গেলে কাঁদিয়া উঠিত।

এইরূপে প্রফুল্ল বসিতে শিখিল। তখন কিরণের আহ্লাদ দেখে কে! যখন প্রফুল্ল একটু একটু বসিতে শিখিল, তখন কিরণ তাহাকে আস্তে আস্তে মাটীতে বসাইয়া দিয়া, সম্মুখে বসিয়া হাত ছাড়িয়া দিত। খোকা খানিক টলমল করিয়া, লাল ফেলিয়া হাসিয়া উঠিত, কিরণও হাততালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিত। তার পর, খোকা বাবু শালগ্রাম ঠাকুরের মত গড়াইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, কিরণ তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিত। এই সময়,—আশ্চর্য্য কথা! প্রফুল্লের দুটি খুদে খুদে দাঁত উঠিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা, তোমার দাঁত দেখি," অমনি খোকা বাবু দাঁত, জিব, মাড়ি সব বাহির করিয়া ফেলিতেন। কিরণ তাহাকে নরভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিল, প্রফুল্ল ক্রমে ক্রমে তাহার সে অমৃতময় বাল্যভাষা ভুলিয়া গেল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিত, "খোকা, তোর পেট কোথায়?" খোকা তৎক্ষণাৎ সেই সুপরিচিত অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিত, এবং মুখে বলিত, "এ।"

কিরণ। "মুখ কৈ?"

খোকা মুখ হাঁ করিল। কাজেই এবার মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইল না। বোধ করি, কিরণের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে,

প্রফুল্লের মুখবিবরে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নিহিত আছে। কারণ সে বারবার প্রফুল্লের মুখ দেখিতে চাহিত।

এক দিন একটা রবিবারে কিরণ স্নানাগার করিয়া, বারান্দায় দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতেছিল। প্রফুল্ল বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া একটা ছোট রকম কাঁসার বাটী দখল করিয়া, সেইটাকে উদরস্থ করিবার চেষ্টায় ছিল, এবং গ্রাসের অসুবিধা দেখিয়া, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাটীর চারিদিক আক্রমণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার মুখরাহু এ পর্য্যন্ত বাটী চন্দ্রকে গ্রাস করিতে সক্ষম হয় নাই। সুরেশচন্দ্র তাঁহার ঘরে বসিয়াছিলেন। কিরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রৌদ্রের দিকে চাহিয়াছিল। একটা বিড়াল পাঁচিলে বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছিল, কিরণ তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

এমন সময় প্রফুল্লের হস্তস্থিত বাটী, তাহার মুখনিঃসৃত লালায় মসৃণ হইয়া, তাহার হস্তচ্যুত হইয়া, সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। কিরণ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, প্রফুল্ল মুখে ধূলা কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে, বাটীটা তাহার সম্মুখে গড়াইয়া পড়িয়াছে। কিরণ কহিল, "এমন ছেলে ত কোথাও দেখিনি। যেখানে যা দেখ্‌বে, তাই নেবে। এখনি এই, এর পর পা হলে না জানি কি কর্‌বে!" এই বলিয়া বাটীটা তুলিয়া রাখিয়া গামছা আনিতে গেল।

বাটী বেদখল হয় দেখিয়া, প্রফুল্ল কিছু নারাজ হইল। তাহার

ইচ্ছা কাঁদে। সেই অভিপ্রায়ে ঠোঁট, নাক ফুলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কাঁদা হইল না। একে ত বাটীটা পড়িয়া যাওয়ায় কিছু বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার পর এত ক্ষণ বাটীটা লেহন করিয়াও কোন রস পায় নাই, স্থতরাং সেটা তেমন বিশেষ লোকসান বোধ হইল না। এই জন্য বারকতক ঠোঁট নাক ফুলাইয়া, আবার স্থির হইয়া বসিল।

কিরণ গাম্‌ছা হাতে ফিরিয়া আসিয়া, প্রফুল্লের মুখ হাত মুছাইয়া দিল। তাহার মাথা দেখিয়া বলিল,"মাথা যে বড় নোংরা হয়েচে। আয়, মাথা আঁচ্‌ড়ে দিই।" এই বলিয়া কিরণ চিরুনী আনিয়া, প্রফুল্লকে কোলে লইয়া, তাহার মাথা আঁচড়াইতে বসিল।

এখন, কিরণ চুল এলো করিয়া মাথা শুকাইতেছিল। প্রফুল্লের মাথা আঁচড়াইতে সে চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, কতক প্রফুল্লের মাথার দিকে, কতক তাহার পায়ের দিকে পড়িল। প্রফুল্ল, বাটীর শোধ তুলিবার জন্যই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক্, মায়ের চুল দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, টানিতে লাগিল।

কিরণ চেঁচাইল,"ওরে, চুল ছেড়ে দে! চুল যে ছিঁড়ে ফেল্লে!"

এতক্ষণ প্রফুল্লের চুল টানার প্রতি তেমন মন ছিল না, মাতার চীৎকার শুনিয়া মনে করিল, একটা ভারি কাজ করিতেছি। এই ভাবিয়া সে প্রাণপণে চুল টানিতে লাগিল।

কিরণ আরও জোরে বলিল, "বাবারে! মেরে ফেল্লে! চুল যে ছিঁড়ে যায়! দস্যু ছেলে!"

আপনার ঘরের দরজা গোড়ায় দাঁড়াইয়া সুরেশচন্দ্র হাসিতেছিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া কিরণ কহিল, "আহা, কি রঙ্গই দেখ্‌চেন! আমার মাথাশুদ্ধ ঝন্ ঝন্ কোর্‌চে, আর উনি দাঁড়িয়ে হাস্‌চেন!"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাদের ঝগড়া, তোমরা আপসে মিটমাট্ কর। অমি কিছু জানি না। আমি কি কোর্‌ব? আমি ত আর ওকে তোমার চুল টান্‌তে শিখিয়ে দিইনি।"

কিন্তু প্রফুল্ল মিটামিটিতে মোটেই রাজি নয়। সে তার থাট-থাট, টেপা-টেপা, ফুলো-ফুলো আঙ্গুলগুলি দিয়া, কিরণের চুলের গোছা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া আনন্দে হাসিতেছে, আর একটা করিয়া টান দিতেছে। এ দিকে কিরণের প্রাণ যায়। সে সাধ্যমত টানাটানি করিতেছে, কিন্তু প্রফুল্ল কোন মতেই ছাড়িতে চাহে না।

কিরণ কহিল, "দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখ্‌চ কি? খোকার হাত ছাড়িয়ে দাও না চুলগুলা যে ছিঁড়ে ফেল্লে।"

সুরেশচন্দ্র নিশ্চিন্তভাবে কহিলেন, "কি কোরে ছাড়াব?"

কিরণ। "যেমন করে পার, ছাড়াও না। আমি যে যাই।"

তখন সুরেশচন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে এক জীর্ণ ছবি আনিয়া,

প্রফুল্লের সাক্ষাতে ধরিলেন। কহিলেন, “দেখ্ খোকা, এটা কি ?”

প্রফুল্ল সেই ছবি দেখিয়া, কিরণের চুল ছাড়িয়া দিয়া, ছবি হস্তগত করিল। কিরণের চক্ষে হাসিকান্না দুই আসিয়াছিল। সে মাথায় কাপড় দিয়া, চুল গুছাইয়া বলিল, “ছেলে ত নয়, যেন দস্যু। চুলের গোড়ায় দশ দিন ব্যথা থাক্‌বে। আর উনি, বুড় মিন্সে রঙ্গ দেখ্‌ছিলেন।”

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, তাই ত! রঙ্গ দেখছিলুম্ বই কি! আমি না থাক্‌লে কে তোমার চুল ছাড়িয়ে দিত ?”

ক্রমে প্রফুল্ল হাঁটিতে শিখিল। দিন কয়েক “হাঁটি হাঁটি পা-পা” শিক্ষানবিশির পর, বিনা সাহায্যে উঠিয়া, পড়িয়া, টলিতে টলিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। দিনের মধ্যে এক শ বার আছাড় খায়। কখন মুখটা কাটিয়া যায়, কোন দিন কপাল ফুলিয়া ওঠে। আর কিরণ কেবল বকে। পা হইয়া প্রফুল্ল নানাবিধ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। এক দিন কিরণ রুটীর জন্য হাঁড়ী হইতে ময়দা বাহির করিয়া লইয়া, তাড়াতাড়িতে ঘবে শিকল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, খানিক পরে ভাঁড়ার ঘরে খুট্ খাট্ করিয়া শব্দ শুনিতে পাইল। বিরক্তভাবে কহিল, “আঃ ইঁদুরগুলার জ্বালায় কিছু রাখ্‌বার যো নাই।” আবার ভাবিল, “ইঁদুর নাও হবে বুঝি। দিনের বেলা ইঁদুর ত এত শব্দ করে না। খোকা নয় ত, একবার দেখে আসি।”

হরিবোল হরি! কিরণ যা ভাবিয়াছিল, তাই। আসিয়া দেখিল, প্রফুল্ল হাঁড়ি হইতে দুই চার মুঠা ময়দা লইয়া বদনে দিয়াছে, আরও দুই চার মুঠা গায়ে মাখিয়াছে। দেখিয়া কিরণ কহিল, "ও দশা! আমি তাই ভাব্‌ছিলাম, ভাঁড়ার ঘরে কে খুট্‌ খাট্‌ করে। বলি, এ কি হয়েচে?"

প্রফুল্ল কোন কথা কহিল না। ময়দামাখা ডান হাতখানি পেটের উপর রাখিয়া, বামহাতখানি ঝুলাইয়া দিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝি ভাবিতেছিল, বোবার শত্রু নাই।

কিরণ রাগিল। বলিল, "ও গোচোর? ভিজে বেরালটির মত চুপ করে রইলি যে? এ আমার মুণ্ডু কি কোরেচ?"

প্রফুল্ল আগের মত নিস্পন্দ রহিল। কেবল নাক ও ঠোঁটের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিৎ হইল। তখন কিরণ "হতভাগা ছেলে" বলিয়া, তাহার গাত্র ধৌত করিবার জন্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল।

সেই অবধি কিরণ বলিত যে, প্রফুল্ল আগে যেমন শান্ত ছিল, এখন তেমনি দুরন্ত হইয়াছে। কিরণ আর অনেক ছেলে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ানক দুরন্ত ছেলে, কখনও কোথাও দেখে নাই। আরও বলিত যে, এমন দুরন্ত ছেলে কাহারও বাড়ীতে নাই। অতএব আমি নিবেদন করি, যে বাড়ীর গৃহিণী অথবা বধূ বলিবেন যে, তাঁহার ছেলেপুলের মত দুরন্ত ছেলে

কোন বাড়ীতে নাই, তিনি অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, কিরণ নামে একটি মেয়ের প্রফুল্ল বলিয়া একটি ছেলে, তাঁহার ছেলের চেয়েও দুরন্ত। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ত কিরণকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের সময় বাজ পড়িল।

প্রফুল্ল দেড় বৎসরের হইল। এই সময় কিরণের নির্ম্মল অদৃষ্টাকাশ অন্ধকার হইল। বুঝি তার এত সুখ দেবতার সহিল না।

আমার সুখ হইলে দেবতার কেন চোক ফাটিবে, তা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। কিরণের সুখেও দেবতার তেমন কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দুঃখ উপস্থিত হইলেই, দেবতার ঘাড়ে সে দোষ চাপাইবার পদ্ধতি আছে। আমাদের সুখদুঃখের জন্য কেহ দায়ী নহে বলিলে, কেমন গোলযোগ বোধ হয়। যদি কেহ বলে যে, আমরা যাহাকে দুঃখ সুখ বলি, বিধাতার নিকটে তাহা অলঙ্ঘ্য নিয়মের ফলাফল মাত্র, সুখদুঃখ মানুষের মনোবিকার, তাহাতে বিধাতা কখন হস্তক্ষেপ করেন না, তাহা হইলে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি। যে নিয়মে এই বিশ্বচরাচর

নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা চিরকাল সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে, কদাপি পরিবর্ত্তনীয় নহে। নিয়তির যে চক্র ঘুরিতেছে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না, বিধাতারও সে ক্ষমতা নাই। তোমরা যে অর্থে দয়াময়, করুণাময় প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কর, তাহা ভ্রমাত্মক। এ শব্দ সমুদয় নিরর্থ। তুমি দুঃখে পতিত হইয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছ, "কৃপাময় আমায় কৃপা কর, এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।" এ কথার শ্রোতা কেহ নাই। তুমি যে দেবতার উদ্দেশে ধরালুণ্ঠিত হইতেছ, সে দেবতা বধির, সে দেবতা অন্ধ। তোমার কাতর প্রার্থনা, তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করে না, তোমার দুর্দ্দশা তিনি চক্ষে দেখিতে পান না। তোমার প্রদত্ত পুষ্পচন্দন, ধূপধূনার সৌগন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয় না। তোমায় দয়া করে, মায়া করে, এমন দেবতা কেহ নাই। যে নিয়মের ফল সুখ, সেই নিয়মের অন্যতর ফল, দুঃখ। বিপদের সময় প্রার্থনা করিয়া যদি সম্পদ প্রাপ্ত হও, সেও সেই অনুত্তীর্য্য নিয়মের ফল, দেবতার কৃপা নহে। তোমার সুখদুঃখ বিধায়ক কোন দেবতা নাই। তুমি সুখের সময় দেবতাকে ভুলিয়া থাক, বিপদের সময়ে তাঁহাকে ডাক, তাহাতে কাহারও কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সুখের সময় সুখ আসিবে, দুঃখের সময় দুঃখ আসিবে, কিছুমাত্র বৈপরীত্য ঘটিবে না। তুমি দেবতাকে ডাক, কোন লাভ নাই, না ডাক, কোন ক্ষতি নাই। নিয়তির চক্র বিশ্বব্যাপী, ঘোর ঘর্ঘররবে ঘুরিতেছে। সুখ, দুঃখ,

দুঃখ সুখ, অথবা অনন্ত সুখ, অথবা অনন্ত দুঃখ, চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে। তোমার আর্ত্তস্বর, অথবা আনন্দলহরী সেই অবিশ্রান্ত ঘোর রবে ডুবিয়া যাইবে।

এ সব বড় ভয়ানক কথা। সকলে এই মন্ত্র গ্রহণ করিলে, এই কথার বশবর্ত্তী হইলে, জগতে ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিত, সন্দেহ নাই। যিনি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, তিনি এই জগতের পালক নহেন, এ কেমন কথা? যিনি এই বিশ্বের অধিপতি তিনি দয়াময় না হইলে, ত্রিভুবন রক্ষা করিত কে? অতএব আমরা স্বর্গ নামক অতি বিচিত্র সপ্ততল অট্টালিকা কল্পিত করিব। সেই স্থলে রাজরাজেশ্বরের স্বতঃদীপ্ত অপূর্ব্ব সিংহাসন বিরচিত করিব। সেই সিংহাসনে সম্রাটের সম্রাট, দেবতার দেবতা, দীনপালন, পাষণ্ডদলন, দয়াময় বিরাজ করিবেন। তিনি স্নিগ্ধগম্ভীর-স্বরে জগতে জগতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। তিনি কোন সময় প্রশান্তদর্শন, কখন অতি ভীম রুদ্রমূর্ত্তি। তিনি অগতির গতি, তিনি অনাথশরণ, বিপদভঞ্জন, তিনি সকল ঘটে বিরাজ করেন। তিনি তোমার আমার সকলের দুঃখ মোচন করেন, বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকিব। আইস, সকলে বিল্বচন্দন লইয়া, মনে প্রীতি লইয়া, তাঁহার পূজা করি। তিনি আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন। আর যখন সুখসম্পদ যথেষ্ট থাকিবে, তখন তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবার আবশ্যক নাই। দুঃখের সময় তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি যদি দুঃখ

দূর না করেন ত তাঁহাকে পোড়া দেবতা বলিয়া গালি দিব তাহাতে তিনি রাগ করিতে পারিবেন না।

ইহাতে অনেক সুখ আছে। নিজের জন্য কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না, সমস্তটাই বিধাতার স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকি। স্বদেশের রাজ্যভার আর এক জাতির হাতে, পরলোক দেবতার হাতে, ইহলোক অদৃষ্টের হাতে, ইহাতে নিশ্চিন্ত সুখ আছে। কোন ভাবনা নাই, কেবল এক অন্নের ভাবনা, তাহাও একবেলা জুটিলে দুইবেলার জন্য বড় ভাবনা হয় না।

একদিন আহারাদির পর, কিরণ প্রফুল্লকে কোন অকর্ম্মের জন্য তিরস্কার করিতেছে, এমন সময় কিরণের পিত্রালয় হইতে গাড়ী আসিল। পিত্রালয়ের দাসী আসিয়া কহিল, "দিদিমণি শীঘ্র এস।"

কিরণ দেখিল, দাসী কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছে। কিরণের পা কাঁপিতে লাগিল, সভয়ে কহিল, "কি হয়েচে, ঝি? কাহার কোন ব্যারাম হয় নি ত?"

দাসী কহিল, "আমি কিছু বল্‌তে পার্‌চি নে। তুমি শীঘ্র এস।"

কিরণ গিয়া গাড়ীতে উঠিল। মাতা চলিয়া যায় দেখিয়া, প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। দাসী তাহাকে কোলে করিয়া গাড়ীতে উঠিল। কিরণ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অন্য দিন ছেলেরা গোলমাল করিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়, আজ বাড়ীতে সাড়াশব্দ নাই। দ্বারের সম্মুখে ভৃত্যেরা বসিয়া তামাকু খায়, হাস্য পরিহাস করে, আজ তাহারা সেখানে বসিয়া নাই। কিরণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। পথে আর এক জন দাসী দাঁড়াইযাছিল। কিরণ তাহাকে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, ঝি ?"

দাসী কোন উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দরজার চোকাটে কিরণের পিতামহী দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়, তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে কেন ?"

ঠাকুরমা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। "মা কি তবে নাই ?" এই কথা বলিয়া কিরণের মুখে আর কথা সরিল না। সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

এমন সময় লীলা আসিয়া, কিরণের মুখে হাত দিল, কহিল, "কাঁদিও না। তোমার মার ব্যারাম হইয়াছে। চল, তাঁহাকে দেখিতে যাইবে।"

প্রফুল্ল দাসীর কোল হইতে নামিয়া, মাতার রোদন দেখিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

লীলা প্রফুল্লকে কোলে করিয়া, কিরণের হাত ধরিয়া উঠাইল। কিরণ কলের পুতুলের মত লীলার সঙ্গে গেল। দ্বারদেশে লীলা কহিল, "চোক মুছ। রোগীর কাছে কাঁদিতে নাই।"

অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া, কিরণ ঘরে প্রবেশ করিল। কিরণের মাতা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কিরণ ডাকিল, "মা!"

মাতা মুখ ফিরাইলেন। অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "কিরণ মা এসেচ। কাছে বস।"

কিরণ খাটে বসিয়া, মাতার মস্তক কোলে করিয়া বসিল। লীলা প্রফুল্লকে কোলে লইয়া, এক পাশে বসিল। সকলে চুপ করিয়াছে দেখিয়া, সেও চুপ করিয়াছিল। ঘরের চারিদিকে যে সকল ঔষধের সিসি সজ্জিত ছিল, সে তাহাই দেখিতে লাগিল।

কিছু পরে কিরণের মাতা কহিলেন, "কিরণ, খোকা—প্রফুল্ল কোথায়?"

লীলা প্রফুল্লকে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "এই যে আমার কাছে আছে।"

প্রফুল্লকে দেখিয়া কিরণের মাতা হাত তুলিবার চেষ্টা করিলেন, হাত উঠিল না। ক্ষীণতর স্বরে কহিলেন, "ভাই, তোমায় দুদিন আদর করতে পেলেম না। দিদিমা যে চল্‌ল।"

কিরণের তপ্ত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ বারি মাতার কপোলে গড়াইয়া পড়িল। মাতা কহিলেন, "কিরণ, কেঁদো না মা।"

লীলা দেখিল, কিরণের চক্ষু হইতে জল উথলিয়া পড়িতেছে, আর রাখিতে পারে না। তখন সে কিরণকে গৃহের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কিরণ মাতার মস্তক ধীরে ধীরে বালিশে নামাইয়া ঘরের বাহিরে গেল। লীলা প্রফুল্লকে তাহার কোলে দিল। কিরণ বাহিরে গেলে, লীলা কিরণের মাতার শিয়রের নিকট বসিয়া রহিল।

কিরণ দেখিয়াছিল, তাহার মাতার সুন্দর, শান্ত মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, চক্ষের জ্যোতি মলিন হইয়া গিয়াছে, মুখের বর্ণ নীল হইয়া গিয়াছে। কিরণ প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিয়া, লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চীৎকার করিতে পারিল না, পাছে সে শব্দ মাতার কাণে যায়।

ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, কেহ কিছু করিতে পারিল না। উৎকট রোগ, চিকিৎসকে কিছু নির্ণয় করিতে পারে নাই। কেহ বলিল, মাথার ব্যারাম, কেহ বলিল, বুকের ব্যারাম। সকলে বলিল, "ব্যারাম চিকিৎসার অসাধ্য, রক্ষা নাই।" ব্যারাম এক দিনেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

পীড়ার প্রথম অবস্থা হইতে কিরণের মাতা কোনরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। লীলা তাঁহার কাছে একাক্রমে সমস্ত দিন রাত বসিয়াছিল। কিরণের মাতা তাহাকে কতবার শয়ন করিতে বলিতেন, লীলা কিছুতে উঠিত না। ঔষধ সেবন করান, পাখার বাতাস দেওয়া, গায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, সমস্তই লীলা

করিতে লাগিল। আর যে কেহ রোগের সেবা করিতে অসম্মত এমন নহে। কিরণের পিতামহী, পিসি, বাড়ীর দাসী, সকলে গৃহিণীর শুশ্রূষা করিতে চায়, কিন্তু লীলা কাহাকেও কিছু করিতে দিল না। কিরণের পিতামহী এমন পুত্রবধূ কোথায় পাইবেন? কিরণেরপিসি এমন ভ্রাতৃবধূ কোথায় পাইবেন? দাসীরা এমন কর্ত্রী কোথায় পাইবে? প্রথম দিন, পীড়া তত কঠিন নয় বিবেচনা করিয়া, কিরণের আসিবার কথা উঠে নাই, দ্বিতীয় দিবস কিরণকে লইয়া আসিল।

কিরণের মাতা বরাবর সজ্ঞানে ছিলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া অধিক কথা কহিতে পারেন না, কথা কহিতে ডাক্তারেরও নিষেধ ছিল। ক্রমে পীড়ার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। অবশেষে মৃত্যু-যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। কিরণের মাতা সকলকে ডাকাইলেন, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী নিকটে আসিলে, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে স্বামীর জন্য চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। স্বামী আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। কিরণের মাতা অনেক কষ্টে বলিতে লাগিলেন, “কিরণ, মা, অমন করিয়া কাঁদিও না। আমার মত কয় জন মরিতে পারে? এত বড় সংসার রাখিয়া, তোমাদের সকলের মুখ দেখিয়া মরিতেছি, এ কি অল্প পুণ্যের কথা? গোপাল, অত কেঁদ না। লীলা আমার সন্তানের চেয়ে অধিক।” স্বামীকে বলিলেন, “আরও কাছে আসিয়া দাঁড়াও, আমার মাথায় হাত

দাও, আমি তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরি। দেখো, লীলার যেন কখন কোন কষ্ট না হয়। আমার অর্দ্ধেক গহনা কিরণকে দিও। লীলাকে সর্ব্বস্ব দিলেও তাহার উপকারের শোধ হয় না।” আর বড় কথা কহিতে পারিলেন না। বার দুই বলিলেন, “মা গো! যাই যে আমি!” তার পর আর কোন কথা কহিলেন না।

ক্রমে ক্রমে সব ফুরাইয়া গেল। গৃহলক্ষ্মী গৃহ ছাড়িয়া গেলেন। কিরণ মাটীতে পড়িয়া, ধূলায় লুটালুটি করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, “আমাদের ফেলে কোথায় গেলে মা গো! মা বোলে এখন আর কারে ডাক্‌ব গো!” গৃহমধ্যে হাহাকারধ্বনি উঠিল, কিরণের পিতামহী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, দাসীরা কাঁদিতে লাগিল। লীলা কিরণকে মাটী হইতে তুলিয়া, দুই জনে গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল মাটীতে শুইয়া, মাতার কাপড় ধরিয়া, কাঁদিতে লাগিল। সুখ দুঃখের সে কি জানে? হাসি দেখিলে হাসে, কান্না দেখিলে কাঁদে। লীলা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, “আমারই কপালের দোষ। যার কাছে আমি যাই, তারই একটা না একটা বিপদ ঘটে। আমায় ত যম নেয় না।”

কত ক্ষণ গেল। যাহারা দাহ করিতে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। লীলা ও কিরণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। প্রফুল্ল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু সেইখান

দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কিরণ হৃদয়বিদারক স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "বাবা, মা কোথায় ?"

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

কিরণ, আর কত কাঁদিবে তুমি! যখন তুমি মনের সুখে নিশ্চিন্ত ছিলে, তখন কি সে সুখ দেখিবার কেহ ছিল না ? না থাকিলে, তোমার এ বিপদ কেন ? জান না কি, সুখ কাহারও চক্ষে সহে না, মানুষেরও না, দেবতারও না ? মানুষে মানুষের সুখ দেখিতে পারে না, দেবতায় মানুষের সুখ দেখিতে পারে না! সুখ! সুখের কখন নাম করিও না, অমনি দুঃখ আসিয়া সুখের আসন গ্রহণ করিবে। তোমার অর্থ নাই, মানমর্য্যাদা নাই, তবু তুমি মনে করিতেছিলে, তুমি সুখে আছ। সে সুখ তোমার ক'দিন রহিল, কিরণ ? তোমার যে কোমল মুখখানি, ও মুখের হাসি কাহারও সহিবে কেন ? সুন্দর মুখ কাঁদিলে আরও সুন্দর দেখায়। তাই তোমায় কাঁদিতে হইবে। দেবতা বল, কাল বল, প্রকৃতি বল, সকলে কাঁদাইতে ভালবাসে। তুমি সুন্দরী, তুমি কাঁদ, চন্দ্র তোমার মুখ দেখিয়া হাসিবে। সৌন্দর্য্য যেখানে, কাতরতা সেইখানে, নহিলে তেমন সুন্দর দেখায় না। সুন্দরীর গণ্ডস্থলে অশ্রুবিন্দু কেমন সুন্দর! মৃত শিশুর মুখমণ্ডলে চন্দ্রকিরণ কেমন সুন্দর! মর্ম্মভেদী কাতর বাণীর প্রতিধ্বনি কেমন সুন্দর! দয়া, মায়া, মমতা কে করিবে ? কে কিরণের দুঃখ নিবারণ করিবে ?

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর সান্ত্বনা।

সংসারের মায়াজাল না থাকিলে, এ দুর্ব্বিষহ জীবনযাত্রা আমরা কেমন করিয়া সহিতাম? ভুলিতে না পারিলে শোকতাপ সহিয়া আবার কোন্ মুখে হাসিতে পারিতাম? দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন না থাকিলে, কেমন করিয়া দিন যাইত? যে সন্তানকে বুকে করিয়া মানুষ করিলাম, তাহাকে কয় দিন দেখ্তে পাই? যাহাকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে সমুদয় অন্ধকার দেখি, সে ত চিরদিনের মত চলিয়া যায়। এমন কে আছে যে বলিতে পারে, যম তাহাকে কখন কাঁদায় নাই? দুঃখ যদি ভুলিবার না হইত, তাহা হইলে কি কখন দুঃখ ফুরাইত? কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধ হইলেও ত মানুষের দুঃখ কিছু উপশম হইত না। হৃদয়ের অন্ধকার ত কখন ঘুচিত না, জীবনের দীর্ঘ দিন রাত্রি ত কখন কাটিত না। যে মাতার মুখ দেখিয়া মানবহৃদয়ের অপরিমিত স্নেহ জানিয়াছি, যাহার উৎফুল্ল আনন দেখিয়া হাসিয়াছি, সেই মাতার বিচ্ছেদে এখনও ত তেমনি হাসিতেছি। যে পিতার জানু ধরিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি, এই বিষম সংসারপথে আর ত তাঁহাকে

দেখিতে পাই না। সে ভ্রাতা, সে ভগিনী, সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সকলে কোথায় গেল! আমি কেন বাঁচিয়া আছি? আশা? কিসের আশা? আশার পথ চাহিয়া, আশা আশা করিয়া ত সব গেল, সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। আবার আশা? আমিও একদিন মরিব, সেই আশা? সে দিন ত আসিবেই, আশাও ত সে সময় আমায় প্রতারিত করিতে পারিবে না। যাহারা গিয়াছে, তাহারা ত আর ফিরিবে না। আর কি তাহাদের দেখিতে পাইব? বুঝি সেই আশা আছে, সেই জন্য এখনও বাঁচিয়া আছি।

কিরণ কিছুদিন বাপের বাড়ী রহিল। ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে দেখিত শুনিত; অধিক দিন থাকিলে চলে না, কারণ কিরণের আপনার সংসার হইয়াছে। কিরণ যাইবার সময় লীলাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, লীলা কিছুতে রাজি হইল না। লীলা শুধু আপনার সুখ চাহিলে হয় ত কিরণের সঙ্গে যাইত; কিন্তু লীলার সে স্বভাব নয়। যাহাদের কাছে থাকিয়া সে এত মনের সুখ পাইয়াছে, তাহাদের বিপদের সময় সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে? লীলার তেমন প্রকৃতি নয়। লীলা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিল। কিরণের সঙ্গে গেল না।

যাবার দিন কিরণ আবার কাঁদিল; লীলা কাঁদিল, পিতামহী কাঁদিলেন, ছেলেরা কাঁদিল, দাসীরা কাঁদিল। কিরণের শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় সকলের সেই অনন্ত যাত্রা মনে পড়িল। যে গিয়াছে, সে ত আর ফিরিল না। এত বড় সংসা-

রের এমন লক্ষ্মী গিয়াছেন, তিনি ত আর ফিরিবেন না! দাসীরা কিরণের মাতার গুণ গাহিয়া কাঁদিতে লাগিল, পিতামহী পুত্রবধূর গুণ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ছেলেরা কেবল কাঁদিতে লাগিল। কিরণ লীলার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, নীরবে বুকের ব্যথা মুখে না ফুটিতে পারিয়া, চক্ষের জলে লীলার বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। প্রফুল্ল কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার অঞ্চল টানিতেছিল।

গাড়ীতে উঠিয়া কিরণ চক্ষের জল মুছিল। গাড়ীতে একেলা আসিতে কত রকম ভাবনা মনে আসিতে লাগিল। যে গৃহ ছাড়িয়া, এত দিনের জন্য দুঃখপূর্ণ পিত্রালয়ে বাস করিত, সেই গৃহের ভাবনা মনে উঠিতে লাগিল। স্বামী একা, এতদিন কিরণকে দেখা দেন নাই,—তাঁহাকে দেখিলে তাহার শোক উথলিয়া উঠিত। তিনি একা, কে তাঁহার যত্ন করে, তাঁহার খাবার দাবার কে গোচগাচ করিয়া দেয়? সংসার কে দেখে? ঝি, বাম্‌নী না জানি কতই চাল ডাল চুরি করে! প্রফুল্ল, মায়ের কোল হইতে নামিয়া, পা রাখিবার জায়গায় দাঁড়াইয়া দরজা টানিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, মাতাকে কহিল, “মা কুলে।”

কিরণ কহিল, “ছি,! গাড়ীর দরজা কি খুল্‌তে আছে! রাস্তার লোক দেখ্‌তে পাবে।”

প্রফুল্ল আরও চাপিয়া ধরিল, “কুলে।”

কিরণ সোজা কথায় না পারিয়া বলিল, "গাড়ী খুল্লে তোকে বুড় ধরে নিয়ে যাবে। বাপ্‌রে, পালিয়ে আয়! আয়, আমি কোলে লুকিয়ে রাখি।" এই বলিয়া কিরণ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

প্রফুল্ল ছেলেটি বড় সোজা নয়, এ কথা আগেই বলিয়াছি! বুড়র নামে ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, সে মাতার কোলে না উঠিয়া, হাত পা ছুড়িয়া কহিল, "আমি বুল দেখি। কুলে, ও মা, কু-লে।"

কিরণ তখন প্রফুল্লকে থামাইতে না পারিয়া, গাড়ীর দরজার একটুখানি খুলিয়া দিল। প্রফুল্ল সেইখানে দুটি হাত রাখিয়া, হাতের উপর থুঁতি রাখিয়া, রাস্তার গাড়ী ঘোড়া, মানুষ, রাস্তার ধারের বাড়ী দেখিতে লাগিল। গাড়ীর দোলনে তাহার মাথা কাঁপিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সুরেশচন্দ্র নিজে। তিনি দরজা খুলিয়া, প্রফুল্লকে কোলে করিয়া নামাইলেন। প্রফুল্ল তাঁহাকে দুই মাসের অধিক দেখে নাই। সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাঁদিল না। প্রফুল্লকে কোলে করিতে সুরেশচন্দ্র একবার কিরণের দিকে চাহিলেন। কিরণ তাঁহার মুখের প্রতি অনিমেষ চক্ষে চাহিয়াছিল। চক্ষু মিলিতেই সুরেশচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, কিরণও চক্ষু নত করিল। প্রফুল্লকে কোলে করিয়া, সুরেশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করি-

লেন, কিরণ তাঁহার পিছনে আসিল। সুরেশচন্দ্র সিঁড়ীতে উঠিয়া, গৃহে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রফুল্ল কিছু অস্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া, চারিদিকে চাহিতেছিল। মাতাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, কোলে।" সুরেশচন্দ্রও সেই সময় ফিরিয়া চাহিলেন। আবার দুইজনের চক্ষু মিলিল। এবার সুরেশচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন না, কিরণ চক্ষু অবনত করিল না। স্বামীর মুখ দেখিতে দেখিতে কিরণের চোক ফাটিয়া জল আসিল। দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। চক্ষু মুছিবার জন্য কিরণ আচল তুলিল না।

মাতার চক্ষে জল দেখিয়া, প্রফুল্ল কাঁদিয়া অস্থির হইল। বাড়ীর দাসী শ্যামা, সে আগে হইতে একটা উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। প্রফুল্লের কান্না শুনিয়া, তাড়াতাড়ি সেই ঘরে আসিয়া, তাহার এক হাতে একটা সন্দেশ, আর এক হাতে একটা পুতুল দিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। প্রফুল্লের চক্ষুভরা জল, ভাল দেখিতে পায় না। একবার এ হাতের দিকে চাহিয়া দেখে, আবার ও হাতের দিকে চাহিয়া দেখে। এদিকে কান্নাও একবার ধরিলে, তখনি বন্ধ করা যায় না। প্রফুল্ল একবার দুই হাতের দুই সামগ্রী দেখিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে ডানহাতের সন্দেশটির এক গ্রাস মুখে পুরিয়া দিল, অমনি কান্না থামিয়া গেল। তার পর বাম হাতে পুঁতুলটি ধরিয়া, হাতের উল্টা পিঠ দিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, বাকী

সন্দেশটুকুর প্রতি চাহিয়া দেখিল। তার পর বাম হাতের পুঁতুলটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল! তার পর সন্দেশের আর এক গ্রাস। এইরূপে চুপ করিল।

কিরণ স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না, ধীরে কিরণের হাত ধরিয়া বসাইলেন; এবং আপনি পাশে বসিলেন। কিরণ স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র কিরণের হাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

কি মধুর সান্ত্বনা! এমন সান্ত্বনা করিতে কয় জন জানে? শোকের সময় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনায় কি উপকার? যে শোকার্ত্ত, যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চাও, ত তাহাকে অনর্থক প্রবোধ-বাক্য শুনাইও না। তাহার নিকটে বিনাবাক্যে বসিয়া রহিবে। সে অশ্রুমোচন করিবে, তুমি নীরব রহিবে। এইরূপে দীর্ঘকাল রহিবে। তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রবেশ করিবে। যে কাঁদে, সে পূর্ণ হৃদয় অপূর্ণ দেখিয়া কাঁদে। আমার হৃদয়ে আমার প্রিয়জনের অংশ আছে। প্রিয়জনের মৃত্যু হইলে, আমার হৃদয়ের সেই অংশ শূন্য হয়। সেই জন্য আমি কাঁদি। তোমার সান্ত্বনাবাক্যে সে শূন্য পুরিবে না। যদি তুমি আপন হৃদয় আমার হৃদয়ের মধ্যে ঢালিয়া দিতে পার, তবেই সেই শূন্য পুরিবে, আর পুরিতে পারে, কালের জলসিঞ্চনে। আমি ত কথার কাঙ্গাল নই, কথা শুনিলে আমার শোক অপনীত হইবে

কেন? আমার ক্ষত হৃদয় অক্ষত করিয়া দাও, আমার নিমীলিত হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া দাও, তবেই শোক ভুলিতে পারিব।

সুরেশচন্দ্র তাহাই করিলেন। কিরণ দেখিল, লীলা ব্যতীত এমন সান্ত্বনা কেহ করিতে জানে না। লীলাও এমন সান্ত্বনা করিতে পারে নাই। লীলার অপরাধ কি? তাহার হৃদয়ের কতটুকু অবশিষ্ট ছিল যে, সে অপরের হৃৎশূন্য পূর্ণ করিবে? কিরণের সেই দুঃখের সময় কেমন একটু সুখ হইল। সে মনে করিত যে, স্বামীর হৃদয়ে তাহার জন্য অধিক স্থান নাই, দেখিল, স্বামীর স্নেহ সমুদ্রতুল্য। স্বামীর স্নেহময় মুখ দেখিয়া, কিরণের তপ্ত হৃদয় শীতল হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় সংসার।

পত্নীবিয়োগে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। হইবারই কথা, কেন না, এমন গুণবতী ভার্য্যা অনেকের কপালে মেলে না, তাহাতে কালে পরস্পরের স্নেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল। শোকোপশমের উপায় স্বরূপ বন্ধু বান্ধবেরা পুনরায় দারপরিগ্রহ

করিতে পরামর্শ দিলেন। সংসার লইয়াই বিষয়। এক সংসার গত হইলে আর এক সংসার পাতিয়া পুনর্ব্বার সাংসারিক হইলে ক্ষতি কি? স্ত্রীবিয়োগের তুল্য যন্ত্রণা আর নাই, সে যন্ত্রণা দূর করিবার উপায়ের তুল্য সহজ উপায়ও আর নাই। এক স্ত্রীর অবর্ত্তমানে আর এক স্ত্রী ঘরে লইয়া আইস। দেখিবে, অন্ধকার ঘর কেমন আলো হয়, যেখানে মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বলিত, সেখানে গ্যাসের আলো জ্বলিবে। গোবিন্দপ্রসাদ বাবুকে কয়েক জন লোক বিবাহ করিতে নিষেধও করিলেন। সন্তানাদি বর্ত্তমান, একটি কন্যা বড় হইয়াছে, দ্বিতীয় সংসার করিলে অসুখ বাড়িবে মাত্র। কোন্ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত, সে মীমাংসা আমি করিব না। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু কিছুদিন বিবাহের কথা কাণে তুলিলেন না, তাহার পর বিস্তর আপত্তি করিলেন। কিছুদিন বড় উদাসীনের মত বোধ হইল, বিষয়কর্ম্মে ভাল মন দিতে পারেন না, সংসারে বড় অনাস্থা হইল। তার পর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, বিবাহ না করিলে ছেলেগুলার আরও কষ্ট হইবে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাহাদিগকে মাতার মত যত্ন করিতে পারিবে। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু এই রকম অনেক কথা ভাবিলেন। নিজের জন্য একবারও ভাবিলেন না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তাঁহার কিছুমাত্র রুচি নাই, তবে ছেলে পুলের জন্য একবার ভাবিতে হয়। এদিকে বন্ধু বান্ধবেরাও বড় পীড়াপীড়ি করিতেছে। অগত্যা গোবিন্দ-

প্রসাদ বাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন, কহিলেন, “দূর হোক, আর ভাবিতে পারি না। এত দুঃখের উপর না হয়, আর একটু দুঃখ হইবে।” বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার সময় কেহ বলে না যে, স্বেচ্ছামত অথবা নিজের সুখভোগের জন্য বিবাহ করিতেছি। হয়, উপরোধে পড়িয়া, কিম্বা সন্তানাদির অযত্নের ভয়ে সকলে বিবাহ করে, কিন্তু বিবাহ না করিয়া থাকে কয় জন? দ্বিতীয় সংসার পরিগ্রহের সময় কোনরূপ উৎসবাদিও হয় না, বরঞ্চ অনেকটা শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ করি, সেই কারণে এত লোক প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাস না ফিরিতেই বিবাহ করিয়া ফেলেন,—শোকের আনুষঙ্গিক সকল ব্যাপার এক সময়েই সমাধা হওয়া বিধি।

এমন দেশে এমন আচার কেন না থাকিবে? যেখানে স্ত্রীজাতি সব সুখে বঞ্চিত, সেইখানেই পুরুষ সব সুখ ভোগ করে। যেখানে পঞ্চবর্ষীয়া বিধবা বালিকার বিবাহ মহাপাপ, সেখানে অশীতিবর্ষীয়, গলিতদর্শন, কম্পিতমস্তক বৃদ্ধের স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, আবার প্রপৌত্রীতুল্যা বালিকার সহিত বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত না হইবে কেন? যে দেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে এরূপ ঘোরতর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সে দেশে পুরুষেরা এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ কেন না হইবে?

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু তেমন কিছু বুড়াও হন নাই। সম্মুখের

গুটিকতক চুল পাকিয়াছিল বটে, কিন্তু কলপ দিলে কিছুই বুঝা যায় না। বিশেষ চুলপাকা বয়সের কোন প্রমাণ নয়; আর নীচে পাটীর গুটি দুই দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল। ডাক্তারি শাস্ত্র অক্ষয় হউক!—গোবিন্দপ্রসাদ বাবু যে দাঁত বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও এমন সাধ্য ছিল না যে, আসলে ও নকলে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারে। সুতরাং পাত্রী খুঁজিতে কোন কষ্ট হইল না। সম্বন্ধও যেমন স্থির হইল, অমনি বিবাহও হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ যেমন সংক্ষিপ্তসার, বিবাহের ফলগুলি তেমন সংক্ষেপে গণিয়া উঠিবার যো নাই। মনে কর, বিবাহের বর্ণনা করিবার ত কিছুই নাই। না বাজে বাদ্য, না হয় লোক জন খাওয়াবার ঘটা। বর পাল্কি করিয়া, চুপি চুপি আসে, চুপি চুপি বিবাহ হইয়া যায়। যে গাছ যত বড়, তার বীজ বুঝি তত ছোট।

কিছু না বলিলে তোমরা রাগ করিবে। অন্ততঃ কন্যাটি কেমন, সেটি বলা উচিত। কন্যাটি বড়মানুষের ঘরের নয়, বলা বাহুল্য। যাহার কিছু টাকা আছে, সে সহজে দোজবরে বরের হাতে কন্যা সমর্পণ করিতে চাহে না। কিন্তু, তোমরা বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি জানি, এক জন সমৃদ্ধ লোক, নিজে শিক্ষিত, এবং কন্যাকে শিক্ষা দান করিয়া অবশেষে তাহাকে চল্লিশ বৎসরের এক দোজবরের হাতে সঁপিয়া দিলেন। সে যাহা হউক, এ কন্যাটি গরিবের ঘরের মেয়ে বটে। কন্যার মাতা

বিধবা, একমাত্র কন্যাকে লইয়া, দেবরের গৃহে বাস করেন। কন্যাটি বেশ ডাগর, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত একটাও ভাল সম্বন্ধ হয় নাই। কন্যাটির নাম আনন্দময়ী। মাতা কন্যার বিবাহের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সৎপাত্র পাওয়া যায় না। এমন সময় গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর আপিসের এক জন কর্ম্মচারী সম্বন্ধ করিতে আসিল। এত বড় প্রলোভন কি ছাড়া যায়? তাহাতে আনন্দের খুড়া মহাশয় কহিলেন, "এই বিবাহ দিতে হইবে। আনন্দের পূর্ব্ব জন্মে অনেক পুণ্য ছিল, তাই এমন পাত্র জুটিয়াছে। আমার কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইলে এই দণ্ডে বিবাহ দিতাম।" তাঁহার কন্যা ছোট, সে কথাও সত্য। এ কন্যাটি ভ্রাতুষ্পুত্রী, আপনার কন্যা নয়। এমন কুটুম্বিতাও প্রার্থনীয় বটে। অতএব পিতৃব্য মহাশয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বর দোজবরে, বিবাহের খরচপত্রও অধিক নাই। পিতৃব্য মহাশয় আর ক্ষণবিলম্ব করিতে চান না। বিধবা একটু কাঁদিয়া, মেয়ে সুখে থাকিবে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। সেই সঙ্গে আপনার সুখের কিছু আশা ছিল কি না, সেটা আমি বলিতে পারিলাম না।

আনন্দময়ীর বয়স প্রায় তের বছর হইবে। রং পরিষ্কার, গৌরবর্ণ বলিতেও আমার বিশেষ আপত্তি নাই। মুখ বেশ ধারাল, চোক দুটি বেশ পটলচেরা। গড়ন কিছু বাড়ন্ত, দেখিতে শুনিতে বেশ ডাগর ডোগর। চোকের কোণে মাঝে মাঝে

আগতপ্রায় যৌবনের বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দময়ীকে দেখিতে বেশ, উঠিয়া দাঁড়াইলে সুন্দরীই বলিতে হয়। আর একটি কথা বলিলেই রূপবর্ণনা শেষ হয়। হাসিলে আনন্দময়ীর গালে টোল খায়। তিনি জানিতেন, তাহাতে তাঁহাকে বড় ভাল দেখায় না। এজন্য বড় একটা হাসিতেন না।

এক দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া, গোবিন্দপ্রসাদ বাবু কন্যা দেখিতে আসিলেন। বাবুর পরণে চুলপেড়ে সিমলার ধুতি, গিলা দেওয়া পিরাণ, গলায় কোঁচান চাদর, মাথায় ফুলেল তেলের মিঠা গন্ধ। গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে ঘটক কর্ম্মচারী ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু বৈঠকখানায় বসিলে পর, কন্যার পিতৃব্য মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া কন্যা আনিতে গেলেন। কিছু পরে লজ্জাবনতমুখী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু হেঁট মুখে বসিয়াছিলেন, মলের শব্দ শুনিয়া মাথা তুলিলেন। কন্যা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল। পাত্রীকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নিয়ম আছে, সেরূপ জিজ্ঞাসা করা হইল। কন্যা উঠিয়া যায়, ঘটক পাত্রকে কহিলেন, “মহাশয়, এইবার একবার দেখুন।” এ কথা পাত্র ও কন্যা দুই জনেই শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কন্যাও হঠাৎ একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া ফেলিল। একবার চারি চক্ষে মিলিল। শুভদৃষ্টি সেই সময় হইয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিন্দুবাসিনী।

প্রথম স্ত্রীবিয়োগের মাস কয়েক পরে, গোবিন্দপ্রসাদ বাবু দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। বিবাহে কাহারও নিমন্ত্রণ হয় নাই, আত্মীয়েরা কেহ আসেও নাই। সংবাদ সকলেই পাইয়াছিল, কিরণও শুনিয়াছিল। সে বিবাহের সময় আসিল না। তাহাকে আনিতেই বা যাইবে কে? আর কেহ না আসুক, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী বিনা নিমন্ত্রণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেখিতে আসিলেন। বিন্দুবাসিনী ভাইয়ের নিকটে অনেক আশা রাখেন, এজন্য ভ্রাতৃবধূকে হাতে রাখা চাই। কিরণের মাতাকে সকলে জানিত। তিনি কখনও কাহারও অপকার করিতেন না। বিন্দুবাসিনী সেই সাহসে ভ্রাতার বাড়ীতে আসিয়া এত উৎপাত করিতেন। এখন নূতন গৃহিণী আসিবে, আর সে দিন থাকিবে না। বিন্দুবাসিনী সেই ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ী আসিলেন। আসিয়া একবার একটু কাঁদিলেন,—কাঁদিতে হয় বলিয়া। তার পর দিন নূতন বউ আসিল, সে দিন আবার হাসিলেন, না হাসিলে দাদা আর বউ দু'জনেই দুঃখ করিতে পারে। নববধূকে তুলিয়া আনিবার

জন্য সকলে দরজা গোড়ায় দাঁড়ায়, তখন বিন্দুবাসিনী লীলাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। আর কোথাও তাহাকে না পাইয়া, তাহার ঘরে দেখিতে গেলেন। দোর ভেজান রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিলেন, লীলা বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। বিন্দুবাসিনী তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "ছি! এখন কি কাঁদিতে আছে? এখন উঠে বাহিরে এস। নইলে সবাই মনে কর্‌বে কি?"

লীলা মুখ তুলিল না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "এখন আমি যেতে পার্‌ব না। তুমি যাও। আমি একটু পরে যাব এখন।"

বিন্দুবাসিনী আর কিছু না বলিয়া, দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া, এক জনকে কহিলেন, "দেখ দেখি, অন্যায়টা। ওঁর যেন মা মাসী মরেচে, আমাদের যেন কেউ যায় নি। আবার এই সময় চক্ষের জল। ইচ্ছা করে অমঙ্গল ডেকে আনা বই ত নয়।" এই সময় মাতাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "মা, শাঁকটা কোথায়? এনে দাও ত।"

বিন্দুবাসিনীর আর সে মূর্ত্তি নাই। দাসীরা আর তাঁহার গালি ও মুখনাড়া খায় না, বুড় মাকে আর ভয়ে তত কাঁপিতে হয় না, কিন্তু এখনও দুই চারিটা ধমক চমক সহিতে হয়। ভ্রাতৃবধূ ঘরে আসিলে, বিন্দুবাসিনী তাহাকে প্রাণপণে যত্ন

করিতে লাগিলেন। বউকে নাইয়ে দেওয়া, খাইয়ে দেওয়া, তাহার খোঁপা বাঁধিয়া দেওয়া, সব বিন্দুবাসিনী স্বহস্তে করিতে লাগিলেন। যাহারা বউ দেখিতে আসে, তাহাদিগকে বউ দেখান। কিরণের ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে জড় করিয়া, নববধূকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "দেখ্, এই তোদের মা।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। যেটি ছোট, সেটি কহিল, "মা নেই।"

বিন্দুবাসিনী কহিলেন, "সে কি রে? মা নেই কি? এই যে মা!" এই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া আনন্দময়ীর কোলে বসাইয়া দিলেন। বালক একবার আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, একবার পিসিমার মুখের দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে কোল ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিন্দুবাসিনী কিছু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

লীলা সমস্ত দিন ঘরের বাহির হইল না। বৈকালে বাহির হইয়া একবার নববধূর কাছেগিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া আনন্দময়ী নমস্কার করিতে উদ্যত হইল। বিন্দুবাসিনী নিষেধ করিলেন, কহিলেন, "তুমি কেন নমস্কার করিবে? ও যে সম্পর্কে মেয়ে।"

"লীলা সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তখন আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কে উনি?"

বিন্দুবাসিনী কহিলেন, "কে আর উনি! কেউ নয়, এখানে থাকে, বাপ মা কেউ নেই। এতক্ষণ ঘরে দোর দিয়া কাঁদিতেছিল, তোমাকে দেখিতে আসে নাই। এসে নমস্কারও করিল না।

এ কথাগুলি আনন্দময়ী মনে গাঁথিয়া রাখিল।

বিবাহের পর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আনন্দময়ী যে আট দিন সেখানে ছিল, সে কয় দিন কেবল কাঁদিত। এত বড় মেয়ে কাঁদিবার কোন কথা নয়। ছোট মেয়ে হইলে কাঁদা সম্ভব বটে। আনন্দ কেন কাঁদিত, তা আমি জানি না। যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহাতে আহ্লাদ হইবার কথা। বিবাহের সময় আনন্দ এক গা গহনা পাইয়াছিল, কাপড় চোপড়ও যথেষ্ট পাইয়াছিল। ঘর দোর দেখিয়াও সুখ বই দুঃখ হয় না। তবু সে কেবল কাঁদিত। আট দিন স্বামীর সঙ্গে একটাও কথা কয় নাই। প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রহিল।

আট দিন পরে আনন্দময়ী পিতৃব্যালয়ে ফিরিয়া আসিল। দুই মাস পরে আসিয়া ঘর করিবে। বিন্দুবাসিনী নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

ঘরবসতি ।

আনন্দময়ী পিতৃব্যালয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার মাতা কহিলেন, “আনন্দ, তুই সেখানে অত কাঁদ্‌তিস্ কেন? তোর কি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাঁদ্‌বার বয়স?”

আনন্দ বলিল, “কে জানে মা, বড় মন কেমন করিত, কেবল তোমার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইত। বিয়ে না হ’লে আমি বরাবর তোমার কাছে থাক্‌তাম্।”

মা। “অলক্ষণে কথা বলিস্ নি। মেয়েমানুষের বুঝি চিরকাল আইবুড় থাক্‌তে আছে? সেখানে কি কেউ তোকে অযত্ন কর্‌ত?”

কন্যা। “না না, সে জন্যে নয়। আমি মা সেখানে একলা থাক্‌তে পার্‌ব না। এইবার যখন যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।”

মা। “দূর, অনাছিষ্টি কথা বলিস্ কেন? আমার কি সেখানে যেতে আছে? জামাই বাড়ী গিয়ে থাক্‌লে লোকে নিন্দা করে। আর তোর সতীনের ঘর, ছেলে পুলে আছে, সেখানে কি আমি যেতে পারি? ঠাকুরপোই বা আমায় যেতে দেবেন কেন?”

সে দিন এই পর্য্যন্তই কথা রহিল। আনন্দের মা সেই দিন হইতে কেবলি ভাবিতেন, আনন্দের শ্বশুরবাড়ী তাঁহার গিয়া থাকা উচিত কি না। দেবরের ঘরে যে অবস্থায় থাকিতেন, জামাইবাড়ী কি তাহার অধিক আদর হইবে না? কিন্তু দেবর তাহাতে কিছুতেই সম্মতি দিবেন না। তিনি যে ভাইজকে বড় একটা যত্ন করেন, তা নয়, কিন্তু ভাইজ জামাতার ঘরে থাকিলে তাঁহার বড় অপমানের কথা। আনন্দের মা ভাবিলেন যে, মেয়ের কাছে থাকা যদি পাকা রকম স্থির হয়, তাহা হইলে দেবর রাগিলেই বা! এখনও তিনি ভাইজকে টাকার তোড়া আনিয়া দেননা, তখনও কিছু ফাঁসি দিতে পারিবেন না। এক মুঠা ভাত,—তা মেয়ের কাছে স্থান হইলে সে জন্যেও দেবরের আশ্রয় লইতে হইবে না। শেষ কথা রহিল, মেয়ে তাঁহাকে বরাবর কি চক্ষে দেখিবে। সে বিষয়ে তাঁহার কোন ভাবনা হইল না। মেয়ের যে মার উপর কখন অন্য মন হইবে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তিনি কেবলি এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলেন।

আনন্দময়ীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন নিকটে আসিতে লাগিল। মাতা দিবানিশি কিসে আনন্দ ভাল থাকে, কিসে সুখে থাকে, সেই চেষ্টা করিতেন। শ্বশুরবাড়ী যাবার আগের দিন কন্যাকে একেলা পাইয়া কহিলেন, "আনন্দ, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দু'দিন পরে আমায় ভুলে যাবি ত? বুড় মাকে কি আর তখন মনে থাক্‌বে?"

আনন্দ মার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কহিল, "মা, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও না।"

মা। "ছি মা, ও কথা কি বল্‌তে আছে? তোমার যদি এত কষ্ট হয় ত আমি তোমাকে দেখ্‌তে যাব এখন।"

কন্যা। "হাঁ মা, যেও। তোমাকে দেখ্‌লে তবু আমার সোয়াস্তি হবে।"

মা। "কিন্তু তুই যদি সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করিস্‌, তা হলে আমি যাব না। সেখানে গিয়ে আপনার সংসার যখন আপনি বুঝ্‌বি, তখন আমি যাব।"

কন্যা। "আচ্ছা মা, আমি কাঁদ্‌ব না, তুমি আমাকে দেখ্‌তে যেও।"

মা। "তুই যেন এ কথা এখন কাউকে বলিস্‌ নে। এখানেও কাউকে বলিস্‌ নে, সেখানেও কাউকে বলিস্‌ নে। তোর কাকা এ কথার বাষ্পগন্ধ টের পেলে আমার আর যাওয়া হবে না। আমি যখন যাব, তোকে বলে পাঠাব এখন। ঝি ত মাঝে মাঝে তোকে দেখ্‌তে যাবে। তুইও এক দিন এক দিন ঝি পাঠিয়ে দিস্‌।"

আনন্দ চোক মুছিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সেই দিন বৈকালে শ্বশুরবাড়ী টিপ পরিবার জন্য আনন্দময়ী একটি কৌটায় গুটিকতক কাঁচ পোকা ও সোনা পোকা ধরিয়া

সেগুলির পাখা সংগ্রহ করিল। পোকাগুলির আর কোন অপরাধ নাই, কেবল তাহাদের পাখার ও গায়ের রঙের বড় জাঁকজমক। প্রতিদিন কেবল এই অপরাধে যে কত পোকা, কত প্রজাপতি প্রাণ হারায়, কে তাহা সংখ্যা করিয়া উঠিবে? ইহা দেখিয়াও যে ধনকুবেরদিগের চৈতন্য হয় না, সেটা বড় বিস্ময়ের কথা। যে সুন্দরী প্রাণান্তেও একটি মাছি মারিতে চান না, যিনি একটা পিঁপড়া মাড়াইয়া ফেলিলে অনুতাপে সারা হন, তিনিও বিকাল বেলা কাপড় কাচিয়া, একটি কাঁচপোকার টিপ পরিতে কোন আপত্তি করেন না। ইহাতে তাঁহাদের কোন দোষ নাই। ইহা তাঁহাদের জাতিধর্ম্ম মাত্র। যেমন মাকড়সার জালে অসাবধান মাছি পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই, বালকের চোকের সুমুখে একটি ফড়িং পড়িলে সেটি যেমন সহজে পলাইতে পারে না, চক্‌চকে পোকাগুলিরও সেই দশা হয়,—আর আমাদের এই জরিমোড়া, আংটিপরা, চেন-ঝুলান বড়মানুষেরাও সেই দশা প্রাপ্ত হন। যে জাতি কাঁচপোকার পাখা কাটে, সেই জাতি মানুষ-প্রজাপতিরও পাখা কাটে। আমরা চারিদিকে এই যে সোনা-রূপা-মোড়া মানুষ-পোকা দেখিতে পাই, তাহাদের জন্য বড়ই ভাবনা হয়। কোন দিন দেখিবে, তাহারা মাকড়সার জালে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, কিম্বা কোন রমণীর টিপের কৌটার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

এবার আনন্দময়ী শ্বশুরবাড়ী আসিতেই সকলে বুঝিতে

পারিল যে, আর সে প্যান-পেনে ঘ্যান-ঘেনে বিয়ের কনেটি নাই। সে বেশি দিনের কথা নয়। এরি মধ্যে এত পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল? আমার বোধ হয়, আনন্দের মা কন্যাকে অনেক করিয়া শিখাইয়াছিলেন, এবং কন্যা নিজেও নিতান্ত ছোটটি নয়, সেই জন্য এমন ঘটিয়াছিল। এবার আসিয়া আনন্দময়ী কান্নাকাটি কিছুই করিল না, বেশ স্থির হইয়া রহিল। বিকাল বেলা খোঁপা বাঁধা হইলে আপনি একটি টিপ কাটিয়া পরিল। সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিল। লীলা এবার তাহাকে প্রণাম করিল, লীলার সঙ্গেও দু'একটা কথা কহিল, কিন্তু মনের ভিতর শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর সে কয়টি কথা গাঁথা ছিল।

রাত্রে যখন ঘরে শুইতে গেল, তখন আনন্দের ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছা, স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, কিন্তু বিয়ের পর আট দিন যেরূপ করিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া ভারি লজ্জা হইতে লাগিল। যখন সে ঘরে গেল, তখন ঘরে আর কেহ নাই। আনন্দ মনে করিল, বিছানার এক পাশে শুইয়া থাকি, কিন্তু ঘর বেশ সাজান গোজান দেখিয়া, শোওয়া হইল না। চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নূতন গৃহিণীর জন্য ঘরের নূতন সাজ হইয়াছে। দেয়ালে নক্সা কাটা, চারিধারে ছবি ঝুলান, আলমারির উপর রূপার গোলাবপাশ, আতরদান, ঘরের মেজেতে মাদুরের উপর গালিচা পাতা, শোবার জোড়া খাট, তার দুই পাশে দুইখানি স্প্রিং কাউচ।

ঘরে ঢুকিতে দেরাজের উপর একখানি মাজারি রকম আরসী। কাঁচের একটি ছোট আলমারিতে নানা রকমের পুঁতুল সাজান। কতকগুলা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত পুঁতুল। এ সব আগে ছিল না, নূতন হইয়াছে। আনন্দময়ীর এই সব দেখা শেষ না হইতেই, গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আসিয়া উপস্থিত। আনন্দ ঝুপ্ করিয়া বিছানার এক কোণে বসিয়া পড়িল, কিন্তু শুইল না। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আজ মাথায় বেশি করিয়া কলপ দিয়াছেন, বৈকালে চুপি চুপি বাঁধান দাঁত খুলিয়া স্বহস্তে মাজিয়া লইয়াছেন, কাপড়ে চোপড়ে ভুর্ ভুর্ করিয়া গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি আনন্দের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে কখনও কথা কবে না—না কি ? আমি কি এতই বুড় ?"

আনন্দ ঘোমটা টানিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। এ কথায় আরও হেঁট হইয়া রহিল।

গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা আমার সঙ্গে কথাই যেন না কইলে। আমি যা দেব, তাও কি নেবে না ?" এই বলিয়া পকেট হইতে রূপার শিকলী শুদ্ধ চাবি বাহির করিয়া দেরাজ খুলিতে গেলেন। আনন্দ সেই সময় মাথা তুলিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতে লাগিল,—বুড়া আবার কোন্ খানটা! গোবিন্দ বাবু দেরাজ খুলিয়া একটি বাক্স বাহির করিয়া, আর এক হাতে একটি মোমবাতি জ্বালিয়া লইয়া আনন্দের কাছে আসিলেন, কহিলেন, "দেখ।"

আনন্দ দেখিতে লাগিল। সেই বাক্সের ভিতরে দেশী, বিলাতী গহনা ভরা। জড়োয়া গহনার হীরাগুলা বাতির আলোকে জ্বলিতে লাগিল; বিলাতী গহনাগুলা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। আনন্দ এ সব গহনার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। গহনা দেখিতে ঘোমটা সরিয়া পড়িল, গোবিন্দ বাবু এক দৃষ্টে তাহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে বলিলেন, "এ সব গহনা আমি আর কাহাকেও দেখাই নাই। তোমার জন্য অনেক টাকা দিয়া কিনিয়াছি। আমার সঙ্গে একটি কথা কও, তাহা হইলে তোমাকে সবগুলি দিব।"

আনন্দ এক হাতে ঘোমটার এক কোণ একটুখানি টানিয়া দিয়া কহিল, "আমি কি গহনার লোভে কথা কইব না কি ?"

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু এরূপ উত্তর পাইবার আশা করেন নাই। তিনি কিছু অতিপ্রভের ন্যায় কহিলেন, "না, না, তা কেন ? আমি তামাসা কোরে বল্‌ছিলেম। এখন ত তামাসাও ঠিক হইল। এ গহনার বাক্স তোমারেই রহিল।"

আনন্দ বলিল, "আমি এত গহনা নিয়ে কি কোর্‌ব ? যে গহনা আছে, তাই পর্‌তে পারিনে। তুমি আর কাউকে দাও গে।"

গোবিন্দ বাবু। "তোমার জিনিস তোমার যাকে ইচ্ছা হয় দিও। আমায় কি বড় বুড় বোধ হয় ? আমায় মনে ধর্‌বে ত ?"

আনন্দ। "ও সব কথা বল্‌লে আমি ঘর থেকে বোরিয়ে যাব। বুড় বই কি ? আমি কি কচি খুকি না কি ?"

গোবিন্দ বাবু। "ঈশ্ খুব যে কথা জান, দেখ্‌তে পাই।" বলিয়া আনন্দের থুঁতি ধরিলেন। আনন্দ অমনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া, খাটের উপর উঠিয়া, আর একদিকে গিয়া বসিল। গোবিন্দ বাবু গহনার বাক্স রাখিতে গেলেন। এ দুই জনের যে খুব শীঘ্র মনের মিলন হইল, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ।

এক দিন গোবিন্দ প্রসাদ বাবু আপিস হইতে কিছু সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া, ঘরে কাপড় ছাড়িতে গিয়া আনন্দময়ীকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দময়ী তাঁহাকে দেখিয়া, একটু হাসিয়া, মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "তোমার মুখে যে আর বড় একটা হাসি দেখতে পাইনে। যখন তোমায় দেখ্‌তে গিয়াছিলাম, তখন তোমার মুখে হাসি বড় ভাল লাগিয়াছিল। এখন বুঝি বুড় বরের সাক্ষাতে আর হাস্‌তে ইচ্ছা করে না?"

আনন্দময়ী বলিলেন, "নেও, রঙ্গ রাখ। আমি আবার তখন হেসেছিলাম কখন! হাস্‌লে আমায় ছাই দেখায়, তা' বুঝি আমি জানিনে?"

গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "তোমার বুড় বরের দিব্য, যদি আমি মিথ্যা বলিয়া থাকি। হাসিলে তোমায় সত্যই বড় ভাল দেখায়। কে বলিল, হাসিলে তোমায় ভাল দেখায় না?"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "তোমার যেমন কথা!" এই বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কথাটা তাঁহার মনে লাগিয়া রহিল। হাসিলে কি সত্যই তাঁহাকে ভাল দেখায়? এত দিন তিনি যাহা মনে করিতেন, সে কি ভুল? মেয়েমানুষকে কিসে ভাল দেখায়, তাহা ত পুরুষদেরই জানিবার কথা। পুরুষদের না কি আবার সুন্দর কালো জ্ঞান আছে! ভাল চোকে দেখিলেই সুন্দর, মন্দ চোকে দেখিলেই কালো। কিন্তু আরসীতে একবার ভাল করিয়া না দেখিলে ঠিক জানা যায় না। আনন্দময়ী একখানি ছোট আরসীতে কত বার মুখ দেখিলেন, তাহাতে মন উঠিল না। বৈঠকখানার ঘরে একটা প্রমাণ আরসী ছিল, তাঁহার ইচ্ছা, সেইটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, চুল এলো করিয়া, একবার ঘাড় বাঁকাইয়া, একটু হাসিয়া দেখেন,—তাঁহাকে সুন্দর দেখায় কি না। কিন্তু কর্ত্তা আপিসে না গেলে কেমন করিবা দেখা হয়?

তার পর দিন দুপুর বেলা বৈঠকখানার ঘর খালি পাইয়া, আনন্দময়ী মাথার কাপড় খুলিয়া, চুল এলাইয়া, একটু ঘাড় ফিরাইয়া আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার রূপ দেখিতে লাগিলেন। তুমি যদি সে সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্য সুন্দরী বলিতে। গড়ন পুরন্ত, কিন্তু এখনও খুব পূরা নয়, চোক কালো, তীব্র, চঞ্চল, চুল পিঠে, বুকে, কাঁধে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর সে হাসি হাসি মুখ, কুঞ্চিত-কপোল দেখিয়া, আনন্দময়ীকে সুন্দরী না বলিয়া কে থাকিতে পারিত? তেমন করিয়া আপনাকে আপনি দেখিয়া কে না মোহিত হইত?

গালের যেখানটি টোল খাইয়াছে, সেখানটি গোলাপের কুঁড়ির মাঝখানের পাপড়ির মত,—আ মরি! মরি! আনন্দময়ী এত দিন তাহা দেখেন নাই কেন? বুড়া গোবিন্দপ্রসাদ কি মিথ্যা বলিয়াছিল?

সেই অবধি আনন্দময়ী সদা সর্ব্বদা, সময়ে অসময়ে, অল্প অল্প হাসিতেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মায়ে ঝিয়ে একঠাঁই।

যেমন বউ গিয়াছে, তেমনটি আর হইবে না, কিন্তু সেও যে ছেলের বউ, এও ত তাহারি বউ। এই মনে করিয়া, কিরণের পিতামহী আনন্দময়ীকে যত্ন অপেক্ষা করিতেন। পাছে সে বউর কথা ভাবিতে ভাবিতে এ বউর কিছুমাত্র অনাদর হয়, এই ভয়ে আরও বেশী করিয়া যত্ন করিতেন। সে বউ ঘরের গৃহিণী ছিল, এটি ছেলেমানুষ, এখনও নিজের সংসার নিজে চিনিতে পারে নাই। ঠাকুরমা ছেলে, মেয়ে, জামাই, বউ, সকলকে সমান দেখিতেন। একটু কমবেশী হউক, সে পাঁচটি আঙ্গুলের মত ছোট বড়, কিন্তু পাঁচটি আঙ্গুলের মত সব কয়টিতে ব্যথা সমান। আনন্দ-

ময়ীর খাওয়ার কাছে দাঁড়ান, আপনার সুমুখে গহনা গাঁথিয়ে দেওয়া, এ সব তিনি করিতে লাগিলেন, এবং আনন্দময়ীর অসাক্ষাতে কিরণের ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে ডাকিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইতেন। আনন্দময়ী যাহাতে সংসারের কাজ কর্ম্মে মন দেন, ঠাকুরমার সে ইচ্ছাও ছিল। এ জন্য বউকে এক এক দিন ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল বাহির করিয়া দিতে বলিতেন ও আপনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, পাছে, ছেলেমানুষ, বেশী চাল বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু আনন্দময়ীর সেদিকে মূলেই ছেলেমানুষী ছিল না। এক দিন ভাঁড়ার বাহির করিয়া, পর দিন হইতে প্রত্যহ শাশুড়ীর কাছে চাবি চাহিয়া লইয়া সব ঠিক ঠাক করিয়া বাহির করিয়া দিতেন, বরং ঠাকুরমার চেয়ে আধ কুন্‌কে চাল কম ত বেশী নয়। পান সাজিতে, জায়গা করিতে, জলের গেলাস দিতে, দুধের বাটী চিনিয়া সকলকে দিতে, আনন্দময়ী খুব চট্‌পটে, কিন্তু সে সকল কর্ম্মে বড় গা করিতেন না। সে সকলের ভার পূর্ব্বের মত লীলার উপরেই রহিল। গৃহিণীপনা, সংসারের খরচপত্র, এই সকলের দিকেই আনন্দময়ীর বেশী টান। যে বাসনগুলা সরা হয়, তাহার হিসাব রাখা, অধিক বাসন বাহিরে থাকে ত বাসনের সিন্দুকে তুলিয়া ফেলা, ঝিরা কেমন বাজার করে সেইটা দেখা, এই সকল কাজে আনন্দময়ীর বেশী মন। বাড়ীর ঝি-চাকরে চোক টিপাটিপী হইল, পাচিকা ঠাকুরাণীর সহিত আর এক বাড়ীর ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীর সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হইয়া গেল যে, এবারে

বড় শক্ত বউ হইয়াছে। ইঁহার আমলে চৌধুরী বাড়ীতে লোক টেঁকা ভার হইবে। বাড়ীর লোকে এতখানা মনে করিয়াছে, ঠাকুরমা তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তিনি মনে করিলেন, এ বউটি বেশ সেয়ানা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সংসারে বেশ মন হইয়াছে।

ঝি চাকরদের স্বভাব, তাহারা মুনিবের নিন্দা করে; এ কথা সত্য, আমি স্বীকার করি; কিন্তু তাহারা কিছু বাড়াইয়া বলুক, কিছু সত্যও বলে। যাহার যে কোন দোষ থাকে, সে গুলা চাকরবাকরের চোকে আগে পড়ে। ঠাকুরমার যে বুঝিবার ভুল, তাহা শীঘ্রই জানা গেল। এক দিন আনন্দময়ী ভাঁড়ার করিয়া, যেন অন্যমনস্ক ভাবে চাবিটা আপনার আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরমাও চাবিটা চাহিতে পারিলেন না, মনে করিলেন, কাল ভাঁড়ার বাহির করিবার সময় বউর মনে পড়িবে, সেই সময় আবার আমায় চাবি আপনি দিবে। পর দিন গেল, আনন্দময়ী ভাঁড়ার বাহির করিলেন, ঠাকুরমার চাল ডাল তাঁহার হেঁশেলের দিকে রাখিয়া আসিলেন, কিন্তু চাবিটা তাঁহাকে দিলেন না। বৃদ্ধা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু সেটা ক্ষণিক মাত্র। পরে মনে করিলেন, তা বেশ ত, ওরই ত সংসার, নিজে ভাঁড়ার করিতে যায়, সে ত ভাল। কিন্তু কিরণের মা কোন কালে আপনি ভাঁড়ার করিতেন না, যখন যাহা আবশ্যক হইত, শাশুড়ীর কাছে চাহিয়া লইতেন। ক্রমে আনন্দময়ী সংসারের পুরা গৃহিণী হইয়া

উঠিলেন। ভাঁড়ার বাহির করিবার সময় শাশুড়ীকে প্রায় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন না। ঝিকে অথবা ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীকে সঙ্গে ডাকিয়া আনিয়া জিনিস পত্র বাহির করিয়া দিতেন, তাহার পর ভাঁড়ারে চাবি পড়িত। পূর্ব্বে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু ছেলে পুলের জলখাবারের টাকা মাসে মাসে মাতার হস্তে দিতেন। আনন্দময়ী সে নিয়ম তুলিয়া দিয়া আপনার হাতে জলখাবারের পয়সা লইলেন ও ঠাকুরমাকে নিত্য হিসাব করিয়া গণিয়া দিতেন। ছয় মাসের মধ্যেই এ সব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সংসারে ঠাকুরমার আর কোন হাত নাই, যেমন সকলে খায় দায়, তিনিও সেই রকম দুটি খান দান থাকেন। কেহ কেহ বলিত যে, ঠাকুরমার পক্ষে এ এক প্রকার ভালই হইল। এ বয়সে তাঁহার কাজ কর্ম্ম না করাই ভাল। এ কথা বলিয়া বুঝান কেবল মনকে চোক ঠারা মাত্র। সকলেই জানিত যে, ঠাকুরমা পূর্ব্বের মত সংসারের ভার পাইলেই আরও ভাল থাকেন। ঠাকুরমা মুখে ভাল মন্দ কিছুই বলিতেন না; না রাম, না গঙ্গা, কিছুই না। কিন্তু তাঁহার মনে একটু ব্যথা লাগিয়াছিল। ছেলে পুলেগুলা যখন কোন খাবার সামগ্রীর জন্য তাঁহাকে ধরিত, তখন তিনি নিজের যা দু'পয়সা ছিল, তাহাই দিয়া আনাইয়া দিতেন। ভাঁড়ারও তাঁহার হাতে নাই, খাবারের পয়সাও গণা-গাঁথা, সুতরাং বাজে এক পয়সা খরচ হইলেই নিজে হইতে দিতে হইত। অথচ তাঁহার নিজেরও বেশী কিছু ছিল না, কারণ তিনি বুড়ীদের মত

কৃপণ ছিলেন না, এবং এ পর্য্যন্ত কোন অভাব জানিতে হয় নাই, যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই সেইরূপ হইয়াছে।

লীলার সম্বন্ধে শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর কথা কয়টি আনন্দময়ীর মনে গাঁথা ছিল। সুতরাং লীলার উপর কিছু বেশী আক্রোশ। প্রথম প্রথম লীলার হাতের সাজা পান খাইয়া আনন্দময়ী বলিতেন, 'পানে এমনি চূণ, আমার মুখ তেজে যায়।' লীলা যতই চূণ কম করিয়া দেয়, তিনি ততই বলেন, আমার মুখ চূণে পুড়ে যায়। তার পর, হয় ত এক দিন লীলা তাঁহাকে এক গ্লাস খাবার জল দিয়াছে, আনন্দময়ী অলক্ষিতে তাহাতে একটু ধূলা ফেলিয়া বলিয়া উঠিতেন, 'এমন নোংরা জলও কি মানুষকে খেতে দেয়?' লীলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জল গ্লাস হাতে করিয়া বলিত, 'কেন আমি ত জল দেখে দিয়েচি। জলে এ কি পড়েচে?' তার পর আনন্দের মুখ চাহিয়া চুপ করিত। কিন্তু এ সব আর কাহারও কাছে বড় একটা প্রকাশ পাইত না। আনন্দও কাহাকে দেখাইয়া শুনাইয়া এরূপ করিতেন না। এ গুলা অন্তর-টিপ্‌নী, অতএব যাহাকে সে গুলা দেওয়া যায়, শুধু তাহারই টের পাওয়া ভাল। দিনকতক পরে এ রকম ঢিল পাট্‌কেল ছুঁড়িয়া আনন্দময়ীর আর মন উঠিল না, থান ইটের সন্ধান দেখিতে লাগিলেন। তিনি একদিন কিরণের অষ্টমবর্ষীয়া একটি ছোট ভগিনীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে চুপি চুপি আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে তাহার সহিত একটা পরামর্শ

হইল, অবশেষে তাহার হাতে একটা সিকি দিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। খানিক পরে, আনন্দময়ী শাশুড়ীর কাছে বসিয়া আছেন, সেখানে জন দুই ঝিও গল্প করিতেছে, এমন সময় কিরণের সেই ভগিনীটি আসিয়া আনন্দময়ীর পিঠে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিল। এক জন ঝি তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিল, ঠাকুরমা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বউকে মার্‌লি কেন লা?"

মেয়েটির নাম ভুবনমোহিনী। সে হাসিয়া বলিল, "আমায় যে রাঙা দিদি শিখিয়ে দিলে।" রাঙা দিদি, লীলা।

ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া তাহার হাত ধরিলেন, কহিলেন, "কি বল্‌লি, আবার বল ত? এখন থেকেই মিথ্যা কথা! লীলা তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে? রসো, গোপালকে ডেকে তোমায় মার খাওয়াই।"

আনন্দময়ী এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন। এই কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তা ওর দোষ কি ঠাকুরুণ। ওকে মার খাওয়ালে কি হবে? ও ছেলেমানুষ, ওকে যা শিখিয়ে দেবে, তাই করবে। আমি যেন এ বাড়ীর শত্রু এসেছি। আমায় তাড়িয়ে দিলেই ত পাপ যায়।" এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে আরও বেগে জল বহিতে লাগিল।

যতক্ষণ এই সব হইতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে লীলা সেই খানে আসিল। সে দেখিয়া শুনিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুরমা আসিয়া কহিলেন, "আমি ভুবনের কথা বিশ্বাস করি নি। ওর মিথ্যা কথা।"

আনন্দময়ী সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভুবন আর এক দিকে পলাইয়া গেল।

সেই রাত্রে ঠাকুরমা ভুবনকে ডাকিয়া অনেক প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কিছু শক্ত মেয়ে, সহজে ভুলিল না। ঠাকুরমা বলিলেন, "তোকে চার্‌টে পয়সা দেব, সত্য করে বল, তোকে কে শিখিয়ে দিয়েছিল।"

ভুবন ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি বুঝি মিথ্যা বলেচি? আমি তোমার চার্‌টে পয়সা চাইনে।"

ঠাকুরমা উঠিলেন, "আট টা?"

ভুবন ঘাড় নাড়িল।

ঠাকুরমা আবার উঠিলেন, "একটা সিকি?"

ভুবন এবারে ঘাড় নাড়িতে পারিল না, কিন্তু লোভ সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হটাৎ ঠাকুরমার একটা নূতন বুদ্ধি হইল। বলিলেন, "দেখ, ভুবন, আমার সিন্দুকের ভিতর সেই যে বৃন্দাবনের ছোট পিতলের হাতা দেখেছিস্, সত্য কথা বল্‌লে সেইটা তোকে দেব।"

ঠাকুরমা বড় ভারি টোপ ফেলিয়াছিলেন। ভুবনের বরাবর সাধ, সেই হাতাটা খেলা ঘরে লইয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরমা কিছুতেই দিতেন না, তীর্থস্থান হইতে আনিয়াছিলেন বলিয়া, ছেলেপুলেকে

দিতে চাহিতেন না। ভুবন আর থাকিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "হাতাটা দেবে ঠাকুরমা ?"

ঠাকুরমা। "সত্য সত্য দেব।"

তখন ভুবন চুপি চুপি বলিল, "ঐ যে নূতন মা এসেছে, সেই শিখিয়ে দিয়েছিল।"

পর দিবস হাতাটা ভুবনের খেলাঘরে ঘট্ ঘট্ করিতে লাগিল। আসল কথাটা ঠাকুরমা জানিলেন বটে, কিন্তু ঝি চাকরে জানিল না, জানিতে চাহিলও না। আনন্দময়ীর ইচ্ছা পুরিল। ইঁটখানা এগার ইঞ্চি না হউক, নয় ইঞ্চি হইবেই। আর যাহাকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দময়ী সে ইঁট ছুড়িয়াছিলেন, সেই আঘাতে তাহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল।

কেন ? লীলার কি পূর্ব্বে আর কোন দুঃখ হয় নাই যে, এইটুকুতে তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল ? সে জন্য নয়। বিধবা হইবার পর, লীলা স্থির করিয়াছিল যে, ইহজন্মে তাহার অদৃষ্টে আর সুখশান্তি হইবে না। এখানে আসিয়া সুখ না হউক, শান্তি লাভের অনেকটা উপায় হইয়াছিল। সে শান্তিস্বপ্ন যে এমন করিয়া ভাঙ্গিবে, লীলা তাহা কখন মনে করে নাই। আর এ যন্ত্রণা,—ইহার চেয়ে শ্বশুরবাড়ীর সে লাঞ্ছনা ছিল ভাল। একদিন আনন্দময়ীকে একেলা পাইয়া, লীলা অতি বিনীতভাবে কহিল, "আমি থাকিতে যদি তোমার বিরক্ত বোধ হয়, তা' হইলে পরিষ্কার ক'রে কেন বল না, আমি আর কোথাও যাই।"

আনন্দময়ী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সে কি ? তুমি আমার কি কোরেচ যে, আমি তোমার শত্রু হইলাম ? তোমরা আমায় দেখিতে পার না, তা’ আমি ত এ বাড়ীতে সাধ কোরে আসিনি। আমায় নিয়ে এসেচে, তাই এসেচি।” এই বলিয়া তিনি চোকে আঁচল রগড়াইতে রগড়াইতে চলিয়া গেলেন।

বাস্তবিক তাঁহার একটুও ইচ্ছা ছিল না যে, লীলা আর কোথাও যায়। তাহা হইলে ত সে হাতছাড়া হয়। লীলার মুখখানি বড় সুন্দর, আনন্দময়ীর অত সুন্দর মুখ ভাল লাগে নাই। তার উপর বিন্দুবাসিনীর সেই কয়টি কথা। অত সুন্দর মুখ! সে মুখ আনন্দময়ীর হইল না কেন ? বিধবা লীলা সে মুখ লইয়া কি করিবে ? আনন্দময়ী মনে মনে বলিতেন, পোড়ারমুখীর মুখ কি কখন পুড়িবে না ?

এই রকম একটা কথা লীলাও একদিন কিরণের সাক্ষাতে বলিয়াছিল, ‘এ পোড়া মুখ পুড়লে বাঁচি।’ সে কথাটা বুঝি দেবতার মনে ছিল। লীলা কাহাকেও কিছু বলিল না, আর কোথাও যাইতে চাহিল না, সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, সে বাড়ী হইতে তাহাকে কেহ তাড়াইয়া না দিলে, সে স্বেচ্ছামতে কখন যাইবে না। লীলা রহিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিত। দুঃখের ভাবে তাহার জীবন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। চোকের কোল ভাঙ্গিয়া গেল। রগে, গালে, নীল নীল, সরু সরু শিরা উঠিল, গায়ের রং পাঙ্গাশবর্ণ হইতে লাগিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া

আনন্দময়ীর আহ্লাদ হইল। সময় সময় লীলার বুকে কেমন একটা ব্যথা ধরিত, কিন্তু সে কথা কেহ জানিল না। ঠাকুরমা লীলাকে কত জিজ্ঞাসা করিতেন, কতবার ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে চাহিতেন, লীলা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিত, বলিত, —আমার ত কোন অসুখ হয় নি, একটু কাহিল হয়েচি, সে আবার দু'দিন পরে সেরে যাবে এখন।

আনন্দময়ী আট মাস শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। বাপের বাড়ীর, সত্য বলিলে কাকার বাড়ীর ঝি, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে আসে। বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার বড় একটা কথা ওঠে নাই। এক দিন বৈকালে বাপের বাড়ীর ঝি আনন্দময়ীকে চুপি চুপি গোটাকত কি কথা বলিয়া গেল। সে রাত্রে আনন্দময়ী শয়নঘরে কিছু আগে হইতে গিয়া শুইয়া রহিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু যথাসময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আনন্দময়ী উপুড় হইয়া মুখ লুকাইয়া শুইয়া আছেন। কর্ত্তা তাঁহার নিকটে গিয়া, গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমিয়েচ না কি?"

কোন উত্তর নাই। কিন্তু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, আর নাক মোছার যেন একটা শব্দ হইল।

এবারে কর্ত্তা গা নাড়া দিলেন, "কি হয়েছে? স্বপ্ন দেখছ না কি?"

কোন কথা নাই। এবারে আর এক রকম একটা শব্দ হইল। ফোঁপানি? কান্না? তাই ত!

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আকুল হইলেন। তাড়াতাড়ি স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিলেন।

আনন্দময়ী সেখানে কেন শুইয়াছিলেন, তা আমি জানি না, কিন্তু সেটা তাঁর শুইবার জায়গা নয়। বোধ হয়, দুঃখে অস্থির হইয়া যেখানে পাইয়াছিলেন, সেই খানেই শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু মুখ তুলিয়া ধরিতে সেজের আলো ঠিক আনন্দময়ীর মুখের উপর পড়িল। সে মুখখানি চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

সে চক্ষে জল? গোবিন্দপ্রসাদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

কোন কথা নাই, কেবল আনন্দময়ীর চোক আস্তে আস্তে উঠিয়া গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর মুখে পড়িল। সে দৃষ্টিতে তিনি আরও আকুল হইলেন। সবোষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কিছু বলিয়াছে?"

এবারে উত্তর আসিল। "কেউ না।"

"তবে কি হয়েছে?"

"আমার মার জন্য মন কেমন কর্‌চে।"

তখন বাবু হাঁপ ছাড়েন। "আঃ, এই জন্য এত?"

আনন্দময়ীর চক্ষে ঢেউ উঠিল। "এই জন্য? তবে বুঝি মা আমার কেউ নয়?"

"না, না তা কেন? আমি কি সে কথা বল্‌লাম? মার

জন্য মন কেমন কর্‌চে, সে জন্য কান্না কেন ? তিনি ত দূরদেশে নাই।”

আনন্দময়ী চোক মুছিয়া ফেলিলেন, কিছু বেগের সহিত বলিলেন,“তাই তাঁকে আট মাস দেখিনি।”

কর্ত্তা কিছু লজ্জিত হইলেন, কহিলেন, “তা আমি ত তোমায় যেতে বারণ করি নি। ইচ্ছা হয়, মাঝে মাঝে দু’ এক দিন গিয়ে থাক্‌লেই হয়।”

আনন্দময়ী একেবারে উঠিয়া বসিলেন। “কি বল্‌লে ? দু’ দিন ? তা’ হলে’ কাকা কি মনে কর্‌বেন ? আমি কাল গিয়ে দু’ মাস থাক্‌ব। দু’ মাস কেন, তিন মাস থাক্‌ব।”

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কিছু কাতরভাবে কহিলেন, “তিন মাস ? তাই ত! আর আমি একলাটি কি কোরে থাক্‌ব ?”

আনন্দময়ী স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া, তাঁহার জামার হাতা ধরিয়া, অত্যন্ত কোমল স্বরে কহিলেন, “দেখ, আর একটা উপায় আছে।”

কর্ত্তা গলিয়া গিয়া কহিলেন, “কি ?”

আনন্দময়ী অতি কোমল কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, “যদি মাকে মাঝে মাঝে এখানে আনা যায়। তা’ হ’লে আর আমায় যেতে হয় না।”

কর্ত্তা আহ্লাদে বলিলেন, “সেই ত বেশ। তিনি মাঝে মাঝে এলেই ত হয়।”

গৃহিণী বলিলেন, “এলে ত! মা যে আসেন, এমন ত আমার বোধ হয় না।”

“তাতে দোষ কি? তিনি ত এখানে এসে বরাবর থাক্‌বেন না।”

পর দিবস আনন্দময়ী অনেক করিয়া মাকে বলিয়া পাঠাইলেন। মা আসিলেন, কিন্তু সেই দিনই ফিরিয়া যাইতে চান। আনন্দময়ী কান্না জুড়িলেন, হয় মা থাকুন, না হয় তিনি মার সঙ্গে যাইবেন। কাজেই মা থাকিলেন। পর দিবসও সেইরূপ গেল। তাহার পর দিবস কান্নাকাটি কিছু হইল না, আনন্দময়ীর মাও যাবার কথা তুলিলেন না।

ঝি চাকরেরা প্রথম দিনই বলিয়াছিল যে, বউ ঠাক্‌রুণের মা এখানে বেড়াতে আসেন নি, থাক্‌বার জন্যই আসিয়াছেন। কথাটা তাহারা আপনা আপনির মধ্যে বলিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরমারও সেইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল।

এক দিন গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মা কি এখানে কিছু দিন থাক্‌বেন?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “থাক্‌তে নেই?তা না হয় কাল যাবেন।”

“তুমি সব কথা উল্টা বুঝ। আমি কথার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি থাকেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা।”

আনন্দময়ী নরম হইয়া বলিলেন, “তিনি থাক্‌লে আমি ভাল থাকি, তাই দু’দিন রয়েছেন।”

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল নিমন্ত্রণে।

কিরণ প্রফুল্লের মাথা চাপড়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতেছিল, ও অতি মৃদু স্বরে সেই অতি প্রাচীন ঘুম পাড়াইবার গান গাহিতেছিল :—

"খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।"

ঘুম পাড়াইবার যে একটী নূতন গান বাঁধিব, আমার সে টুকুও অধিকার নাই, কারণ আমাকে সব সত্য কথা বলিতে হইতেছে। মান্ধাতার আমলের এ রকম একটা পচা পুরাণো গানকে বোধ হয় কেতাবের মধ্যে স্থান দেওয়াই উচিত নয়, কিন্তু এই গানে যা মনে পড়ে, তা আর কিছুতে না। সেই পদ্মফুলের মত মার ঘুমমাখান হাতখানি, আর সেই স্বর্গ হইতে এ জগতে প্রবাহিত গীতের ন্যায় অস্ফুট, অমৃতময় কণ্ঠ, আর সেই অর্দ্ধ মুদ্রিতচক্ষু শিশুর মুখ, আর কিছুতে মনে পড়ে না। মাথার উপরে সেই সুকোমল হাতখানি, আর মুখের উপর জননীর সেই নত চক্ষু, আর নিদ্রা-সমুদ্রের তরঙ্গতুল্য সেই মধুর গান মনে পড়িলে, এখনও ঘুমে চোক ভরিয়া আসে। এ চোকে কি আর তেমন ঘুম আসিবে ?

দুপুর বেলা প্রফুল্লকে এরকম করিয়া ঘুম পাড়াইবার একটা কারণ ছিল। মনোমোহিনী কিরণকে অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিরণ মাতৃবিয়োগের পর কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইত না। অনেক দিনের পর মনোমোহিনী নিজের বাপের বাড়ী গিয়া কিরণকে ভারি পীড়াপীড়ি করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল, তিনি একবার কিরণকে তাঁহার বাপের বাড়ী দেখান। কিরণ এবারে আর এড়াইতে পারিল না। এবারে না গেলে ভাল দেখায় না। এই জন্য কিরণ প্রফুল্লকে ঘুম পাড়াইতেছিল। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া নিমন্ত্রণে যাইবার উদ্যোগ করিবে। প্রফুল্ল ঘুমাইলে কিরণ কাপড় চোপড় বাহির করিল, হাতে মুখে সাবান মাখিল। এত বড় ধনীর বাড়ী একটু সাজিয়া গুজিয়া না গেলে তাহারা মনে করিবে কি! একখানা যে ভাল বারাণসী কাপড় ছিল, সেই খানা বাহির করিয়া রাখিল, আর গহনাপত্রও গোচগাচ করিয়া রাখিল। এই সব করিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক গেল। তার পর, প্রফুল্লের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া, তাহার অঙ্গ সংস্কার করিতে লাগিল। গামছা দেখিলেই প্রফুল্ল রাস্তায় পালায়, সুতরাং কিছু কান্নাকাটী করিল। গা মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে একটা খুব রঙ্‌চঙে পোষাক পরাইয়া দিয়া, কিরণ প্রফুল্লের এক জোড়া চক্‌চকে, রাঙ্গা রেশমের ফিতা দেওয়া জুতা বাহির করিল। জুতা জোড়া নূতন। প্রফুল্ল সেটাকে পায় না দিয়া বুকে করিতে চায়। অনেকক্ষণ ঝোলা-

ঝুলির পর, কিরণ তাহাকে জুতা পরাইয়া দিলে, প্রফুল্ল তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইল। এমন সময় গড় গড় করিয়া, একটা গাড়ী আসিয়া দরজাগোড়ায় থামিল। একটু পরেই, বড় মানুষের বাড়ীর ঝি ফর্‌সা কাপড় পরিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিল! কিরণকে দেখিয়া কহিল, "এখনও হয় নি! সে কি গা? এখনও আমাকে কত বাড়ী যেতে হবে।"

কিরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "একটু বস, ঝি, আমার এই হ'ল বলে। খোকার হয়েচে।"

ঝি পাথরের মত ভারি হইয়া কহিল, "আমাদের কি বস্‌বার সময় আছে? বড় মানুষের বাড়ী চাক্‌রী করা সোজা নয়।"

কিরণ কহিল, "আমি এই কাপড় পরে আস্‌চি, তুমি এইখানে একটু বস।"

ঝি মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল, "আমি আর বস্‌ব না, যাই, গাড়ী দাঁড়াতে বলি; তুমি একটু শীগ্‌গির নাও।"

কিরণ কাপড় পরিতে গেল। ঝি মাগী একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ওগো, গাড়ী দাঁড়ায় না, নতুন ঘোড়া। তোমার হয়েচে?"

তখন কিরণ একটু বিরক্ত হইয়া, ঘরের দোর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "গাড়ী না দাঁড়ায় ত আর এক জায়গায় যাও। আমাকে এর পরে নিতে এস।"

সাপটা যেন অমনি কেঁচো হইয়া গেল। মনোমোহিনী

ঝিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন কিরণকে সকলের আগে আনা হয়। কিরণের কথায় ঝি নরম হইয়া কহিল, "ঘোড়াটা নতুন, সহিস বল্‌ছিল যে, সেটা অনেকক্ষণ দাঁড়ালে ক্ষেপে, তাই বল্‌ছিলাম। তা নইলে আমাদের দাঁড়াতে কি দিদি ঠাক্‌রুণ? আমরা হলাম তোমাদের দাসী।"

এই বলিয়া সে বসিল। মাগী এতক্ষণ কিরণকে একবারও 'দিদি ঠাক্‌রুণ' বলে নাই।

প্রফুল্ল আগে হইতে গিয়া গাড়ীর ভিতরে বসিয়াছিল ও মাঝে মাঝে চেঁচাইতেছিল, "হ্যাট্‌ ঘোড়া হ্যাট্‌! হাইও!" কিরণ আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিল, তখন সে কোন মতেই দরজা বন্ধ করিতে দিবে না, অবশেষে কিরণ দরজা একটুখানি খুলিয়া দিল, প্রফুল্ল সেইখান দিয়া মুখ বাড়াইয়া রহিল। পথে একটা দোকানে অনেক রকম খেলনা বিক্রী হইতেছিল, তাহার মধ্যে ঠিক সম্মুখে একটা মাটীর গাড়ী ছিল। প্রফুল্ল সেইটাকে দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া অস্থির হইল,—"আমি ওই গাগী নেব।" কিরণ কি করে, ঝিকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া সেই গাড়ীটা কিনিয়া আনাইল। প্রফুল্ল সেটাকে পাইয়া মহা আহ্লাদে গাড়ীর ভিতরে গড়াইতে আরম্ভ করিল।

গাড়ী সদর দরজায় থামিল। দরজার সম্মুখে দরওয়ানেরা দাঁড়াইয়া আছে। দরজার ভিতর লোক জন গিস্‌ গিস্‌ করিতেছে। কিরণ এক গলা ঘোমটা টানিয়া গাড়ী হইতে নামিল।

কিরণের ঝি প্রফুল্লকে কোলে করিয়া পিছনে চলিল, বড় বাড়ীর ঝি সকলের আগে ছিল। কিরণকে একেবারে দোতালায় লইয়া গেল। সিঁড়ির উপর মনোমোহিনী দাঁড়াইয়াছিলেন; কিরণকে দেখিয়া, একটু হাসিয়া তাহার হাত ধরিলেন। কিরণ একবার একটুখানি, ঈষৎ একটুখানি হাসিয়া, আপনার পায়ের নখ দেখিতে লাগিল। তাহার চোক ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। মনোমোহনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ, ভাই?"

কিরণ মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাল আছি।"

মনোমোহিনী সে মুখ দেখিলেন। সে গোল-গোল হাসি-হাসি মুখখানি আর তত গোলগাল নাই। সে হাসি আর তত হাল্কা নাই। মনোমোহিনীর হাজার কেন দোষ থাকুক না, স্ত্রীলোক ত বটে। তিনি আবার কিরণের হাত ধরিলেন, বলিলেন, "ছি! শোক দুঃখ কি চিরকাল মনে করে রাখ্‌তে হয়?"

এবার কিরণের চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। অতি মৃদু, জড়িত স্বরে বলিল, "এমন শোক কি সহজে ভোলা যায়?"

মনোমোহিনী আর কিছু না বলিয়া, কিরণের হাত ধরিয়া তাহাকে ঘর দোর দেখাইতে লাগিলেন। বৈঠকখানায় একটা মস্ত ঘড়ী, সেটার উপর একটা ধাতুনির্ম্মিত মানুষের আকৃতি আছে। সেটা প্রতি মিনিটে মুখ বন্ধ করে ও অপর মিনিটে খোলে। কিরণ সেইটার কাছে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ দেখিতে লাগিল। পাশে দাঁড়াইয়া মনোমোহিনী বলিতেছিলেন, "এ

ঘড়িটা যেমন চমৎকার দেখ্‌তে, তেমনি এটার দামও খুব বেশী। বাবা এটাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।—ওদিককার দেয়ালে ওই যে ছবিখানা দেখ্‌চ, ওই যে বিবি একটা গোলাপ ফুল হাতে করে রয়েচে, ওটার দাম পঞ্চাশ টাকা, আর এই তোমার সুমুখে যেখানা, একটি ছোট মেয়ে পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ্‌চে, সেটার দাম একশ' টাকা।" এই রকম কিছু দেখা শুনার পর আহারাদি হইল।

প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন হাতে করিয়া ঝির সঙ্গে বাহিরে ছিল। বাহিরে উঠানে সেই মাটির গাড়ীটা লইয়া টানাটানি করিতেছিল। ঝি জাতের যে অভ্যাস, এ ঝিরও সে অভ্যাস। সে আর একজন ঝির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে একটু অন্য দিকে গেল। প্রফুল্ল একেলা খেলা করিতে লাগিল।

একটু পরে মনোমোহিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ এবং তাঁহার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রনাথ এখন ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ভগিনীর বয়স চার বছর, নাম কাদম্বিনী। প্রফুল্ল তাহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী টানা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রনাথ ও তাহার ভগিনী প্রফুল্লের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই জনের নজর সেই গাড়ীখানার উপর। চন্দ্রনাথ তখনি বলিল, "তুই কে রে?"

প্রফুল্ল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোন খানে ঝির দেখা

নাই। লোক জন অনেক দূরে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাঁহাদের এ দিকে লক্ষ্য নাই, প্রফুল্লও কাহাকেও চেনে না। সে অবশেষে বলিল, "আমি পফুল্ল।"

চন্দ্রনাথ আর একটু কাছে গিয়া বলিল, "পফুল্ল কি রে! তুই গালফুলো।"

প্রফুল্লের চক্ষু উঠানময় ঘুরিতেছিল; ঝি কোথায়? প্রফুল্ল বলিল, "আমি খোকা।"

চন্দ্রনাথ। "কার খোকা?"

প্রফুল্ল। "মার খোকা।"

এমন সময় কাদম্বিনী গিয়া গাড়ীখানা ছুঁইল, বলিল, "আমি এইটা নেব।"

চন্দ্রনাথ মহা তম্বী করিয়া, প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ গাড়ী তুই কোথায় পেয়েছিস্?"

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিল, "মা কিনে দিয়েচে।"

চন্দ্রনাথ। "মা কিনে দিয়েচে বই কি! এ আমার গাড়ী, তুই চুরী কোরেছিস্!"

এই বলিয়া চন্দ্রনাথ গাড়ী ধরিয়া টানিতে লাগিল। কাদম্বিনী তৎক্ষণাৎ ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিল। প্রফুল্ল কাঁদিল না, কেবল বলিল, "আমি বাবাকে বলে দেব, কিন্তু।"

চন্দ্রনাথ বলিল, "আমি তোর বাবাকে মার্‌ব।" এই বলিয়া গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় ঝি ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া প্রফুল্লের ঠোঁট ফুলিল, তার পর, সে আস্তে আস্তে পা ছড়াইয়া মাটীতে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমাল গালী।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বেহান।

আনন্দময়ীর মা যদি ছয় মাস আগে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী আসিতেন, ত ঠাকুরমা তাঁহাকে মাটীর মানুষ স্থির করিতেন, এবং সেই কারণে তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতিও করিতেন। কিন্তু ছয় মাস আগে ঠাকুরমার মন যেমন ছিল, এখন আর তেমন নাই। আনন্দময়ীর মাকে যে ভাল চক্ষে দেখিত, সেই বলিত, মাটীর মানুষ, যে মন্দ চক্ষে দেখিত, সে বলিত, যেন ভিজে বেরালটি। মানুষটি দেখিতে শুনিতে বেশ, খাট-খাট, বয়সও এমন বেশী নয়, গায় মাথায় সদা সর্ব্বদা কাপড় চোপড় থাকে। মানুষটি খুব নরম, কথাবার্ত্তা খুব ধীরে কওয়া অভ্যাস, মুখ বড় মিষ্ট। তিনি কন্যার নিকটে বড় একটা থাকিতেন না। প্রায়ই ঠাকুরমার কাছে বসিয়া থাকিতেন, এবং বেহান বয়সে বড় বলিয়া, তাঁহার

সেবা করিতে চাহিতেন, কিন্তু ঠাকুরমা কুটুম্বের সমাদর জানিতেন—হয় ত নূতন বেহানের প্রতি মনে মনে কিছু সন্দেহও ছিল। এ সন্দেহের যে কারণ ছিল, তাহা শীঘ্রই জানা গেল।

মায়ে ঝিয়ে কখন কি পরামর্শ হইত, কখন কি কথাবার্ত্তা হইত, তাহা আর কেহ জানিত না। কিন্তু সে সকল পরামর্শের ফল সকলেই দেখিতে পাইল। আনন্দময়ী খরচপত্রের আরও আঁটাআঁটি করিতে লাগিলেন, এমন কি, ছেলেপুলের জলখাবারের পয়সা কমাইবারও কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দ্বাদশীর দিন ঠাকুরমার আর লীলার পারণার জন্য ৵ আনা করিয়া বরাদ্দ ছিল, দশমীর দিনও তাহাই ছিল। আনন্দময়ীর মা আসিয়া অবধি, সে পয়সা আনন্দ মার হাতে দিতেন, তিনি সেই পয়সাটা আস্তে আস্তে ঠাকুরমার হাতে দিতেন। তিন জনের ছয় আনা পয়সা। একাদশীর রাত্রে দ্বাদশীর পারণার পয়সা দেওয়া নিয়ম ছিল। এক দিন একাদশীর রাত্রে আনন্দের মা ঠাকুরমার হাতে তিন আনা পয়সা আনিয়া দিলেন।

হাতে পয়সা কম ঠেকিল বলিয়া, ঠাকুরমা পয়সা গণিয়া দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কিসের পয়সা ?”

আনন্দের মা একটু অপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন, “দ্বাদশীর পয়সা।”

“তিন আনা কেন ?”

“আনন্দ দিলে।”

ঠাকুরমা বেহানের মুখ চাহিয়া কহিলেন, "সে কি? দ্বাদশীর ছ' আনা—তিনি কি জানেন না?"

বেহান বলিলেন, "জানে বই কি। তবে আমায় আনন্দ এই বল্‌লে যে, দ্বাদশীর ছ' আনায় দরকার কি, এক আনা হলেই হবে। তা, আমাদের শ্বশুরবাড়ীও বিধবাদের দশমী একাদশীতে চার পয়সা কোরে বরাদ্দ।"

তখন ঠাকুরমার রাগ হইল। বলিলেন, "তোমার শ্বশুরবাড়ী যা হয়, তাই কি সকল বাড়ী হবে? আমার গোবিন্দ বেঁচে থাক্, আমাদের বাড়ী যেন বিধবাদের কোন কষ্ট না হয়।"

বেহান একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আনন্দ বল্‌লে যে, জামাই নিজে তাকে এ কথা বলেছেন।"

ঠাকুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পয়সা ক' আনা বেহানের হাতে দিলেন, কিছু রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "বটে! আচ্ছা, আমি গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নিজের জন্ত ঠাকুরমা একবারও ভাবেন নাই, কেবল লীলার পারণার পয়সা কাটা গেল মনে করিয়া বড় ব্যথিত হইলেন। একটু পরেই গোবিন্দপ্রসাদ আহার করিতে আসিলেন। ঠাকুরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তুমি কি একাদশীর আটটা পয়সা আর দিতে পার না, তাই চারটা কোরে কেটে নিতে চেয়েছ?"

গোবিন্দপ্রসাদ আকাশ হইতে পড়িলেন। সাশ্চর্য্যে কহিলেন, "সে কি কথা?"

ঠাকুরমা কহিলেন, "কেন, এই যে বেহান বল্‌লেন, তুমি চার পয়সা কোরে বরাদ্দ কোরেচ। আমায় যদি তুমি 'দু পয়সা কোরে দাও, তা' হ'লেও আমি তাতে কিছু মনে কর্‌ব না, কিন্তু পরের মেয়ে লীলা বাড়ীতে আছে, সেটা ত মনে রাখা উচিত। আমি কোন্ মুখে লীলার সুমুখে দ্বাদশীর দিন সকাল বেলা চারটি পয়সা খাবার দেব?"

একটু দুরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া লীলা শুনিতেছিল। সে আগে কিছু শুনে নাই, ঠাকুরমাতে এবং আনন্দের মাতাতে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কিছু জানিত না। ঠাকুরমা ছেলের সঙ্গে কিছু রাগিয়া কথা কহিতেছেন শুনিয়া, লীলা ঘরের বাহিরে আসিয়া, অন্ধকারে দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া আপনার নাম শুনিতে পাইল। শুনিয়া মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল, অন্ধকারে কোথাও ডুব দিয়া থাকে, আর যেন লোকে তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

গোবিন্দপ্রসাদ কহিলেন, "মা, তুমি সে জন্য আর ভেব না, আমি নিজে তোমার জলখাবারের জন্য একেবারে মাসে মাসে কিছু দেব।"

তিনি আহার করিয়া, বাহিরে গেলে, লীলা ঠাকুরমাকে ডাকিয়া, আপনার ঘরে লইয়া গেল; ঠাকুরমা দেখিলেন,

লীলা কাঁদিতেছে। রোদনের আর কোন বাড়াবাড়ি নাই, কেবল পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপিতেছে, আর দু'টি চক্ষে ধীরে ধীরে জল বহিতেছে। লীলা আস্তে আস্তে বলিল, "ঠাকুরমা, তুমি আমার জন্য কিছু বল্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি ত কখন বড়মানুষ ছিলুম না, আমি বড়মানুষের মেয়ে নই, বড়মানুষের বাড়ী বিয়ে হয় নি। যা পাব, তাই খাব। তুমি আমার জন্য কখন কিছু বলো না, আমার মাথা খাও।"

ঠাকুরমা বড় বিপদে পড়িলেন, বলিলেন, "তাতে কি কাঁদ্‌তে আছে, ছি! চোকের জল ফেল না, অমঙ্গল হবে। আমি কি তোমার নাম ইচ্ছা কোরে কোরেছিলুম? রাগ হয়েছিল, তাই কথায় কথায় বলেছিলুম। আর কেঁদ না, এ বাড়ীতে আমি থাক্‌তে যেন তোমাকে কখন না কাঁদ্‌তে হয়।"

লীলা চক্ষু মুছিয়া চুপ করিল। অমঙ্গলের নাম শুনিলেই তাহার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিত। সে ত যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটিয়াছে! এ বাড়ীতে সে আসিয়া কি সর্ব্বনাশ না হইয়া গিয়াছে!

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। প্রতিদিন একটা না একটা কিছু মনকসাকসির কারণ উপস্থিত হইত। বৃদ্ধ বয়সে ঠাকুরমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ছিল। বুঝি পূর্ব্বজন্মের ভোগ বাকি ছিল।

লীলা দিন দিন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িল, কিন্তু অসুখ হইয়াছে, এ কথা কেহ বলিলে কখন স্বীকার করিত না।

চোকের কোলের নীল রেখা কালো হইয়া উঠিল, গালে, কপালে শিরগুলি আরও উঁচু হইয়া উঠিল। বুকের সে ব্যথা আরও ঘন ঘন হইতে লাগিল, এবং ব্যথার সময় হাঁপটা অধিক ক্ষণস্থায়ী হইতে লাগিল। কিন্তু এ সব আর কেহ জানিল না। ব্যথাটার আগে লীলার বুকের ভিতর একটু ধড়ফড় করিত, সেই সময় সে আপনার ঘরে গিয়া দোর দিত। তার পর, বিছানায় মুখ গুঁজিয়া, বালিশে বুক চাপিয়া, বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিত। আর সেই সময় তাহার মনে একটা আশা হইত, মনে হইত, তাহার দুঃখযন্ত্রণাময় জীবন শীঘ্র ফুরাইবে।

আনন্দ ও তাঁহার মা বিশেষ কোন অসুবিধা অনুভব করিতেন না। তাঁহাদের কেবল একটা বড় দুঃখের কারণ ছিল। আনন্দের এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা হয় নাই।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গোৎসব।

এ বৎসর চৌধুরীবাড়ীতে বড় জাঁক হইল। কিরণের মা পূজার সময় মরেন, সেই জন্য সে বৎসর আর পূজা হয় নাই। গোবিন্দ-

প্রসাদ বাবুর ইচ্ছা, এ বৎসরও পূজা না হয়; কিন্তু নূতন গৃহিণীর আব্দার,—এ বৎসর পূজা আরও ধূমধাম করিয়া হইবে। আনন্দের মা, মেয়ের ছেলে হয় না ভাবিয়া অস্থির, মনে করিয়াছিলেন, এই বৎসর হইতে কার্ত্তিক পূজা আরম্ভ করিবেন, কিন্তু আগে দুর্গোৎসবটা হওয়া উচিত। পূজার সময় কিরণকে আনিতে গেল। কিরণ আসিবে না, কাঁদিতে লাগিল। গাড়ী, পাল্কী, ঝি, দরওয়ান সব ফিরাইয়া দিল। অবশেষে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু নিজে গিয়া, অনেক করিয়া বুঝাইয়া, কিরণকে লইয়া আসিলেন।

কিরণ লীলাকে সেই যাবার সময় দেখিয়া গিয়াছিল। সেই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া গিয়াছিল, আর তাহাকে দেখে নাই! সেই অবধি কিরণ আর বাপের বাড়ী আসে নাই। ঠাকুরমা কয় বার আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কিরণ আসে নাই। কিরণকে যখন কোন ঝি দেখিতে যাইত, তখনি কিরণ জিজ্ঞাসা করিত, ‘দিদি কেমন আছে?” ঝি বলিত, ‘ভাল আছে।’ সেটা কেবল লীলার গুণে। কিরণের কাছে যখন কোন ঝি যাইত, তখনি তাহাকে লীলা শিখাইয়া দিত, “আমার কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে বলো ভাল আছে।” ঝিরাও তাই বলিত। কিরণ নিশ্চিন্ত থাকিত। এখন কিরণ আসিয়া লীলার সেই শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি, তোমার ব্যারাম হয়েছে, কই আমায় ত ঝি বলে নি।”

লীলা প্রফুল্লের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমার ত কোন অসুখ করে নি।"

লীলা এখন আর প্রফুল্লকে কোলে তুলিতে পারে না। প্রফুল্ল লীলার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করে নি ত এমন কেন ?"

লীলা কহিল, "আমি ত বরাবরই এমনি আছি।"

কিরণ। "এমনি রোগা ? আমি কি তোমায় কখন দেখি নি ? এখন তোমায় দেখ্‌লে ভয় করে।"

লীলা একটু হাসিল, কহিল, "আমি ত আর বাঘ ভালুক নই যে, দেখে ভয় হবে। আমায় কত দিন দেখ নি, তাই রোগা রোগা দেখাচ্চে।"

এমন সময় প্রফুল্ল লীলার হাত ছাড়াইয়া কিরণের হাঁটু ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ও কে ?"

কিরণ বলিল, "ও মাসিমা।"

প্রফুল্ল বলিল, "মাসিমা খাবা দেয় ?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "খুব দেয়, মার চেয়েও বেশি খাবার দেয়।"

প্রফুল্ল বিনা বাক্যব্যয়ে মাসিমার কাছে গিয়া, হাত পাতিয়া বলিল, "মাসিমা, খাবা।" কাজেই লীলা ও কিরণের কথা স্থগিত হইল।

প্রফুল্লকে খাবার দিয়া লীলা কিরণকে আপনার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে দুই জনে গলাধরাধরি করিয়া কাঁদিতে বসিল। বাহিরে দু' জনের মধ্যে এক জনও কাঁদে নাই,—আনন্দময়ীর মা একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণ তাঁহাকে ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া আসিয়াছিল। যে দু' একটা কথা না কহিলে ভাল দেখায় না, কেবল তাহাই কহিয়াছিল। তাহাও লোকলজ্জার ভয়ে। যাহা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়, যাহা দেখিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, তাহাই দেখিয়া কি আবার হাসি মুখে কথা কহা যায়?

লীলা ও কিরণ, দুই জনে মিলিয়া অনেক ক্ষণ কাঁদিল। কেহ কোন কথা কহিল না, কেবল কাঁদিল। প্রফুল্ল বাহিরে ছিল। বেগ একটু শমিত হইলে, কিরণ লীলাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিল, জানিতে চাহিল, তাহার কি অসুখ। কিন্তু লীলা কিছুতেই কিছু বলিল না। তখন কিরণ তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, আস্তে আস্তে ঠাকুরমার ঘরে গেল। ঠাকুরমা সন্ধ্যা করিতেছিলেন। কিরণ দরজাগোড়ায় দাঁড়াইল। ঠাকুরমা তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

সন্ধ্যা সমাপন হইলে, কিরণ জিজ্ঞাসা করিল?” “ঠাকুরমা, সন্ধ্যা হয়েচে?”

“হয়েচে ভাই। প্রফুল্ল কোথায়?”

কিরণ কহিল, "সে ঝির কাছে আছে। ঠাকুরমা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি।"

ঠাকুরমা কিরণকে কাছে ডাকিলেন, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা কিরণ ?"

কিরণ কহিল, "দিদির কি অসুখ হয়েছে, বুঝ্‌তে পার্‌চি নে। আমায় ত কিছু বলে না। কিন্তু তাকে দেখ্‌লে ভয় করে।"

ঠাকুরমার চক্ষু জলের ভারে নত হইয়া পড়িল। দু' ফোঁটা জল কিছুতে আর রাখিতে পারিলেন না। কিরণ সেই দুইটি অশ্রুবিন্দু দেখিয়া ভয় পাইল। কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দু' ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া ঠাকুরমা চোক মুছিলেন। তার পর, বলিতে লাগিলেন, "কি যে অসুখ, তা ত আমিও জানি নে, কিন্তু মেয়ে ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারখানা হাড় সার হ'ল। আমি যদি পীড়াপীড়ি কোরে ডাক্তার কবিরাজ ডাক্‌তে চাই, তা' হলে কাঁদে, বলে—কোন অসুখ নেই। সব সওয়া যায়, কিন্তু লীলার কান্না সওয়া যায় না। ওর চোকে যে আবার জল পড়্‌বে, সে আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। আমার কেবল এই কামনা যে, আমি থাক্‌তে যেন ওর চক্ষের জল না পড়ে। তাই ডাক্তার ডাকাতে পারি নে। অদৃষ্টে যা' আছে, তাই হ'বে।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরমা, তুমি কিছু বুঝ্‌তে পার না ? দিদির কি শরীরেরই অসুখ, না মনেরও কোন অসুখ আছে ?"

ঠাকুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, "মনের অসুখ কার নেই? লীলার কিসেই বা মনের সুখ থাক্‌বে? এখানে একটিও সমবয়সী নেই। যাও বা তোমার কাছে বসে কথাবার্ত্তা কইত, তুমি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অবধি তাও হয় না। কিসেই বা ওর মনে সুখ হ'বে?"

কিরণ বুঝিল, ঠাকুরমা কিছু কথা চাপা দিতেছেন। তখন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "যিনি সংসারের নতুন গিন্নী হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দিদির কেমন বনে?"

ঠাকুরমা একবার দুয়ারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেউ শুন্‌লেই বা আমার ক্ষতি কি! বুড় বয়সে ছেলে ত আর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌বে না, আর যদি তাড়িয়েই দেয় ত যে ক'দিন বাঁচ্‌ব, সে ক'দিন কি আর কেউ এক মুঠা ভাত দেবে না? লীলা যে মনের দুঃখে আছে, ত' সেই জানে। এক লক্ষ্মী থাক্‌তে, লীলার মুখে হাসিটুকু সর্ব্বদা লেগে থাক্‌ত, আর এক লক্ষ্মী এসে তার চক্ষের জল শুকোতে পায় না। তাকে মায়ে ঝিয়ে মিলে যে রকম করেন, তা' ভগবানই জানেন।

তারপর, ঠাকুরমা কিরণকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। লীলার যে সকল শাস্তি হইত, তাহার আঁতে যে সব ঘা লাগিত, সমুদয় একটি একটি করিয়া বলিলেন। শুনিতে শুনিতে কিরণের দু'টি চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। অবশেষে কিরণ কহিল, "ঠাকুরমা, এসব কথা এত দিন আমাকে বলে পাঠাও নি কেন?"

ঠাকুরমা কহিলেন, "লীলা যে আমায় কোন মতেই বলতে দিত না। তার সে মুখখানি দেখে কি তার কথা এড়ান যায়?"

তখন কিরণ কহিল, "যা' হয়েচে ঠাকুরমা, তা, হয়েচে। কিন্তু আর আমি দিদিকে এখানে থাক্‌তে দেব না। একাদশীর দিন যেতে নাই, দ্বাদশীর দিন যখন যাব, তখন তাঁকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা নিয়ে যেও ভাই। এখান থেকে বেরুলে ওর হাড়ে বাতাস লাগ্‌বে। তুমি ত লীলার বোন্, তোমার কাছে থাক্‌লে দোষই বা কি?"

ঠাকুরমার সঙ্গে কথা শেষ হইলে, কিরণ লীলার ঘরে গিয়া তাহাকে কহিল, "দিদি, আমি ঠাকুরমার কাছে সব শুনেছি, এখন তুমি আমায় সব কথা খুলে বল। বিজয়ার পর দ্বাদশীর দিন তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। এ বাড়ীতে আর তোমার থাকা নয়।"

লীলার মনে বিশ্বাস ছিল যে, এখনও তাহার এই বাড়ীতেই থাকা কর্ত্তব্য। যে বাড়ীতে শান্তিলাভ করিয়াছিল সে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া না দিলে স্বেচ্ছামতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু লীলার আর তেমন মনের বল ছিল না। কিরণের পীড়াপীড়িতে তাহার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গেল। উৎপীড়নে তাহার শরীর, মন, বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। কিরণের সঙ্গে যাইলে আর এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। একদিকে দারুণ যন্ত্রণা, অন্য দিকে

নিষ্কৃতি; এক দিকে কর্ত্তব্যের আদেশ, আর এক দিকে প্রলোভন। এমন অবস্থায় যাহার বল থাকে, সে কর্ত্তব্যই পালন করে। লীলার কল্পিত যে কর্ত্তব্য, তাহা পালন করা অনেক বলের কাজ, কিন্তু লীলার মনে আর এতটুকুও বল ছিল না। সুতরাং সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিল না। কিরণের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল—কিন্তু একটা আপত্তি—বলাটাও ভাল দেখায় না, অথচ না বলিয়াও থাকা যায় না। লীলা বলিল, "তুমি যেন আমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলে, কিন্তু তোমাদের যে অল্প টাকা, তাতে আর একটা মানুষের ভার নেওয়া উচিত নয়। প্রফুল্ল বড় হচ্চে, সে স্কুলে গেলে তোমাদের অনেক খরচ বাড়্‌বে। আমি এখানেই বেশ আছি।"

কিরণ রাগিয়া গেল। বলিল, "তুমি যদি কথা কাটাবার জন্ত এ কথা না বল্‌তে, তা'হলে আমি বড় রাগ কর্‌তাম। তুমি আমার কাছে থাক্‌লে আমার ভার বোধ হবে? এই বুঝি তুমি আমার দি'দি! আমার যা' শাক ভাত জুট্‌বে, তাই তোমায় দেব; তা'র আবার ভার বোঝা কি?"

লীলা আর পারিল না। তাহার সেই শীর্ণ মুখখানি কিরণের কাঁধে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "আমি তোমাদের কবে কি উপকার কোরেচি যে, তোমরা সবাই আমায় এত যত্ন কর!" ছোট মেয়েটিকে মা যেমন বুকে টানিয়া লয়, কিরণ সেই রকম করিয়া, লীলাকে আপনার বুকে টানিয়া লইল। লীলার এমনি

শরীর হইয়াছিল যে, শুইয়া থাকিলে তাহাকে ছোট মেয়েটির চেয়ে বেশী বড় দেখাইত না। সে নীরবে কিরণের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

লীলার বুকের সেই ব্যথাটা একটু বোধ হইতেছিল, সেইজন্য সে শুইয়া পড়িল। কিরণ তাহা কিছু বুঝিতে পারিল না। প্রফুল্ল লীলার পাশে শুইয়াছিল। লীলা প্রফুল্লের ঘুমন্ত মুখখানি দেখিতে লাগিল। এক দিন কি লীলাও প্রফুল্লের মত ছিল না!

পূজার কয় দিন কিরণের পক্ষে বড় দুঃখে কাটিল। যখন ঠাকুর দেখিতে যাইত, তখন তাহার চক্ষে জল আসিত, যখন ঢুলীরা বড় আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চোক দু'টা পাকাইয়া ঢোল কাঁসী বাজাইত, তখন তাহার চক্ষে জল আসিত, যখন আরতির সময় ধূপ ধূনা জ্বলিত, শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দে বাড়ী ফাটিয়া যাইত, তখন তাহার চক্ষে জল আসিত। যে বাড়ী এক বৎসর আগে লক্ষ্মীশূন্য হইয়াছে, সেই বাড়ীতে আজ এত উৎসব!

সপ্তমী পূজার রাত্রে যাত্রা হইবার কথা ছিল, এজন্য অনেকে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া শুইতে গেল—যাত্রার সময় উঠিবে। যে সুন্দরীদের শুনিবার বড় সাধ, তাঁহারা না শুইয়া সকলের আগে জায়গা দখল করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দুপুরের সময় যাত্রা আরম্ভ হইবার কথা, রাত্রি এগারটার সময় খবর আসিল, যাত্রার দলের বাবুরা রাত্রি চারিটার এদিকে আসরে নামিতে পারিবেন না। সখের দল, কিছু বলিবার যো

নাই। অত রাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইবে শুনিয়া, অনেকের উৎসাহভঙ্গ হইয়া গেল। যাঁহারা পাড়া হইতে জড় হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে যাত্রার দলের পোড়ারমুখো মিন্সেদের রন্ধনশালার একটা বিশেষ উত্তপ্ত স্থানে পাঠাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। যাহারা আগে হইতে সম্মুখের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহারাও অনেকে উঠিয়া গেল, কেহ কেহ সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ীতে সাড়াশব্দ নাই। দরোয়ানেরা দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়াছিল—রাত্রি দুইটার সময় দরজা খুলিবার হুকুম। বাড়ীর উঠানে দু'একটা ঝাড়ে গোটা দুই বাতি জ্বলিতেছিল। দরজার কাছে ও বাড়ীর ভিতর যাইবার গলিতে, দুইটা সরায় সরিষার পুঁটলির আলো কাঁপিতেছিল। সেই কম্পিত আলোকে, দেয়ালে ও উঠানে নানা রকম ছায়া নৃত্য করিতেছিল। কেবল পূজার দালানে সমুদায় দেয়ালগিরি ও ঝাড় জ্বলিতেছিল। সেই স্তব্ধতার মধ্যে, দশভুজার সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইতেছিল। অসুরের নীল মুখে, সিংহের শুভ্র কেশরে আলোক জ্বলিতেছিল। প্রতিমার মুখে যেন একটু স্থির হাসি। সেই উজ্জ্বল আলোকে, লোকালয়ের নিদ্রিত নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিলে, যে হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করে, সেও স্তব্ধ হইয়া একবার দাঁড়াইত।

পূজার দালানে কেহ ছিল না। অকস্মাৎ পাশের দরজা

খুলিয়া একটি শুভ্রবসনা স্ত্রীলোক নীরবে প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে দেবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। অনিমেষ, কাতর দৃষ্টি। ক্রমে আত্মবিস্মৃতি হওয়াতে মাথার কাপড় খসিয়া পড়িল। দীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশরাশি, শুভ্র বসন, তাহার উপর সেই উজ্জ্বল আলোক! সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি, মুকুটধারিণী দেবীমূর্ত্তি। আর কোথাও কেহ নাই। এ দিকে ও দিকে যাহারাও বা ছিল, তাহারা নিদ্রামগ্ন। যদি কেহ সে সময় রমণীর মুখ দেখিতে পাইত, ত দেখিত,—সে মুখ অত্যন্ত শীর্ণ, অথচ বড় সুন্দর। দেখিত যে, সে চক্ষের স্থির কটাক্ষে বড় কোমল জ্যোতি, তাহার ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কাঁপিতেছে। অনেক ক্ষণ চাহিয়া রমণী চক্ষু বুজিল; আবার চাহিল, আবার সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমার মুখ দেখিতে লাগিল। দেবীর মুখে সেই একটু স্থির হাসি—রাত্রে একা সেই রমণীর মত ব্যথিত প্রাণে দাঁড়াইয়া দেখিলে, সে হাসি কেমন যেন নিষ্ঠুর বোধ হয়। রমণীর বিনিদ্র, ব্যথিত, কাতর নয়নে সে হাসি ক্রমে নিতান্ত মমতাশূন্য বোধ হইতে লাগিল।

তখন তাহার চক্ষে জল আসিল। দু' ফোঁটা জল শুষ্ক কপোল বহিয়া আঁচলে পড়িল। ক্রমে সেই উজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে গণ্ড বহিয়া মুক্তধারা বহিতে লাগিল।

মা! সম্মুখে দাঁড়াইয়া লীলা কাঁদিতেছে কেন, একবার জিজ্ঞাসা করিবি না? দিগ্‌ভূজে! দশ হাত তোর, লীলার দুঃখ নিবারণের জন্য একটি অঙ্গুলিও হেলাইবি না?

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্কৃতি।

একাদশীর রাত্রি প্রভাত হইল। দ্বাদশীর দিন ভোর বেলা কিরণ যাইতে চায়। ঠাকুরমা গোপনে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সকাল বেলা না খাইয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না, লোকে কত কি মনে করিতে পারে। লীলা একাদশীর উপবাস করিয়া আছে, তাহাকেই বা কিছু না খাওয়াইয়া কেমন করিয়া যাইতে দেওয়া হয়?" ঠাকুরমার কথায় কিরণ বুঝিল। বৈকালে যাওয়াই স্থির হইল।

বৈকালে কিরণ সকলের নিকট বিদায় লইল। আনন্দময়ী বাহিরে যাইবার পথেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মা, কিরণ শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়া, অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণ তাঁহাদের নমস্কার করিয়া, প্রফুল্লকে ঝির কোলে দিয়া, লীলাকে ডাকিতে গেল। লীলা আপনার ঘরে ছিল। কিরণের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া, ঠাকুরমাকে নমস্কার করিল।

লীলা কিরণের সঙ্গে যাইবে, আনন্দময়ী তাহার কিছু কিছু জানিতেন। তবু লীলা ঠাকুরমাকে নমস্কার করিল ও তাঁহাকে নমস্কার করিতে আসিতেছে দেখিয়া, একটু বিস্ময়ের ভাণ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি এই সঙ্গে যাবে না কি?"

লীলা বলিল, “কিরণ বড় পীড়াপীড়ি কর্‌চে, তাই যাচ্চি।”

ও দিকে কিরণ ঠাকুরমাকে কিছু চেঁচাইয়া বলিতেছিল, “আমি ত আর দিদিকে চিরকালের জন্য নিয়ে যাচ্চি নে। আমি যে একলাটি থাকি, সেটাও ত তোমাদের একবার মনে করা উচিত। দু' দিন দিদি আমার কাছে থাক্‌লেনই বা!”

আনন্দময়ী একটুখানি মধুর হাসি হাসিয়া লীলাকে কহিলেন, “তবে তুমি বেড়াতে যাচ্চ? আমি ভেবেছিলাম, বুঝি তোমার আর এখানে ভাল লাগে না। আমি যদি ইচ্ছা কর্‌লে যেতে পার্‌তাম ত এত দিনে কত বার বাপের বাড়ী যেতাম।”

লীলা। “তোমার এখানে সংসার দেখ্‌তে হয়।”

আনন্দময়ী। “আমি যেখানে সেখানে যেতেও চাই নে। যেখানে সেখানে যাওয়া বড় সুখ্যাতির কথা নয়।”

লীলা মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিল, “আমি কি যেখানে সেখানে যাচ্চি?”

আনন্দময়ী। “আমি কি তাই বল্‌চি? কিরণের বাড়ী কি যেখান সেখান? কিরণের বাড়ী আর এ বাড়ী কি আলাদা?”

লীলা একটু চুপ করিল। একটু চুপ করিয়া, আনন্দময়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া, অতি মৃদু স্বরে কহিল, “আমার যাওয়ায় যদি তোমার মত না হয়, তা' হলে আমি যাব না। তুমি যদি বল ত আমি থাকি।”

আনন্দময়ী অতি বিস্মিতের মত কহিলেন, “আমি তোমায়

কেন বারণ কর্‌তে গেলাম ? আমি কোথাকার কে ? তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাবে, যেখানে ইচ্ছা হয় থাক্‌বে, আমি বারণ কর্‌ব কেন ?

লীলা বড় ব্যথা পাইল। একটা যেন কি দুঃখের কথা মুখে আসিল, কিন্তু তাহা চাপিয়া রাখিল। চোক না তুলিয়া কেবল বলিল, "তবে আসি।" লীলা আনন্দময়ীর পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতে উদ্যত হইল। আনন্দময়ী হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া কহিলেন, "থাক্‌, থাক্ ! হাজার হোক্‌, তুমি বয়সে আমার চেয়ে বড়।"

কিরণ ও লীলা, একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ঠাকুরমা এক ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতেছিলেন ; সেই দেখাদেখি তাঁহার নূতন বেহানের চোকের কোলে কোলে জল পুরিয়া আসিয়াছিল।

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া, চৌকাটের বাহিরে গেল।

প্রফুল্লচন্দ্র আগে হইতে গিয়া, গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। কিরণ ও লীলা চলিয়া যায় দেখিয়া, ঠাকুরমা চক্ষের জল সম্বরণ করিলেন।

খিড়্‌কীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরমা দরজা গোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। গাড়ীর সঙ্গে যেন ঠাকুরমার প্রাণের খানিকটা চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া ঠাকুরমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মেয়েটা রক্ষা পেলে!"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার অমঙ্গল।

কিরণের সঙ্গে লীলাকে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র ব্যথিত হইলেন। তিনি লীলাকে অনেক দিন দেখেন নাই। কিরণের মাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে লীলা কিরণের বাড়ী যায় নাই। অনেক দিনের পর দেখা, তার পর আবার এইরূপ দেখা! লীলার সেই তখনকার জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি আর এখনকার এই কালিমাময়ী, শীর্ণ, ম্লান মূর্ত্তি, দুই যেন সুরেশচন্দ্রের চক্ষে একত্রে পড়িল। তিনি লীলাকে প্রণাম করিয়া, আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদির এমন শরীর কেন?" কিরণ উত্তর করিল, "অসুখে।" তখন কিরণ আর কিছু বলিল না। লীলা বড় একটা কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। অনেক দিনের পর আজ যে শান্তি লাভ করিয়াছে, একটু চুপ করিয়া যেন সেই শান্তি ভোগ করিতে চায়।

নির্জ্জনে কিরণ স্বামীর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। আমার সন্দেহ হয়, কথাটা খুলিয়া বলিতে দু' চার কথা বেশী বলিয়া থাকিবে; একে ত একটা কথা শুনিয়া সেটা ঠিক সেই রকম

বলা বড় কঠিন, তাহাতে স্ত্রীলোকদের বাড়াইয়া বলা কেমন অভ্যাস। ঠাকুরমা কিরণের কাছে সকল কথাই যে ঠিক বলিয়াছিলেন, এমন অনুমান হয় না। কিরণও সুরেশচন্দ্রকে বলিবার সময় ঠাকুরমার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, ঠিক সেই রকম বলিতে পারিল না—কিছু বাড়াইয়া বলিল। সব শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের বুক ফাটিয়া গেল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর, জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি এখানে ক' দিন থাকবেন ?"

কিরণ কহিল, "সেই বাড়ীতে আবার ওঁকে পাঠাব ? দিদি এখন আমাদের কাছেই থাক্‌বেন। তোমার কি মত ?"

সুরেশচন্দ্র কিরণকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমার আবার অন্য মত ?"

কিরণ মুখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, "কথা কইতে কইতে ও আবার কি !"

লীলাকে আনিয়া কিরণের একটা কাজ বাড়িল। লীলাকে ভাল খাওয়াইবার, তাহাকে ভাল রাখিবার মহা ভাবনা পড়িল। কিন্তু লীলা সমাদরে থাকিবার লোক নয়। কিরণ তাহার জন্য যা' কিছু উদ্যোগ করিত, লীলার কৌশলে সে সকল পাল্টাইয়া কিরণের ভাগেই পড়িত। সকলের চেয়ে প্রফুল্লেরই জিত। মাসিমা আসিয়া তাহার খাবার ও আদর দুই বাড়িল।

এক দিন বৈকালে আপিস হইতে বাড়ী আসিবার সময়, সুরেশচন্দ্র গড়ের মাঠ দিয়া আসিতেছিলেন। আকাশে অল্প মেঘ

করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টি হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। হঠাৎ অন্ধকার হইয়া আসিল। উত্তর পশ্চিম কোণে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র জোরে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। মাথার উপর বৃষ্টি লইয়া সুরেশচন্দ্র রাজপথে আসিলেন। খানকতক গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুবিধা পাইয়া তাহারা আট আনার জায়গায় দেড় টাকা হাঁকিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, এখন গাড়ী চড়িলেও বড় লাভ নাই, যাহা ভিজিবার, তাহা ভিজিয়াছেন। হাঁটিয়া বাড়ী গেলে না হয় আর একটু ভিজিবেন। সুরেশচন্দ্র হাঁটিয়াই বাড়ী গেলেন।

সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে জ্বর বড় বাড়িয়া উঠিল। দুই তিন দিন পরে বিকার হইল, সুরেশচন্দ্র প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। ডাক্তারে বলিল, "পীড়া বড় কঠিন, কি হয়, বলা যায় না।" গোবিন্দপ্রসাদ বাবু সংবাদ পাইয়া এক জন বড় ডাক্তার সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সুরেশচন্দ্র তখনও চৈতন্য লাভ করেন নাই। ডাক্তার বড় বিচক্ষণ, অনেক ক্ষণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। শেষে কহিলেন, "বিশেষ কোন ভয় নাই। কিন্তু আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে। অনেক দিন সাবধানে থাকিতে হইবে।" কিরণ ও লীলা আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার কি বলিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না বলিয়াই, তাহাদের বড় ভয় হইল।

দিন কয়েকের মধ্যে বিকার ছাড়িল কিন্তু জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু নিজে কিছু অসুস্থ ছিলেন, এ জন্য জামাতাকে আর দেখিতে আসিতে পারেন নাই। লীলা নিজের রুগ্ন শরীর লইয়া সুরেশচন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। কিরণ কাঁদিবে, কি স্বামীর কাছে বসিবে, কি প্রফুল্লকে সামলাইবে, ভাবিয়া পায় না!

এক মাস কিরণের বাড়ীতে লীলা না আসিতে, এই কাণ্ডটি ঘটিল। যেখানে লীলা যায়, সেই খানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গল আসে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিরণের নাকি বুদ্ধি বড় কম, সেই জন্য সে কিছু মনে করিত না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদে বন্ধু।

গণেশচন্দ্রকে অনেক দিন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এখন তিনি একটু বিরলদর্শন হইয়াছেন। যখন তখন দেখা পাওয়া যায় না, যে সে দেখা পায় না। আগেকার হুজুগগুলা এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, বক্তৃতার স্রোতে কতক ভাঁটা ধরিয়াছে, সভা সমিতিতে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া কিছু কমিয়াছে। লোকে

জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, “অবসর নাই, নানা কর্ম্মে ব্যস্ত।” অন্য দিকেও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তামাকটা আর সখের জিনিস নাই, নিয়মিত সময়ে না জুটিলে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মদ্যপানটাও বাহাদুরীর জিনিস নাই, প্রায় সাথের সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের প্রতি গণেশচন্দ্রের একটু অনুগ্রহদৃষ্টি ছিল। সুরেশচন্দ্রের ব্যারামের কথা গণেশচন্দ্র শুনিতে পাইলেন। দুই বাড়ীর ঝি আসা যাওয়া করে, সুতরাং খবর পাইতে বড় দেরী হইল না। গণেশচন্দ্র পীড়ার কথা শুনিয়া, সুরেশচন্দ্রকে একবার দেখিতে আসিলেন। সুরেশচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, গণেশচন্দ্র শয্যার পাশে বসিয়া খানিক কথাবার্ত্তা কহিলেন। উঠিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে দেখিতেছে?”

সুরেশচন্দ্র পাড়ার একজন ডাক্তারের নাম করিলেন।

গণেশচন্দ্র কহিলেন, ‘‘সে কি? এত দিন জ্বর রহিয়াছে, এক জন ভাল ডাক্তার দেখান হয় না কেন?”

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, ‘‘একবার শ্বশুর মহাশয় দেখাইয়াছিলেন। আমার তখন বিকার।”

গণেশচন্দ্র কহিলেন, “তোমার শ্বশুর ত ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আবার আসিতে পারেন?”

“তিনি নিজে পীড়িত।”

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া বলিয়া গেলেন, “আচ্ছা, কাল আমি

নিজে সঙ্গে করিয়া আসিব। তোমার এক জন ভাল ডাক্তার দেখান উচিত।"

গণেশচন্দ্র যে খামখা একটা পরোপকারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেটা কিছু আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু এ রকম পরোপকার উদ্দেশ্যশূন্য নয়। গণেশচন্দ্র ডাক্তার আনিয়া, সুরেশচন্দ্রকে দেখাইবেন, এ কথা কখন চাপা থাকিবে না। প্রকাশ হইলেই গণেশচন্দ্রের যশ বাড়িবে। যথার্থ উদ্দেশ্যশূন্য পরোপকার কয় জন করে?

এ সব গোলমালের কথা। গণেশচন্দ্র যাহা করিলেন, সেটা বিপদকালে যথার্থ বন্ধুর কাজ বটে—তা উদ্দেশ্য যাহাই হউক। পর দিবস ডাক্তার লইয়া আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু জলবায়ুপরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ কিছু দিন কলিকাতার বাহিরে একটা বাগান-বাড়ীতে থাকিতে হইবে।"

ডাক্তারের পরামর্শমতে, রুগ্ন সুরেশচন্দ্রের বাগানে যাওয়াই স্থির হইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

বাগানে যাওয়া ত স্থির হইল, কিন্তু সেটা ত ব্যয়সাধ্য। টাকা আসিবে কোথা হইতে?

সুরেশচন্দ্রের পিতৃব্য পেন্সন লইয়া অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। মাস কয়েক পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, সুরেশচন্দ্রের পিতৃব্যালয়ে যাওয়া এক প্রকার রহিত হইয়াছিল। তাঁহার পীড়ার সময় সে বাড়ী হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও আসে নাই।

হরগৌরী বাবু সুরেশচন্দ্রের যে কয়টি টাকা জমা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই প্রায় তাঁহার পীড়ার সময় খরচ হইয়া গিয়াছিল। পীড়িত হইয়া পর্য্যন্ত পূরা বেতনও পাইতেন না।

শ্বশুরের নিকট টাকা চাহিবেন? সে কথা সুরেশচন্দ্র কাণে তুলিলেন না। কিরণের মনও কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। শেষ উপায় কিরণ নিজেই উদ্ভাবিত করিল। কিরণ ও লীলা মিলিয়া পরামর্শ করিল। সুরেশচন্দ্র শয্যাগত, তিনি প্রথমে কিছু জানিতে পারিলেন না।

কিরণ গহনা বন্ধক রাখিবে। এমন সময় যদি তাহার গহনা কাজে না আসিল ত আর কখন কাজ দেখিবে?

লীলার সাক্ষাতে কিরণ গহনার বাক্স বাহির করিল। মাতার মৃত্যুর পর, মাতার গহনা প্রায় সমুদয়ই সে পাইয়াছিল। বাক্সের এক দিকে তাহার নিজের গহনা ছিল, আর এক দিকে তাহার মার গহনা ছিল। বাক্স খুলিয়া কিরণ সেই গহনাগুলি দেখিতে লাগিল। কোন গহনাখানি একটু ময়লা—কিরণের মার অঙ্গে লাগিয়াছিল। কোনখানে একটু ঘসিয়া গিয়াছে—মা পরিতেন। চিকের ফিতায় একটু যেন গন্ধ, মার অঙ্গের পদ্মগন্ধ। সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিলে মার সে কোমল মুখশ্রী আর অঙ্গলাবণ্য যেমন দেখাইত, কিরণের তাহাই মনে হইল। তার জলভরা চক্ষের সম্মুখে স্নেহময়ী, অলঙ্কৃতা জননীর মূর্ত্তি উদয় হইল। তার হাত কাঁপিতে লাগিল, তার চক্ষের জল সেই অলঙ্কারগুলির উপর পড়িল। অতি কাতর চক্ষে লীলার দিকে চাহিয়া কহিল, "দিদি, এ গুলিও কি দিতে হবে? এ গুলি ত আমি দিতে পার্‌ব না।"

লীলার মর্ম্ম হইতে সে ব্যথার প্রতিধ্বনি উঠিল, তাহার ম্লান চক্ষে জল বহিতে লাগিল। বলিল, "না দিদি, ও গহনা বার্ কোর্‌তে হবে না। তোমার নিজের সব গহনাও বার্ কোর্‌তে হবে না। গণেশ বাবু বলেচেন, দু'শো টাকা হলেই হবে। তোমার দু' হাজার টাকার গহনা আছে।"

গহনা বন্ধক রাখিয়া, লীলা ও কিরণ সুরেশচন্দ্রকে বাগানে লইয়া গেল। কিরণ যাইবার সময় পিত্রালয়ে সংবাদ দিয়া গেল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দুই জনের মন।

লীলা গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া যাইলে পর, অনেকে প্রায় সর্ব্বদাই তাহার নাম করিত, কিন্তু দুই জন তাহার বিষয় বেশী ভাবিত। সেই দুই জন,—ঠাকুরমা ও আনন্দময়ী।

ঠাকুরমা নিজে ইচ্ছা করিয়া, কতক নিজে উদ্যোগী হইয়া, লীলাকে কিরণের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া প্রথম কয় দিন তিনি নিশ্চিন্তও হইয়াছিলেন। নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—লীলার জন্য, নিজের জন্য তখন ভাবেন নাই। যখন লীলা চলিয়া গেল, দুই চারি দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার মন কেমন করিতে লাগিল। তাহার জন্য মনে একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল। কিরণের জন্য তত মন কেমন করিত না। তাঁহার এই প্রাচীন, জীর্ণ জীবনের সঙ্গে কিরণ তেমন জড়ায় নাই। কিরণ পরের বাড়ী যাইবে বরাবরই জানিতেন। কিরণের অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। অল্প বয়স হইতেই সে শ্বশুরবাড়ী ছিল, ঠাকুরমার সেবা কখন করে নাই। বাড়ীর অন্য ছেলে মেয়ে যে রকম, ঠাকুরমার কাছে কিরণও সেই রকম। লীলার প্রতি আর এক রকম মনের ভাব।

কিরণ পৌত্রী হইলে কি হয়, লীলার দিকে ঠাকুরমার টান বেশী। লীলা আসিয়া তাঁহার একটা নূতন বন্ধন হইয়াছিল, একটা নূতন মায়া বাড়িয়াছিল। সেই জন্য লীলার বিচ্ছেদ তাঁহার বড় লাগিল। শুধু মনে নয়। বাহিরে নড়িতে চড়িতে লীলাকে মনে পড়িত। তাঁহার কাজ কর্ম্ম লীলার মত কে করিবে? লীলার মত শুদ্ধাচারিণী বাড়ীতে আর কে আছে? ঠাকুরমার জল খাবার ঘটীটি সে দুই বেলা নিজে মাজিত; ফুল কাঁসা মাজিতে মাজিতে রূপার মত হইয়া উঠিয়াছিল। লীলা গিয়া অবধি ঘটীটি যেন একটু ময়লা ময়লা দেখাইতেছে, আর যেন তত ঝক্ ঝক্ করে না। ঠাকুরমার দাঁত বড় বেশী ছিল না, যাহা ছিল তাহাও তেমন শক্ত ছিল না। লীলা তাঁহার জন্য পান সাজিয়া খলে ছেঁচিয়া দিত। এমন মিষ্ট পান আর কে সাজিবে? ঠাকুরমার আহ্নিকের জল দেওয়া, তাঁর কোষাকুষি মাজা, তাঁর কাপড় কাচা, তাঁর বিছানা পাতিয়া দেওয়া, তাঁর উনান নিকান, তাঁর মাথা হইতে ধান দিয়া পাকা চুল বাহির করা, এ সব তেমন আর কে করিবে? কত বুদ্ধিই লীলার ছিল! ঠাকুরমা বুড মানুষ, সহজেই রাগিয়া উঠিতেন। লীলা তাঁহাকে একেলা পাইলে কেমন নম্রভাবে ধীরে ধীরে কত করিয়া বুঝাইত; ঠাকুরমা বলিতেন, "যেন কত কালের ঠাক্‌রুণ দিদি!" আর লীলাকে দেখিয়াই তাঁর মন কত কোমল হইত! তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাছে থাকিয়া, তিনি যত দিন বাঁচিবেন, লীলার আর কোন কষ্ট হইবে না।

বিধাতা তাহার কপালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ত কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তাহা ঘটিয়াও গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর মা মনে করিতেন যে, লীলা আর সব ছোট ছোট দুঃখ যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে, তাহার কপালে সুখ না থাকুক, শান্তি লাভ করিতে পারিবে। ঠাকুরমার সেই আশাই বা পূরিল কৈ? একটু একটু করিয়া লীলার হৃদয় দলিত হইতেছিল, তিনি দাঁড়াইয়া কেবল দেখিতেন, কিছুই করিতে পারিতেন না। লীলার মুখখানি কেমন করিয়া শুকাইয়া আসিতেছিল, তিনি ত রোজ দেখিতে পাইতেন। তাহার হাড় এখন জুড়াইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরমা ত স্থির হইতে পারিতেন না। কেবল মনে করিতেন, কত দিনে আবার লীলাকে দেখিবেন।

আনন্দময়ীও লীলাকে অনেকবার স্মরণ করিতেন। তাঁহার মনের ভাব আর এক রকম। লীলা কেন চলিয়া গেল? তাহার উপর আনন্দময়ীর রাগ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না। লীলা থাকে, কষ্ট পায়, চুপ করিয়া সে কষ্ট সহ্য করে, আনন্দময়ীর সেই ইচ্ছা। আনন্দময়ী যে ভারি দুষ্ট, আমার সে রকম মনে হয় না। আনন্দময়ীর স্বভাব এখন ভালরূপে গঠিত হয় নাই। তিনি যে লীলাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেটা কেবল বিন্দুবাসিনীর দোষে। বিন্দুবাসিনী অমন করিয়া না লাগাইলে কি হইত বলা যায় না। আনন্দময়ীর মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার আসাতে লীলা

অসন্তুষ্ট, আর লীলার মত নেহাত ভালমানুষী তাঁহার ভাল লাগিত না। লীলা যদি তাঁহাকে ভাল না বাসে ত তাহাকে একটু জ্বালাতন করিলে দোষ কি? তাঁহার মনের ভাব এইরূপ। আনন্দময়ীর বয়স অধিক নয়, অল্প বয়সে সকলেই একটু চঞ্চল, একটু দুষ্ট হয়। আমার বিবেচনায়, ভাল লোকের হাতে পড়িলে, আনন্দময়ী আর এক রকম মানুষ হইতেন। যে তাঁহার মা জুটিয়াছিলেন ও যে ননদ মিলিয়াছিল, তাহাতে কাহারও মন ভাল থাকা দায়। দিন রাতই ফিস্ ফিস্, ফুস্ ফুস্। অত মন্ত্র কাণে ঢুকিলে কি আর রক্ষা আছে? ছোট ছেলেরা প্রজাপতি ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দেয়, তাহাকে কাঁটি বিঁধিয়া মারে। প্রজাপতিটা মরিয়া যায়, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে সেটা খেলা মাত্র। লীলাকে একটু করিয়া খোঁচা দেওয়া, আনন্দময়ীর পক্ষেও সেই প্রকার ছেলেখেলা। পাখা ছিঁড়িবার আগে প্রজাপতিটা যদি হাত হইতে উড়িয়া যায়, তাহা হইলে ছেলেরা যেমন নিরাশ হয়, লীলা কিরণের সহিত চলিয়া গেলে পর আনন্দময়ীর মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বাগান বাড়ী।

হুগলীর নিকটে গঙ্গার ধারে একটি ছোট বাগান-বাড়ীতে সুরেশচন্দ্র বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ীখানি একতলা, কিন্তু বেশ খট্‌খটে। চারটি পাঁচটি ঘর, ঘরগুলিতে বেশ হাওয়া খেলে। ইংরাজী ধরণের বাড়ী—অন্দরমহল নাই। অন্দরমহলের কোন আবশ্যকও ছিল না। কিরণ ও সুরেশচন্দ্র এক ঘরে শয়ন করেন, লীলা আর এক কামরায় শোয়। সঙ্গে একজন চাকর আসিয়াছিল, সে বাহিরে থাকিত। বাগানের মালী বাগানে থাকে। আশে পাশে, বাগানের বাহিরে, দু' চা'র ঘর রেওত থাকে।

ডাক্তার ঠিক কথা বলিয়াছিল। বাগানে আসিয়া সুরেশচন্দ্র অনেক সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। রান্নাবান্না লীলা ও কিরণ মিলিয়া করিতে লাগিল। মালী রেওতদের এক জন স্ত্রীলোক ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া, বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, রাত্রে নিজের ঘরে শুইতে যাইত।

কিরণের কলিকাতার বাহিরে যাওয়া এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। পল্লীগ্রামের গল্প অনেক শুনিয়াছিল, বনবাদাড়ের কথা, ভূত প্রেতের কথা অনেক শুনিয়াছিল, কিন্তু পাড়াগাঁ চক্ষে কখন দেখে নাই।

তাই বাগানবাড়ীতে তাহার বড় নূতন নূতন বোধ হইতে লাগিল। প্রফুল্ল মাতামাতি, ছুটাছুটির বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়া, কিরণকে ও লীলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহাকে ধর্ ধর্ করিতে করিতেই তাহাদের অর্দ্ধেক দিন যাইত।

বাড়ীটি ছোট বটে, কিন্তু বাগান বেশ বড়। ফুলবাগান তেমন বাহারে নয়, কারণ মালী তেমন সেয়ানা নয়। বাগানে পুষ্করিণী। জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু বড় ব্যবহৃত হয় না। বাঁধান ঘাট আছে। ঘাটের এক দিকে একটা চাঁপা ফুলের গাছ, আর এক দিকে একটা বকুল ফুলের গাছ। পুকুরের ধারে বেশ ধোওয়া ধোওয়া শামুক গুগ্লি পড়িয়া রহিয়াছে। ছোট ছোট মাছের ঝাঁক মধ্যে মধ্যে সিঁড়ীর কাছে আসে। বাসন মাজা সেইখানে হয়, এঁটোকাঁটা পড়িয়া থাকে, মাছগুলি টুপ্ টুপ্ করিয়া খায়। পুকুরের পাড়ে একটা গাব গাছ, ঝড়ে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। বাতাস হইলেই কতকগুলা ডাল পাতা জলে নিমজ্জিত হয়, আর কুচ্কুচে কালো পাতাগুলি দেখিতে আরও কালো হয়। নিকটে গোটাকতক আকন্দ ফুলের গাছ। আকন্দ ফল ফাটিয়া চারিদিকে তুলা উড়িতেছে, কতকগুলা পুকুরের জলে পড়িয়াছে ও বাতাসে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পুকুরের এক কোণে একটা বাঁশঝাড়। বাঁশের পাতা গাছ হইতে খসিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জলে পড়িতেছে। বাতাসের বেগ বাড়িলে বাঁশপাতাগুলা ঝর্ ঝর্ করিয়া উঠে, কখন বাঁশে বাঁশে লাগিয়া, ঘর্ষণের শব্দ হয়। কিরণ প্রাণান্তেও সে দিকে

যায় না—বাঁশ গাছে ভূত থাকে। ফুলের মধ্যে চাঁপা, গন্ধরাজ, কামিনী বেশী। এক দিকে এক সারি সর্ব্বজয়া ফুল—বড় বড় পাতা, রাঙা রাঙা ফুল। আর এক দিকে কেয়া গাছের বন, দক্ষিণে বাতাসে ভর্ ভর্ করিয়া ফুলের গন্ধ আসে, কিন্তু লীলা ও কিরণ নিকটে যাইতে সাহস করে না—কেয়া বনে কেউটে থাকে। এক দিকে কতকগুলা আনারসের গাছ। বাড়ীতে উঠিবার সিঁড়ীর সম্মুখে দুই দিকে দুইটা প্রকাণ্ড ঝাউ গাছ, গাছের মধ্যে বাতাস কেবল সোঁ-সোঁ হু-হু করিয়া ডাকে। কিরণ কিছু দিন পর্য্যন্ত সেই শব্দ শুনিয়া মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিত। ফলের গাছ অনেক রকম। আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, আরও নানা রকম ফল আছে। পুকুরের কাছে নারিকেল গাছ, বাগানের পাঁচিলের পাশে চারি ধারে সুপারি গাছের সারি। আর এক দিকে কেবল কলাগাছ, চাঁপাকলাই বিস্তর, কতকগুলা চাটিম কলারও গাছ আছে। কতকগুলা গাছে মোচা পড়িয়াছে, কোন গাছে কলার কাঁদি ঝুলিতেছে। বাগানের এক কোণে একটা বৃদ্ধ খেজুর গাছ, সেটায় আর ফল ধরে না। অনেকগুলা বাবুইয়ের বাসা সেই খেজুর গাছে ঝুলিতেছে।

কলিকাতায় থাকিতে কিরণ গঙ্গা ভাল করিয়া দেখে নাই। দু' চার বার গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল, কিন্তু বড় একটা শোভা দেখিতে পায় নাই। আট-ঘাটে বাঁধা গঙ্গা মাঝখানে পুল, চারিদিকে জাহাজ, বোট, পান্সী। এখানে দেখিল, গঙ্গা আর এক

রকম। দুই ধারে গাছ পালা, কোথাও বা জলের মাঝে চড়া পড়িয়াছে, সেই চড়ায় নানা রকম পাখী খেলা করিতেছে। দিনের মধ্যে দু' চার খানা ষ্টীমার যায়, ডিঙ্গীও চলে, কিন্তু কলিকাতার মত বাঁধা গঙ্গা নয়। এখানে যেন মুক্ত নদী, কল কল করিয়া জল ছুটিয়াছে। অবসর পাইলেই, কিরণ ও লীলা গঙ্গার ধারে বসিত। সেখানে একটা বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ, চারিদিকে মোটা মোটা শিকড় বাহির হইয়া রহিয়াছে, দুই জনে সেই গাছতলায় বসিত। হয় ত ভর দুপুর বেলা চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অশ্বত্থ গাছের পাতার মধ্যে পাখীগুলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গঙ্গার জলে কোথাও কিছু দেখা যায় না,কেবল একখানি নৌকা ভাঁটায় ভাসিয়া যাইতেছে। নৌকার উপরে কেহ নাই, কেবল হালের গোড়ায় বসিয়া মাঝি ঝিমাইতেছে, একদিন দুপুর বেলা দুই জনে এই রকম বসিয়া আছে, এমন সময় কিরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “হ্যাঁ ভাই, ওটা কি?” লীলা কিরণের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসারে দেখিল, অনেক দূরে গঙ্গার মাঝখানে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার উপর ফেনা দেখা যাইতেছে। লীলা একটু মুখ টিপিয়া কহিল, “ও কি তুমি জান না?” কিরণ বলিল, “না।” লীলা বলিল, “ও যে জোয়ার আস্‌চে। এখনি বান ডাক্‌বে এখন। ওই চড়ায় দেখ, কেমন বান খেলায়।”

দুই জনে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জোয়ার আসিল। ঢেউগুলা ফুলিয়া, ফেনা তুলিয়া ছুটিয়া আসিল।

গঙ্গার মাঝখানে চড়ার উপর ঢেউয়ের আছড়ানি, তার পর চড়া ডুবিয়া গেল। কিরণ এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। ঢেউয়ের আস্ফালন বড় বেশী ক্ষণ রহিল না। ভরা জোয়ার আসিল। জল স্থির অথচ কেমন চঞ্চল, কূলে কূলে পুরিয়া উঠিল। যেমন বেলা পড়িতে লাগিল, অমনি তীরবর্ত্তী গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়া জলে পড়িল, পাতার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ জলে পড়িয়া, চিক্ চিক্ করিতে লাগিল।

দিন কয়েকের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের জ্বর বিচ্ছেদ হইল। রাত্রে নিদ্রা হইতে লাগিল, ক্রমে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছু দিনে, উঠিয়া একটু আধটু হাঁটিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। সকালে বৈকালে বারান্দায় বসিয়া বা শুইয়া, গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

প্রফুল্লের আনন্দের সীমা নাই। জল দেখিয়া, গাছ দেখিয়া, পাখী দেখিয়া, সে অহ্লাদে আট্খানা। মালী তাহাকে মাঝে মাঝে বাগানের ফল পাড়িয়া দেয়। মালীর উপর প্রফুল্লের ভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বাগানের ফটকের পাশে একখানা খড়ো ঘরে মালী থাকে। মালীর মালিনীর পিঠে, কাঁকে, কোলে, গুটি চার পাঁচ ছেলে মেয়ে। তাহাদিগকে লইয়া সে কিছু ব্যস্ত থাকিত। প্রফুল্ল সেখানেও কিছু লাভের আশায় যাইত। কিন্তু সেখানে লাভ হওয়া দুরে থাকুক, তাহার হাতে কিছু থাকিলে, মালীর ছেলেপুলে কাড়িয়া খাইত। প্রফুল্ল সে দিকে যাওয়া ভয়ে

বন্ধ করিল। দুর হইতে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করিত। কোথাও কিছু পাইলে, একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস পাইয়াছে মনে করিয়া, বাবা, মা, অথবা মাসিমাকে দেখাইত, তাঁহারাও সে জিনিসটা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। কোন দিন ফুলটা, কোন দিন পাতাটা, কোন দিন হয় ত একটা নুড়ি, প্রফুল্ল রোজ রোজ একটা না একটা কিছু দেখাইবার সামগ্রী পাইত।

কিরণও বাগানে আসিয়া অনেকটা সারিল। মুখখানি আবার বেশ পুরন্ত, বেশ গোলাল হইল। মুখের হাসি আবার ফিরিয়া আসিল।

লীলাই কেবল সারিল না। সে মুখে যতই কেন হাসুক না, যতই কেন শরীরের অবস্থা গোপন করুক না, তাঁহার শরীর যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বড় সাবধানে থাকিত বলিয়া, কিরণ কিছু বুঝিতে পারিত না। কিরণ মনে করিত, দিদি আর কিছু দিন আমার কাছে থাকিলে সারিয়া উঠিবে। হয় ত লীলাও তাহাই মনে করিত।

এইরূপে দুই মাস গেল। সুরেশচন্দ্রের শরীর পুনরায় সবল ও সুস্থ হইল। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শব্দশেল।

তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেই, ঠাকুরমা কিরণ ও লীলাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কত দিন তাহাদের দেখেন নাই! লীলাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিল। ঠাকুরমা নিজে মনের অসুখে ছিলেন। অসুখ কিছু বুঝিতে পারিতেন, কিছু বুঝিতে পারিতেন না। যে বাড়ীতে এত কাল কাটাইয়াছিলেন, সে বাড়ী তাহার চক্ষে কেমন নূতন ঠেকিত। সেই স্নেহসিক্ত গৃহ যেন শুষ্ক ও স্নেহশূন্য হইয়া উঠিতেছিল। যেন সে বাড়ী নূতন হইয়া উঠিতেছিল, তিনি এক মাত্র পুরাতন অবশিষ্ট ছিলেন। আর সকলে এক দিকে, তিনি যেন একা আর এক দিকে। কি ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা হইত, কি চোকটিপাটিপি হইত, ঠাকুরমা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এই সুখের দুঃখের সংসার, পরিবারপরিজনপূর্ণ গৃহ, ইহার ভিতর এত প্রহেলিকা, তিনি বুঝিতে পারিতেন না। পথ চলিতে যেন সিঁড়ীতে পা ঠেকিত, কবাটে যেন মাথা ঠুকিয়া যাইত। আগেও ত বাড়ী এই ছিল, তবে এত পরিবর্ত্তন কোথা হইতে হইল? তখন ত কিছুই এমন রহস্যময় ছিল না। তখন কেবল

হাসিখুসী, কল কোলাহল, স্নেহ প্রেম মমতা বাৎসল্য, গৃহের চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিত। তখন সেই নিত্য কলহও যেন সেই স্নেহের অঙ্গ ছিল। কেবল এক জনের অভাবে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? ঠাকুরমার মন ঘেঁসিয়া কেবল সেই পূর্ব্ব কালের দিকে যাইত। সেই জন্য লীলা ও কিরণকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

কিরণ কিছু অনিচ্ছার সহিত আসিল। তাহার সে বাড়ীতে আসিতে আর ভাল লাগিত না। কি করে,—ঠাকুরমার কথা এড়াইতে না পারিয়া আসিল। তাহারা দুই জনে আসিয়া যখন ঠাকুরমাকে নমস্কার করিল, তখন তাঁহার চক্ষে জল আসিল। লীলার কি হইয়াছে? সে যেন আগের চেয়েও রোগা হইয়া গিয়াছে। লীলা হাসিল। ঠাকুরমার যেমন কথা! লীলা বেশ আছে, তাহার ত কোন অসুখ করে নাই। কিরণের কাছে এত দিন ছিল, তাহাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না। কিরণ কহিল "দিদি একটু রোগা, কিন্তু অসুখ ত কিছু নাই।" ঠাকুরমা তাহাদের কথায় কতক আশ্বস্ত হইলেন।

একটু পরে, আনন্দময়ীর মা সেই দিকে আসিলেন। তাঁর মুখের কথাগুলি আগের চেয়েও মিষ্ট, আগের চেয়েও তাঁর পা মাটিতে ধীরে পড়ে, আগের চেয়েও কাপড় বেশ গায় মাথায় ঢাকা, আগের চেয়েও হাসিটুকু মধুর। তাঁহাকে দেখিলে কে বলিত যে, তাঁহার মনে ফেরপ্যাচ আছে? কিন্তু তাঁহাকে দেখি-

য়াই ঠাকুরমা চুপ করিলেন। আনন্দময়ীর মাকে সম্মুখে দেখিয়া, লীলা ও কিরণ তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি হাসিমুখে তাহাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রফুল্ল কেমন আছে? সে বুঝি বাহিরে খেলা করিতেছে? নাতিজামাই বেশ সারিয়া উঠিয়াছেন ত? এত দিন বাড়ী যেন অন্ধকার হইয়াছিল, লীলা ও কিরণ আসিয়া আবার আলো হইল। তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া, বেহানের মুখে হাসি ফুটিল, তাহাকে আদর করিয়া কোলে করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। প্রফুল্ল বড় ভয়তরাসে বা লাজুক ছেলে নয়, কিন্তু তাঁহার কাছে গেল না। নিকটে আসিয়া কোলে করিতে উদ্যত হওয়াতে লীলার কাপড় চাপিয়া ধরিল, কিছুতে ছাড়িল না। তখন অন্য কাজ আছে বলিয়া, আনন্দময়ীর মা হাসিমুখে আর এক দিকে গেলেন।

আনন্দময়ীকে নমস্কার করিতে গিয়া, লীলা ও কিরণ আর এক জনকে দেখিতে পাইল। বিন্দুবাসিনী, কয়েক দিন হইল, ভাইয়ের বাড়ী আসিয়াছেন। নূতন গৃহিণীর কাছে তাঁহার নিতান্ত অনাদর নয়। তিনি সর্ব্বদাই আনন্দময়ীর মন রক্ষা করিতে ব্যস্ত, প্রতি পদে তাহার মন যোগাইয়া চলেন। যখন যেমন, তখন তেমন,—বিন্দুবাসিনীর স্বভাব এই। কিরণের মার আমলে তিনি অত তম্বী করিতেন, কারণ, তাঁহার কথায় কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিত না। আনন্দময়ীর বেলা সেটি চলিবে

না, তিনি গোড়া হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নূতন সংসারে নূতন গৃহিণীর শিকড় যেমন শক্ত হইতে লাগিল, বিন্দুবাসিনীও তেমনি নরম হইতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর খোসামোদ তাঁহার প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। লীলাকে বিন্দুবাসিনী সংক্ষেপে সম্ভাষণ করিলেন। কিরণের সঙ্গে গোটাকতক কথা কহিলেন।

তাহারা দুই জনে ফিরিয়া গিয়া ঠাকুরমার কাছে বসিল। ঠাকুরমার হেঁসেলের কাছে ও তাঁহার ঘরের মধ্যে যেন কতকটা স্নেহ অবশিষ্ট ছিল। মস্ত বাড়ীখানা যেন আর সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য। কথাবার্ত্তায় দিনমান গেল। সন্ধ্যার সময় লীলা একবার উঠিল। সেই সময় তাহার শরীর ও মন বড় খারাপ হইত। নিজের অবস্থা গোপন করিবার জন্য, সেই সময় লীলা একান্তে নির্জ্জনে থাকিত। দুঃখের স্মৃতি লইয়া, লীলা এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিরণের মা কোথায় থাকিতেন, কোন্ ঘরে বেশী যাওয়া আসা করিতেন, কোন্ সময় কোথায় বসিতেন, সেই সব কথা লীলার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় লীলা একটা ঘরে প্রবেশ করিল। সে দিকে বড় একটা কেহ যাইত না। ঘরটা আনন্দময়ীর মহলে। প্রবেশ করিয়া লীলা দেখিল, ভিতরে আর একটা ঘরের দরজা ভেজান রহিয়াছে। সেই ভিতরের ঘর হইতে গলার আওয়াজ আসিতেছে। লীলা সহজেই বুঝিল, আনন্দময়ী ও বিন্দুবাসিনী কথা কহিতেছেন। লীলা অমনি

বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু একটা কথা তাহার কানে গেল, আর তাহার পা উঠিল না, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দুবাসিনী কথা কহিতেছিলেন। গোপনীয় কথা বলিয়াই গলা চাপা, নহিলে সেখানে আর কেহ ছিল না। লীলা যে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, সে সন্দেহ কাহারও মনে হয় নাই।

বিন্দুবাসিনী বলিতেছিলেন, "বাগানে যাবার তরে ওঁর অত মাথা ব্যথা কেন? কিরণের বরের অসুখ ত ও ছুঁড়ি সাত-তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে বাগানে গেল কেন?"

আনন্দময়ী। "সত্যিই ত! ওর যাবার কি আবশ্যকটা ছিল?"

বিন্দুবাসিনী। "উনি আবার বড় ভাল! মরণ আর কি মরণমুখীর! কিরণ যে আপনার মাথা আপনি খেয়েচে! এখন অবধি সে কিছু জানে না। কিন্তু অমন কথা কি ঢাকা থাকে? পোড়া-কপাল ওঁর!"

আনন্দময়ী। "কি ঘেন্নার কথা! আমি ত কই কিছু শুনি নি। কিরণ চিরকাল অমনি বোকা, দেখেও কিছু দেখে না।"

সেই সময়—পবিত্র সন্ধ্যাকালে, যখন সেই পাপ কলঙ্কের কথা হইতেছিল—সেই নির্ম্মল বিরলনক্ষত্র সন্ধ্যাকাশ হইতে লীলার মাথায়—বিন্দুবাসিনীর মাথায়—বজ্রপাত হইল না কেন?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শেল বিঁধিল—ফুরাইল।

সন্ধ্যার সেই সম্পষ্ট অন্ধকার যেন সহসা চন্দ্রতারকাশূন্য ঘোর রাত্রির মত হইয়া গেল। লীলার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারি দিকে বিকট শব্দে যেন তাহার কর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পৃথিবী যেন লীলার পায়ের নীচে হইতে সরিয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ড যেন তাহার মাথার উপর চাপিতে লাগিল। সেই ভার মাথায় করিয়া, লীলা যেন অন্ধকার অতলে ডুবিতে লাগিল।

লীলা কাহাকেও কিছু বলিল না। রাত্রে একা শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষে জল আসিল না। অশ্রুর উৎস যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। শয্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু ভাবিতে পারে না—হৃদয়ে কেবল অন্ধকার, যেন তাহার বুকে কে পাষাণ চাপাইয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে সকল কথা মনে পড়িল। সুখের নিশ্চিন্ত বাল্যকাল মনে পড়িল। সেই সব সঙ্গিনী, সেই খেলা ধূলা সব মনে পড়িল। জগৎ সংসার তখন কেবল কলকাকলিপূর্ণ, আলোক-আনন্দময় ছিল। স্বর্ণকুজ্ঝটিকাবৃত সেই শৈশবকাল স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাহার পর, বিবাহের উৎসব, নববধূর সমাদর, সংসারের প্রবেশদ্বারে নবীন কৌতূহল। সে স্বপ্ন কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল! সংসারের সে মূর্ত্তি ফিরিয়া গেল।

কোথা হইতে তক্ষক আসিয়া সংসারবৃক্ষে দংশন করিল—নব পল্লবিত বৃক্ষ শুষ্ক দগ্ধ দারুকাষ্ঠের মত হইয়া গেল। এই সংসার, সুখের আশার ফল এই, এই জন্য জন্মযন্ত্রণা। বৈধব্যের সর্ব্বশূন্যতা তাহার কপালে ছিল! তখন কেন সে মরিল না? এখন মরিবার এত ইচ্ছা হইতেছে, তখন মরিলে ত অনেক যন্ত্রণা এড়াইত। কিসের আশায় সে জীবন বহন করিয়াছিল? তখন মরিলে সে জানিতে পারিত না যে, সংসারে কোথাও শান্তি আছে। এই যে আশাতিরিক্ত শান্তি পাইয়াছিল, তাহা কি ভুলিয়া যাইবে? বিধবা হইয়াই যদি সে মরিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত না যে সংসারে নিজের সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিছু আছে। পরের সুখ দেখিয়া, সে নিজের দুঃখ ভুলিতে শিখিয়াছিল। এই গৃহে আসিয়া, সে স্নেহের মায়া বুঝিতে পারিয়াছিল। চারিদিক হইতে যেন অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিবলে, তাহার নিজের দুঃখ তাহার হৃদয় হইতে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে যেন পরের সুখ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে স্বপ্ন কত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল! অল্পে অল্পে আবার তাহার হৃদয়ে সূচিবিদ্ধ হইতে লাগিল, তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। আজ যেন তাহার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সে কাহার কি ক্ষতি করিয়াছিল যে, তাহার নামে এমন ভয়ানক অপবাদ রটিল? স্বপ্নেও লীলা এমন কথা মনে করে নাই। কিরণ ও সুরেশচন্দ্রের প্রণয় দেখিয়া, তাহার আহ্লাদ হইত, আর কিছু কখনও তাহার

মনে হয় নাই। তাহার মন নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র ছিল বলিয়াই সে এমন শান্তিলাভ করিয়াছিল। তবু এমন কলঙ্ক! এমন কথা শুনিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? আত্মহত্যা কি মহাপাপ? আত্মহত্যা না করিলে আর নিষ্কৃতির উপায় কি? এই অন্ধকারে—কেহ দেখিতে পাইবে না—অতি সহজ উপায়ে সকল যন্ত্রণা—

বুকে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া, লীলা শুইয়া পড়িল! বালিশ বুকে চাপিয়া বেদনা উপশম করিবার চেষ্টা করিল। যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরোক্তি করিতে লাগিল, "হে হরি! এখন যদি আমার মরণ হয়—"

ঠাকুরমা সকালে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, লীলার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। লীলা তাঁহার আগে উঠিয়া তাঁহার সব উদ্যোগ করিয়া রাখে। আজ কেন সে এখনও উঠিল না? বোধ হয়, পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। সূর্য্যোদয় হইল দেখিয়া ঠাকুরমা লীলাকে ডাকিতে গেলেন। দরজা ভেজান ছিল। দরজা খুলিতে প্রভাতের কোমল সূর্য্যালোকে গৃহ আলোকিত হইল। ঠাকুরমা ডাকিলেন, "লীলা!"

লীলা উত্তর দিল না। ঠাকুরমা কাছে গিয়া, তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সেই কোমল প্রভাত আলোকে, তরুশাখাচ্যুত কোমল পল্লবের ন্যায়, লীলা শয়ন করিয়াছিল। তাহার ভগ্নপ্রায় হৃদয় কঠোর আঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অজ্ঞাত হৃদ্‌রোগে তাহার যন্ত্রণা ফুরাইল।

প্রভাতসূর্য্যের সুবর্ণ আলোকে সংসার হাসিতেছিল। জগতের রথচক্র যেমন ঘুরিতেছিল, তেমনি ঘর্ঘর রবে ঘুরিতে লাগিল। অনন্ত পথিমধ্যে লীলা রথচ্যুত হইয়া কোথায় পতিত হইল, কে জানিল ?

সমাপ্ত

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস প্রণীত।

সোণার ছবি

বালকবালিকাদের উপযোগী চমৎকার ছবির বই। পুস্তকখানি ছবিতে পূর্ণ। বিভিন্ন রঙের কালীতে মুদ্রিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। দেখিলে বিলাতী বলিয়া ভ্রম হয়। বালকবালিকারা পাইলে আনন্দে নৃত্য করিবে। আকা বৃহৎ। মূল্য ॥০ আট আনা। ডাক মাস্থল এক আনা। ভিঃ পিঃ তে লইলে ॥৶০ এগা আনা। পুস্তক বিক্রেতাদিগকে কমিশন দেওয়া হয়। কলিকাতা ৩ নং শঙ্কর ঘোষের লেন, 'প্রদীপ' কার্য্যালয়ে গ্রন্থকারের নিকট এবং নিম্ন ঠিকানায় আমার নিকট পুস্তক খানি পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট.
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,
কলিকাতা।

প্রদীপ

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সচিত্র মাসিক পত্র।

এই প্রকার সচিত্র, সুলভ ও সুবৃহৎ মাসিক পত্র এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রতিমাসে চমৎকার চমৎকার ছবি, গল্প, উপন্যাস, উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ ও কবিতা প্রদীপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আকার সুবৃহৎ। বঙ্গের অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর লেখক প্রদীপে রীতিমত লিখিয়া থাকেন। বঙ্গসাহিত্যের অধিনায়ক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রদীপকে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রদীপের ন্যায় একখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর মাসিকপত্র ইতিপূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হয় নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। নমুনা চাহিলে।০ চারি আনা মূল্য ও দুই পয়সা ডাকমাসুল লাগে। মূল্যাদি নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

'প্রদীপ' কার্য্যালয়, ৩ নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।	শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস, কার্য্যাধ্যক্ষ।